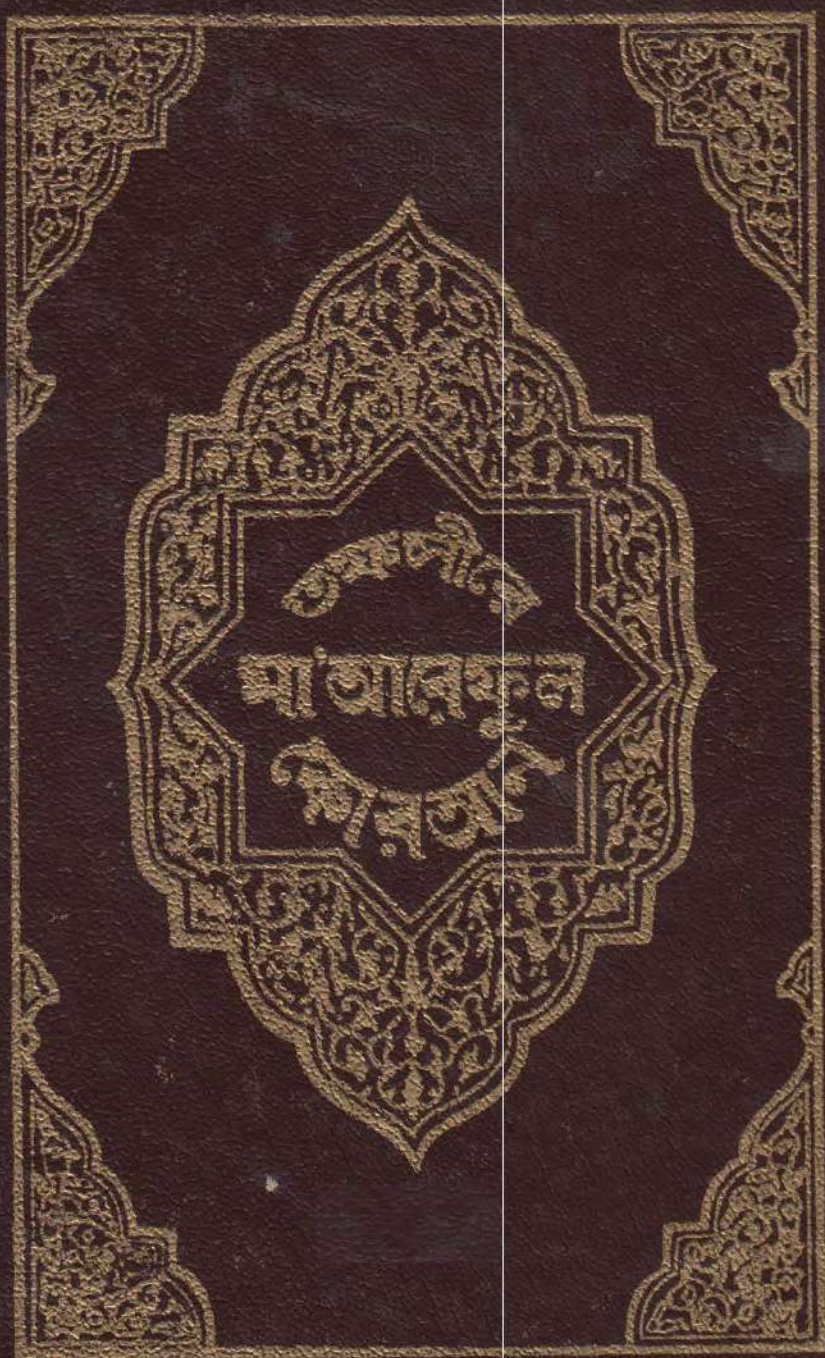




ইসলামিক ফাউন্ডেশন

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২২

সিলেবাস

সূরা বাকারাহ ২১, ৩৪ ও ৩৭ রুকু

সূরা ইব্রাহীম ৬ ও ৭ রুকু

সূরা বনী ইসরাঈল ৩, ৪ ও ৫ রুকু

সূরা কাহফ

সূরা মারইয়াম

সূরা নূর ৩৪ রুকু

সূরা ফুরকান ৬ষ্ঠ রুকু

সূরা আদ-দাহর

সূরা কদর থেকে সূরা হুমাযাহ

আয়োজনে

মাউন ফাউন্ডেশন

www.maunfoundation.org

সূচিপত্র

সিলেবাস	যে খন্ডে রয়েছে	ই-বুক পৃষ্ঠা
সূরা বাকারাহ ১৬৮-১৭৬ আয়াত	প্রথম খন্ড	৫-২৩
সূরা বাকারাহ ২৫৪-২৫৭ আয়াত	প্রথম খন্ড	২৩-৩২
সূরা বাকারাহ ২৬৭-২৭৩ আয়াত	প্রথম খন্ড	৩৪-৪২
সূরা ইব্রাহীম ৩৫-৫২ আয়াত	পঞ্চম খন্ড	৪৪-৬৩
সূরা বনী ইসরাইল ২৩-৫২	পঞ্চম খন্ড	৬৫-১০২
সূরা কাহাফ	পঞ্চম খন্ড	১০৪-২২৩
সূরা মারইয়াম	ষষ্ঠ খন্ড	২২৫-২৭০
সূরা নূর ২১-৩৪ আয়াত	ষষ্ঠ খন্ড	২৭২-৩৩৯
সূরা ফুরকান ৬১-৭৭ আয়াত	ষষ্ঠ খন্ড	৩৪১-৩৭৪
সূরা দাহর	অষ্টম খন্ড	৩৭৬-৩৮৭
সূরা কদর - সূরা হুমাযাহ	অষ্টম খন্ড	৩৮৯-৪১৯

সূরা বাকারাহ
১৬৮-১৭৬ আয়াত

(আল্লাহ বলেন, এসব চিন্তা-ভাবনা আর প্রকটবিনায় কি হবে!) আল্লাহ তা'আলা এমনি করে তাদের অসৎ কর্মগুলোকে অপার আকাঙ্ক্ষার (আকারে) দেখিয়ে দেবেন এবং তাদের (নেতৃবর্গ ও অনুসারী) কারোই দোষের আশুন থেকে পরিজ্ঞান ভাগ্যে জুটবে না (কারণ শিরকের শাস্তিই হলো অনন্তকাল দোষের ভোগ)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٥﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٦﴾

(১৬৮) হে মানবজাতি, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর, যা তোমরা জান না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কোন কোন মুশরিক দেব-দেবীর নামে গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিয়ে এবং তাতে কল্যাণ সাধিত হবে বলে বিশ্বাস করে সেগুলোর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করত। তারা নিজেদের এহেন কাজকে আল্লাহর নির্দেশ, তাঁর সন্তুষ্টির কারণ এবং সমস্ত দেব-দেবীর সুপারিশক্রমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হবে বলে বিশ্বাস করত। এ প্রসঙ্গেই এখানে আল্লাহ রাবুল আলামীন গোটা মানব জাতিকে সতর্ক করে বলছেন) হে মানবজাতি! যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে সেগুলোর মধ্যে (শরীয়তের বিধান মতে) হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর (এবং ব্যবহার কর। তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে)। আর (এসব হালাল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে কোন্টি থেকে এই মনে করে বিরত থাকা যে, তাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন; তাও শয়তানী ধারণা। কাজেই তোমরা) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না। প্রকৃতপক্ষে সে (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সে তোমাদেরকে এমনি সমস্ত কু-ধারণা, অশ্লীল কল্পনা ও চরিত্রের মাধ্যমে অন্তর্দীন কফির আবর্তে বন্দী করে রাখে। আর শত্রু হওয়ার কারণে) সে তোমাদিগকে সে সমস্ত বিষয়ই শিদ্ধা দেবে, যা (শরীয়তের দৃষ্টিতে) মন্দ ও অপবিত্র। তদুপরি এমন শিক্ষাও দেবে যে, আল্লাহর ওপর এমন বিষয়েও মিথ্যা আরোপ কর, যার সন্দেহ পর্যন্ত তোমাদের জানা নেই। (যেমন, মনে করে নেওয়া যে, আমাদের প্রতি উল্লিখিত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম রয়েছে)।

আনুযায়িক ভ্রাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ : حَلَالًا طَيِّبًا শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো গিট খোঁস। বৈদ্য বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতে যেমন একটা গিট খুঁলে

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) — ৪৯

দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। (১) হালাল হাওয়া, (২) করয আদায় করা এবং (৩) রাসূলে করীম (সা)-এর সুনুতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طَيِّب শব্দের অর্থ পবিত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خَطْوَاتُ (খুতওয়াত) (খুতওয়াতুন)-এর বহুবচন। خَطْوَةٌ বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। سُبُطَاتُ الشَّيْطَانِ -এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম। السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখ বোধ করে। فحشاء অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سوء এবং فحشاء -এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ-অসাধারণ গোনাহ এবং কবীরা গোনাহ। اِثْمًا بِأَمْرِكُمْ -এখানে শয়তানের নির্দেশ দান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসুউদ (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন-‘আদম সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী ওয়াসওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের ইলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আত্মা তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলত গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

মাস'আলা : দেব-দেবীর নামে যাঁড় বা অন্য কোন জীবজন্তু, মোরগ-মুরগী, ভেড়া-বকরী ছাড়া কিংবা কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তি অথবা আত্মাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা যে হারাম তাই পরবর্তী চার আয়াতের পর وَمَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ -এর আওতায় বর্ণনা করা হবে। বর্তমান يَا أَيُّهَا النَّاسُ আয়াতে এ ধরনের জীব-জন্তুর হারাম হওয়ার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়, যেমন অনেকেরই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। বরং এখানে এ ধরনের কার্যকলাপ হারাম হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, আত্মাহ ব্যতীত অপর কারও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী মুক্ত করা এবং এ কাজকে নৈকট্য ও বরকতের বিষয় বলে ধারণা করা আর এ সমস্ত জীবজন্তুকে নিজের জন্য হারাম বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং এগুলোকে চিরস্থায়ী মনে করা প্রজ্ঞতি কাজ নাআয়েয এবং এমন কাজ করা পাপ।

সূত্রাং আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, যেমন জীব-জন্তুকে আত্মাহ তা'আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে দেব-দেবীর নাম করে হারাম সাব্যস্ত করো না। বরং সেগুলোকে যথারীতি ভক্ষণ কর। অবশ্য অজ্ঞানতার দরুন যদি এমন কোন কাজ সংঘটিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে নিয়ত সংশোধনের সাথে সাথে ঈমানও নবায়ন করবে এবং তওবা করে নিয়ে এই অবৈধতাকে মٹ করে দেবে। এভাবে এ সমস্ত জীব-জন্তুকে পবিত্র কিছু মনে করে হারাম সাব্যস্ত করাও পাপ, কিন্তু এগুলোকে আত্মাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করার দরুন বিধানগতভাবে মোহেতু নাপাক বলে গণ্য হয়ে যায়, তাই সেগুলোর হারাম হওয়াও প্রমাণিত হয়ে যায়।

মাস'আলা : এতে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি অজ্ঞতা কিংবা অসত্যকৃত্যের দরুন কোন জীবকে আত্মাহু ছাড়া অপর কোন কিছুর নামে মুক্ত করে দেয়, তাহলে এই হারাম খারণা বর্জন করে এহেন কাজ থেকে তওবা করে নেবে। তাহলেই সে জীবের মাংস হালাল হয়ে যাবে।

وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ آتِيعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْهِ

آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٩٩﴾

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

(১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর, যা আত্মাহু তা'আলা নাখিল করেছেন, তখন তারা বলে—কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (১৭১) বস্তুত এহেন কাকিরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহ্বান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিংকার ছাড়া—বধির, মূক এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বুঝে না।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন কেউ সেসব (মুশরিক) লোককে বলে যে, আত্মাহু তা'আলা যে নির্দেশ (হীয পয়গম্বরের প্রতি) নাখিল করেছেন সে অনুযায়ী চল, তখন (তারা উত্তরে) বলে, (তা হতে পারে না) আমরা তো বরং সে পথেই চলব, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি। (কারণ, তারাও সে পথ অবলম্বনের ব্যাপারে আত্মাহুর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত ছিলেন। এ দাবির বশে আত্মাহু বলেন) তারা কি সর্ববিষয়েই হীয বাপ-দাদাদের পন্থায় চলবে। তাদের বাপ-দাদারা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন কিছু না জানলেও কি এবং তাদের প্রতি কোন আসমানী প্রহের হেদায়েত না থাকলেও কি?

বস্তুত (অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে) এ সমস্ত কাকিরের তুলনা সে সমস্ত জীব-জন্তুর অবস্থারই মত (যার কথা এ উদাহরণে বর্ণনা করা হচ্ছে) যে, এক লোক এমন এক জীবের পেছনে চিংকার করে যাচ্ছে যে, হাঁক-ডাক আর চিংকার (এর শব্দ) ছাড়া তার কোন মর্মই শোনে না। (ডেমনিভাবে) এ কাকিররাও (বাহ্যিক কথাকর্তা শোনে বটে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ) বধির (যেন কিছুই শোনে না), মূক (যেন এমন কোন কথাই তাদের মুখে সরে না), অন্ধ (কারণ, লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন কিছুই তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না)। কাজেই (তাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই যখন বিকল, তখন) তারা কোন কিছুই বুঝে না, উপলব্ধি করে না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্য কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জ্ঞান যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَهْتَدُونَ এবং لَا يَعْقِلُونَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন খোদারী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিকল্পনামূলকভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ন্যায়াল করা হয়েছে। আর জ্ঞানবুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট 'নস' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হলো এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ন্যায়ালকৃত কোন বিধি-বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীর-পর্যালোচনা গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেওয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সম্মুখীন হওয়া তাঁর মধ্যে ইজতিহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন-মুজতাহিদ আলেমের আনুগত্য অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্য নয়, বরং আল্লাহ এবং তাঁর হুকুম-আইকাম মানার জন্যই হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহর সম্পর্কে ওয়াক্বিকহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন মুজতাহিদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতে আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য : উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা মিজেয়াই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াক্বিকহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্ব-পুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হলো ভ্রান্ত ও মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস ও সংকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

اتَّبَعْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .

—“আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আক্বিলতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর ধর্মবিশ্বাসের।”

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সংকর্মের বেলায় তা জায়েয। বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহিদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাস'আলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানের উল্লেখও করেছেন।

তিনি বলেন :

تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد (الى) وهذا في الباطل صحيح -
اما التقليد في الحق فاصل من اصول الدين وعصمة من عصم المسلمين
يلجأ اليها الجاهل المقصر عن درك النظر .

অর্থ—“কিছু লোক এ আয়াতটিকে তকসীর বা অনুসরণের নিন্দাবাদ এসঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তবে এরূপ অনুসরণ করা কেবল অবৈধ ও বাতিল বিষয়ের ক্ষেত্রেই স্বার্থ। কিন্তু সত্য-সঠিক বিষয়ে কারও অনুসরণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সত্য-সঠিক বিষয়ে (অন্যের) অনুসরণ করা তো বরং ধর্মীয় নীতিমালার একটা স্বতন্ত্র ভিত্তি এবং মুসলমানদের জন্য ধর্মের হেদায়েত লাভের একটা বড় উপায়। কারণ, যারা নিজেরা ইজতিহাদ বা উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখে না, ধর্মীয় ব্যাপারে অন্যের অনুসরণের উপরই তাদের নির্ভর করতে হয়।”

—(কুরতুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٩﴾ إِنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
وَمَا أَهْلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

(১৭২) হে ইমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে ক্বহী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বশেষী কর। (১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে ক্বশফ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নামুসমানী ও সীমাশঙ্করকারী না হয়, তার জন্য কোন গোনাহ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্বমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরের আয়াতে পবিত্র বস্তু-সামগ্রী খাবার ব্যাপারে মুশরিকদের ভুল ধারণা বাতলে দিয়ে তাদের সংশোধন করা উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীতে ইমানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, যেন তারা সে ভুল ধারণার ক্ষেত্রে মুশরিকদের মতই আচরণ আরম্ভ না করে। প্রসঙ্গক্রমে ইমানদারদের প্রতি স্বীয় নিয়ামতের উল্লেখ করে তাদেরকে শুকরিয়া আদায় করার শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে বলা হয়েছে) :

হে ইমানদারগণ (আমার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি এ অনুমতি রয়েছে যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে) যেসব পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আমি তোমাদেরকে দান করেছি, সেগুলোর মধ্য থেকে তোমরা (যা খুশি) আহার কর, (ভোগ কর) এবং (এ অনুমতির সাথে সাথে এ নির্দেশও বলবৎ রয়েছে যে, মুখ, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকলাপে এবং এ সমস্ত নেয়াযত যে একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত-সে বিষয়ে অন্তরে বিশ্বাস রাখার মাধ্যমে) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা বাস্তবিকপক্ষেই তাঁর দাসত্বের সাথে বৃত্ত থেকে থাক। (বন্ধুত্ব এ সম্পর্ক একান্তই স্বীকৃত প্রকাশ্য। সুতরাং শুকরিয়া আদায় করাও যে ওয়াজিব তাও সুপ্রমাণিত)।

... ষোপসূত্র : উপদের আলোচনায় বলা হচ্ছিল যে, হালাল বা বৈধ বস্তু-সামগ্রীকে হারাম বা অবৈধ সাব্যস্ত করো না। তারপর বলা হচ্ছে যে, মুশরিকদের মত তোমরাও হারামকে হালাল মনে করো না। এখানে মৃত বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে জবাই করা জীব-জন্তু যা মুশরিকরা খেত—তা থেকে বারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট অমুক অমুক জীব হারাম। এগুলো ছাড়া অন্যান্য জীব-জন্তুকে নিজের পক্ষ থেকে হারাম সাব্যস্ত করা ভুল। এতে পূর্ববর্তী বিষয়েরও সমর্থন হয়ে গেল।

(অতঃপর বলা হচ্ছে) আল্লাহ তা'আলা (শুধু) তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জীব, (যা জবাই করা ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও জবাই করা ছাড়া মরে যায়)। আর রক্ত (যা প্রবাহিত হয়) এবং শূকর মাংস (তেমনি তার অন্যান্য অংশগুলোও) আর এমন সব জীবজন্তু যা (আল্লাহর নৈকট্য লাভের মানসে) আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। (এ সমস্ত জীবজন্তু হারাম করেছেন, কিন্তু সেসব বস্তু হারাম করেন নি, যা তোমরা নিজের পক্ষ থেকে হারাম করে নিছ। যেমন, উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে অবশ্য (এতে এতটুকু অবকাশ রয়েছে যে,) যে লোক (ক্ষুধার জ্বালায়) অনন্যোপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে তা খাওয়ায়) কোন পাপ নেই। অবশ্য-শর্ত হলো এই যে, খেতে গিয়ে সে যেন হাদ প্রহণে আগ্রহী না হয় (প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে গিয়ে) যেন সীমালংঘন না করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু (তিনি এমন চরম সময়ে রহমত করে গোনাহর বস্তু থেকেও গোনাহ রহিত করে দিয়েছেন)।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হালাল খাদ্যের বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ : আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, ইবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খাওয়ায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তদ্বারা অন্যায-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং মততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রসুলের প্রতি হেদায়েত করেছেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ كُلْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا .

“হে আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।”

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার অশঙ্কাই থাকে বেশি। রাসূল (সা) ইয়শাদ করেছেন, বই লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দুহাত তুলে আত্মাহুত দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদিগার! ইয়া রব !!’ কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমনভাবেই তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? (মুসলিম, তিরমিযী, —ইবনে-কাসীর-এর বরাতে)

...أَتَمَّا বাক্যের মধ্যে أَتَمَّا শব্দটি বাক্যের অর্থ সীমিতকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় যে, আত্মাহুত তা’আলা শুধুমাত্র সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রী হারাম করেছেন, যেগুলো পরে উল্লিখিত হচ্ছে এমনি, পরবর্তী অন্য এক আয়াতে বিষয়টির আরো একটু ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা :

قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ .

অর্থাৎ—হযর (সা)-কে সন্ধেধন করে বলা হচ্ছে যে—আপনি ঘোষণা করে দিন, “ইতিপূর্বে আমি ওহী মারফত যেসব বস্তু হারাম করেছি, আহাব্য গ্রহণকারীদের পক্ষে সেগুলো ছাড়া অন্য কোন কিছুই হারাম নয়।”

এ দু’টি আয়াতের মর্ম অনুযায়ী প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, খোদ কোরআনেরই অন্যান্য আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসে অন্যান্য যে বস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, এ দু’আয়াতের দ্বারা কি সেসব বস্তু হারাম হওয়া রহিত করা হয়েছে?

উত্তর এই যে, প্রথম আয়াতে হালাল-হারামের সামগ্রিক নির্দেশ আসেনি কিংবা সম্পূর্ণ আয়াতেও এমন কথা বলা হয়নি যে, পূর্ববর্তী আয়াতে যেসব বস্তুর নামোল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়া অন্যান্য কোন কিছুই হারাম নয়। বরং প্রথম আয়াতে জোর দিয়ে শুধু এ কথাই বলা হয়েছে যে, যে বস্তু সামগ্রীর নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, এগুলো সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, মুশরিকরা এমন কিছু বস্তুকে হালাল মনে করতো, যেগুলো আত্মাহুত বিধানের হারাম। পক্ষান্তরে নিজেদের পূর্বসংস্কার এবং অভ্যাসের দরুন এমন কিছু বস্তুকে হারাম বলে গণ্য করতো, যেগুলো আত্মাহুত বিধানের হালাল। তাই আত্মাহুত তা’আলা বিশেষ কতকগুলো বস্তুর নাম উল্লেখ করে জোর দিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব বস্তু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যাই থাক না কেন, এগুলো নিশ্চিতরূপেই হারাম। এ ছাড়া, হারাম বস্তু আত্মাহুত তা’আলাই যেহেতু ওহীর মাধ্যমে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, সুতরাং তোমাদের ধারণা কিংবা সংস্কারের কারণে অন্য কোন কিছু হারাম হবেনা।

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু-সামগ্রীকে হারাম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন—মৃত পশু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যেসব জানোয়ার আত্মাহুত ব্যতীত অন্য কিছুই নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্র করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত : এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যবেহ করা জরুরী, সেসব প্রাণীই যদি যবেহ করা হয় অন্য কোন উপায়ে যেমন আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কোরআন শরীফে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : **أَحْلَلْنَا لَكُمْ مَيْدَ الْبَحْرِ** 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।'

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকে হালাল করা হয়েছে। রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন—আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল করা হয়েছে—মাছ এবং টিড্ডি। অনুরূপ দু'প্রকার রক্তও হালাল করা হয়েছে। যেমন যকুৎ ও কলিজা। (ইবনে-কাসীর, আহমদ, ইবনে-মাজাহ, দার-কুতনী) সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ না করেও খাওয়া হালাল হবে। এগুলো ধরা পড়ে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ যে কোন অবস্থাতেই মরুক না কেন, তাতে কিছু যায়-আসে না। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পঁকে যায় এবং পানির উপরে ভেসে ওঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না। (জাসসাস) অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে যবেহ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে। তবে এমনভাবে মারা যাওয়া দ্বারা মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত।

মাস'আলা : বন্দুকের গুলীতে আহত কোন জন্তু যদি যবেহ করার আগেই মরে যায়, তবে সেগুলোও লাঠি বা পাথরের আঘাতে মরা জন্তুর পর্যায়ভুক্ত বিবেচিত হবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে যাকে **مَوْزُودَةً** (মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত) বলা হয়েছে। অর্থাৎ খাওয়া হালাল হবে না। মৃত্যুর আগেই যদি যবেহ করা হয়, তবে তা হালাল হবে।

মাস'আলা : ইদানীং এক রকম চোখা গুলী ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের গুলী সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হকুম তীরের আঘাতে মৃত্যুর পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরণক্ষে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকাশক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং একগুণ গুলীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও যবেহ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাস'আলা : আলাচ্য আয়াতে “তোমাদের জন্য মৃত হারাম” বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসেবে বিবেচিত হবে। যন্ত্রাণী অপবিত্র বস্তু সম্পর্কেও এ একই বিধান প্রযোজ্য। অর্থাৎ এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীবজন্তুর গোশত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং সেগুলো এমন কোন স্থানে-কোলে দিতে হবে, যেসব কুকুর-বিড়ালে

থেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হ'বে না। (জাসাস, কুরতুবী)

মাস'আলা : 'মৃত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই शामिल। কিন্তু অন্য এক আয়াতে طَاعِمٌ عَلَى শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যাকরে দেওয়া হয়েছে। তাতে বোঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার মতো। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পলম প্রভৃতি যে সব অংশ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়, সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছে :

وَمِنْ أَصْنُفِهَا وَاَوْبَارُهَا وَاشْعَارُهَا اَنَاشًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি। (জাসাস)

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাক করে সেওয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। (জাসাস)

মাস'আলা : মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্ব্যবহারে ব্যবহৃত সামগ্রীই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম।

মাস'আলা : পাঁচাত্তর বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানীকৃত সারান এবং অনুরূপ খেলব সামগ্রীতে জন্তুর চর্বি ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে সেগুলোতে মৃত জন্তুর চর্বি মিশ্রিত হয় কিনা—এ সম্পর্কিত নিশ্চিত তথ্য অবলম্বন না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা হারাম হবে না। কেননা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আবু সায়ীদ খুদরী, হযরত আবু মুসা আশ'আরী প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী মৃত জানোয়ারের চর্বি শুধু খাওয়া হারাম বলেছেন, তবে অন্য কাজে ব্যবহার করা জায়েয বলে অতিমন্তব্য করেছেন। সে কারণে এ সবের ক্রয়-বিক্রয় তাঁরা হালাল বলেছেন। (জাসাস)

মাস'আলা : দুধের দ্বারা পনির তৈরি করার জন্য জন্তুর পেট থেকে সংগৃহীত এমন একটা উপাদান ব্যবহার করা হয়, আরবীতে যাকে 'নাফহা' বলা হয়। এটি দুধের সাথে মেশানোর সাথে সাথেই দুধ জমে যায়। সংশ্লিষ্ট জানোয়ারটি যদি হালাল এবং আল্লাহর নামে যবেহকৃত হয় তবে তার নাফহা ব্যবহার করারও কোন দোষ নেই। কারণ, যবেহকৃত হালাল জন্তুর গোশত-চর্বি সবই হালাল। কিন্তু সে অংশটুকু যদি অযবেহকৃত অথবা কোন হারাম জন্তু থেকে নেওয়া হয়ে থাকে তবে তা দ্বারা প্রস্তুত পনির খাওয়া সম্পর্কে কিছুহালালবিদগণের মধ্যে সন্তোভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম মালেক (র) সে পনির ব্যবহার করা যাবে বলে মত প্রকাশ করলেও ইমাম শাফ'ই ইদ্রিস, ইমাম মুহাম্মদ এবং সুফিয়ান সওরী (র) প্রমুখ একে নাজায়েম বলেছেন। (জাসাস, কুরতুবী)

ইউরোপ ও অন্যান্য অ-মুসলিম দেশে তৈরি যেসব পনির আসে, সেগুলোতে হারাম এবং যবেহ না করা জন্তুর চর্বি বা 'নাফহা' ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে

তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম খণ্ড) — ৫০

অধিকাংশ ফকীহর মতে এসব ব্যবহার না করাই উত্তম। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (র)-এর অভিমতের ভিত্তিতে তা ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। তবে যেসব পনিরে শূকরের চর্বি ব্যবহৃত হয় যে কোন উপায়ে জানা যায়, সেগুলো সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাপাক।

রক্ত : আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তুসামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লিখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে **أَوْذَمًا مَسْفُوحًا** অর্থাৎ 'প্রবহমান রক্ত' উল্লিখিত হয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু সে রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিক্‌হবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলা : যেহেতু শুধু প্রবহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, কাজেই যবেহ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে থেকে যায়, সেটুকুও হালাল ও পাক। কিক্‌হবিদ সাহাবী ও তাবেরীসহ সমগ্র আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা, মাছি ও ছারপোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে রক্ত যদি বেশি হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত। (জাসাস)

মাস'আলা : রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্বারা অর্জিত লাভালাভ হারাম। কেননা, কোরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বোঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে, ফলে রক্তের দ্বারা উপকার গ্রহণ করার সবগুলো নিকাই হারাম সাব্যস্ত হয়েছে।

রোগীর পায়ে অন্যের রক্ত দেওয়ার মাস'আলা : এই মাস'আলার বিশ্লেষণ নিম্নরূপ : রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে দেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত--প্রথমত, মানুষের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং অশ্লীল কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে-গলীয়া' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী, আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয়।

তবে নিরূপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমত, রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না, কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে মানবশক্তির খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং বীর সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে। সন্তানদের পিতা কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হলে পর অবশ্য শিশুকে দুধ পান করানো

মায়ের উপর ওয়াজিব থাকে না। কেননা, সন্তানদের খাদ্য সংস্থানের দায়িত্ব পিতার, মায়ের নয়। তাই গিতা তখন সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য অন্য স্ত্রীলোক নিয়োগ করবে অথবা অর্থের বিনিময়ে সন্তানের মাতাকেই দুধ পান করানোর জন্য নিয়োগ করবে।

কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتَوْهَنْ أَجُورَهُنَّ .

—“যদি তোমাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তবে তার বিনিময় পরিশোধ করে দেবে।”

মোটকথা, মায়ের দুধ মানবদেহের অংশ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োজনের খাতিরে শিশুদের জন্য তা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমনকি ঔষধরূপে বড়দের জন্যও। যথা ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে :

ولا ينس بان يسقط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء .

—অর্থাৎ ঔষধ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই। (আলমগীরী)

ইবনে কুদামাহ্ রচিত ‘মুগনী’ গ্রন্থে এ মাস’আলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। (মুগনী, কিতাবুস সাইদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২০৬)

রক্তকে যদি দুধের সাথে ‘কেয়াস’ তথা তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানবদেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফিকহবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয। ‘নিরুপায় অবস্থায়’ অর্থ হচ্ছে, রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন ঔষধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেওয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেওয়া কোরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর পোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফিকহবিদ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফিকহর কিতাবসমূহে ‘হারাম শব্দুর দ্বারা চিকিৎসা’ শীর্ষক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ : আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হলো শূকরের মাংস। এখানে শূকরের সাথে ‘লাহম’ বা মাংস শব্দ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু মাংস হারাম—একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়।

বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ হাড়, মাংস, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে 'লাহূম' শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশ্বত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি থাক হতে পারে, যদিও সেগুলো খাওয়া হারাম। কিন্তু যবেহ করার পরও শূকরের মাংস হারাম তা বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধু চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরি সূতা ব্যবহার করা জায়েয বলে হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। (জাসাস, কুরতুবী)

আল্লাহ্ হাড় অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয় : আয়াতে উল্লিখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে জীবজন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণত এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে।

প্রথমত, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এ সুরতে যবেহকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফিকহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এটি মৃত এবং এর কোন অংশ দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা **وَمَا أَهْلُ بِهِ لغير الله**। আয়াতে যে সুরতের কথা বোঝানো হয়েছে এ সুরতটি এর সরাসরি নহুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয়। তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্ নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুয়ুগগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মানত করে তা যবেহ করে থাকে। তবে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্ক কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মুফাসসির এবং ফিকহবিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যবেহকৃত' জীবের বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায বলা হয়েছে :

فكل ما نودي عليه بغير اسم الله فهو حرام وإن ذبح باسم الله
تعالى حيث اجمع العلماء لو ان مسلماً ذبح ذبيحة وقصد بذبحه
التقرب الى غير الله صار مرتداً وذبيحته ذبيحة مرتد

—অর্থঃ “সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্ নামেই যবেহ করা হোক না কেন। কেননা, আলেম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন জন্তুকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহকৃত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।”

দূররে-মুখতার কিতাবুয-যাবারেহ অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ

لَوْ دُبِحَ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ وَنَجْوَاهُ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعِظَمَاءِ يَحْرُمُ لِأَهْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَوْ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ وَاقَرَهُ الشَّامِيُّ .

—যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থে কোন পণ্ড যবেহ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পণ্ডটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও “আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয়”—এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত, যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিজেই জ্ঞান করা হয়। শামীও এ অভিপ্রায় সমর্থন করেছেন। —(দূররে-মুখতার, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৪)

কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সূরতটিকে **لَا يَحْرُمُ** আয়াতের স্বার্থে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, আয়াতের বর্ণনাত্ত্বি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বোঝায় না। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সম্বন্ধি লাভের নিয়ত দ্বারা ‘আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়’ সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সূরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ মুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত।

উপরোক্ত সূরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে **وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّحْنَبِ** বাতিলপন্থীরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে **تُحْنَب** বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয়ঃ—সে সমস্ত পণ্ড যেগুলোকে বাতিল উপাস্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে **لَا يَحْرُمُ** উপস্থিতি রয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, **وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّحْنَبِ** আয়াতের সরাসরি প্রতিপাদ্য সে সমস্ত পণ্ড, যেগুলো যবেহ করার সময় অন্য কোন কিছুর নামে যবেহ করা হয়। এরপরই **وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّحْنَبِ** আয়াত এসেছে। এ আয়াতে যবেহ করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নাম নেওয়ার কথা উল্লেখ নেই, শুধু মূর্তি বা বাতিল উপাস্যের সম্বন্ধি অর্জনের লক্ষ্যে যবেহ করার কথা এসেছে। এতে এখানে সে সমস্ত জন্তুও এ সূরতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যেগুলো যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হলেও আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সম্বন্ধি অর্জন করার লক্ষ্যে যবেহ করা হয়েছে। —(খাতাবুল্লাহ খানবীর বয়খা)।

ইমাম কুরতুবীও তাঁর তফসীরে উপরোক্ত মতই সমর্থন করেছেন। তাঁর অন্তিমত হচ্ছেঃ

وَجَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ بِالْمَيْحِ بِاسْمِ الْقَصُودِ بِالذَّبِيحَةِ وَغَلَبَ ذَلِكَ فِي
اسْتِعْمَالِهِمْ حَتَّى عَبَّرَ عَنْ النِّيَّةِ الَّتِي هِيَ عِلَّةُ التَّحْرِيمِ .

অর্থাৎ আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হতো, যবেহ করার সময় তার স্বরে সে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রোগাজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সম্বন্ধিও নৈকট্য প্রত্যাশা—যা সংশ্লিষ্ট পণ্ড হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে ‘এইলাল’ অর্থাৎ ‘তার স্বরে নামোল্লাহ’ পদ দ্বারা বোঝানোর হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী দু'জন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ফতওয়ার উপর ভিত্তি করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে বিখ্যাত কবি ফরায়দাক-এর পিতা গালিব একটি উট যবেহ করেছিল। যবেহ করার সময় তাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এতদসত্ত্বেও হযরত আলী (রা) সে উটের গোশত **وَمَا أَهْلُ بِهِ لَقَبِيرَ اللَّهِ** আয়াতের মর্মানুষায়ী হারাম বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবীগণও হযরত আলী (রা)-এর এ সিদ্ধান্তে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছিলেন।

অনুরূপ ইমাম মুসলিম তাঁর গুস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে যে, একজন খ্রীলোক হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় কোন-না-কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন :

وَمَا مَذْبَحَ لَذَاكَ الْيَوْمَ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَكِنْ كَلُوا مِنْ أَشْجَارِهِمْ .

অর্থ—সে উৎসব দিবসের জন্য যেসব পণ্ড-যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার। —(তফসীরে কুরতুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭)।

মোটকথা, দ্বিতীয় সূরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহর নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সজ্জা বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন **وَمَا أَهْلُ بِهِ لَقَبِيرَ اللَّهِ** আয়াতের হুকুম। দ্বিতীয় আয়াত **وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصَبِ** এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ার এ শ্রেণীর পণ্ডর মাংসও হারাম হবে।

তৃতীয় সূরত হচ্ছে পণ্ডর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ককীরের নামে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেওয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পণ্ড আলোচ্য দু' আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না, এ শ্রেণীর পণ্ডকে কোরআনের ভাষায় 'বাহীরা' বা সায়েরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পণ্ড সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ কারো নামে কোন পণ্ড প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেওয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম, যেমন বলা হয়েছে :

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ .

অর্থ—আল্লাহ্ ছা'আলা বাহীরা বা সায়েরা সম্পর্ক কোন বিধান দেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পণ্ডটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাস্তব মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এক্ষেপ উৎসর্গিত পণ্ড অন্যান্য সাধারণ পণ্ডর মতই হালাল।

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পতর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে সাথে উৎসর্গ করা হয়েছে, তারই মালিকানাতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গকরণই বাড়িল, সুতরাং সে পতর উপর তার পরিপূর্ণ মালিকানা কায়ম থাকে। সেমতে উৎসর্গকারী যদি সেই পতর কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে দেয়, তবে ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য সেটি হালাল হবে। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পত-পাখি উৎসর্গ করে সেগুলো পুজারী বা সেবায়তদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়তরা সেসব পত বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পত ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও গীর-বুয়ূর্গের মাথারে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাথারের খাদেমরাই সাধারণত উৎসর্গিত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে থাকে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমগণের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ ইচ্ছাভিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীবজন্তু ক্রয় করা, যবেহ করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে মানত সম্পর্কিত মাস'আলা : আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুর নামে জীব-জানোয়ার উৎসর্গ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একটি মাস'আলা হচ্ছে পৌত্তলিকদের দেব-দেবী এবং কোন কোন অজ্ঞ মুসলমান কর্তৃক গীর-বুয়ূর্গদের মাথার-দরগায় যেসব মিষ্টান্ন বা খাদ্যবস্তু মানত করা হয় বা সেসবের নামে উৎসর্গ করা হয়, সেগুলোতেও মূল কারণ—‘আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা সান্নিধ্য অর্জনের লক্ষ্য থাকে বলেই অধিকাংশ কিক্‌হবিদ হারাম বলেছেন। আর এগুলো খাওয়া-পরা, অন্যকে খাওয়ানো এবং বেচাকেনা করাকেও হারাম বলা হয়েছে। বাহুর-রায়েক প্রভৃতি কিক্‌হর কিতাবে এ ব্যাপারে সবিস্তার বিবরণ রয়েছে। এই মাস'আলাটি উৎসর্গিত পত-সংক্রান্ত মাস'আলার উপর কেয়াস করে গ্রহণ করা হয়েছে।

কুধার আতিশয্যে নিরুপার অবস্থার বিধি-বিধান : উল্লিখিত আয়াতে চারটি বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর এর ব্যতিক্রমী বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ - اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

এই হুকুমে এতটুকু অবকাশ রাখা হয়েছে যে, কুধার আতিশয্যে যে ব্যক্তি নিতান্তই অনন্যোপায় হয়ে পড়বে, সে যদি উল্লিখিত হারাম বস্তু থেকে কিছুটা খেয়েও নেয়, তবে তার কোন পাপ হবে না। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো এই যে: (১) বাদ গ্রহণের প্রতি আত্মী হবে না এবং (২) প্রয়োজনের পরিমাণ অতিক্রম করবে না। নিম্নোদ্ধেহ আল্লাহ্ অজ্ঞত কর্মসকারী, মহা দয়ালু।

এখানে কুধার তাড়নায় মরণোন্মুখ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্য দু'টি শর্তে উল্লিখিত হারাম বস্তু নিতান্ত প্রয়োজন পরিমাণে খাওয়ার পাপকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় কুধার আতিশয্যে ব্যাকুল সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ কষ্ট কিংবা প্রয়োজনকে ব্যাকুলতা বলা হয় না। কাজেই যে লোক কুধার এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় যে, তখন কোন কিছু না খেতে পারলে জীবন বিপন্ন হয়ে

পাউবে, তখন সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে দু'টি শর্তে—এসব হারাম বস্তু খেয়ে নেওয়ার অবকাশ রয়েছে। একটি শর্ত হলো যে, উদ্দেশ্য হবে শুধুমাত্র জীশ বাঁচানো বা প্রাণ রক্ষা করা; খাবার যদি গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হবে না। দ্বিতীয়ত, সে খাবারের পরিমাণ এতটুকুতে সীমিত রাখবে, যাতে শুধু প্রাণটুকুই রক্ষা পেতে পারে, পেট ভরে খাওয়া কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া তখনও হারাম হবে।

ঔষধপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি, বলেছে **لا جناح عليه** (তাতে তার কোন পাপ নেই)। এর মর্ম এই যে, এসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক আছে তার অনন্যোপায় অবস্থায় প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কোন বস্তুর হালাল হওয়া আর গোনাহ মাফ হয়ে যাওয়া এক কথা নয়, এ দু'য়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় লোকদের জন্য যদি এসব বস্তু হালাল করে দেওয়া উদ্দেশ্য হতো, তাহলে হারাম বা অবৈধতাকে রহিত করে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এখানে 'তার কোন পাপ নেই' কথাটি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে এই তাৎপর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হারাম হওয়ার বিষয়টি যথাস্থানে বহাল রয়েছে এবং ক্ষেত্র খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার যে পাপ তাও পূর্বের মতোই বলবৎ রয়েছে। তবে অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য হারাম বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

অনন্যোপায় অবস্থায় ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তুর ব্যবহার : উপরোক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, কারো জীবন বিপন্ন হয়ে পড়লে সে ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তু ব্যবহার করতে পারে। তবে আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী এ ব্যাপারেও কিছু শর্ত রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, প্রকৃতই অনন্যোপায় এবং জীবন-সংশয়ের মত অবস্থা হতে হবে। সাধারণ কষ্ট বা রোগব্যাধির ক্ষেত্রে এ নির্দেশ কার্যকর হবে না। দ্বিতীয়ত, হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোন কিছুই যদি এ রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে কার্যকর না হয় কিংবা যদি পাওয়া না যায়। কঠিন ক্ষুধার সময়ও অবকাশ এমন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যখন প্রাণ রক্ষা করার মত আর অন্য কোন হালাল খাবার না থাকে কিংবা সংগ্রহ করার কোন ক্ষমতা না থাকে। তৃতীয়ত, সে হারাম বস্তু গ্রহণে যদি প্রাণ-রক্ষা পাওয়ার ব্যাধার্ট নিশ্চিত হয়। ক্ষুধার তাড়নায় অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য যেমন এক লোকমা হালাল মাংস খেয়ে নেওয়া সাধারণত তার প্রাণ রক্ষার নিশ্চিত উপায়। যদিও কোন ঔষধ এমন হয় যে, তার ব্যবহার উপকারী বলে মনে হয় বটে, কিন্তু তাহলে তার সুখের নিশ্চিত নয়, আত্মকল্যাণের ক্ষতি হতে পারে। এজন্যই হারাম বস্তু খাওয়ার উল্লিখিত ক্ষমতার ব্যতিক্রমী হকুমের আভ্যন্তর-সম্মতীয় হবে-যেমন এজন্যই হারাম বস্তু খাওয়া শর্ত কোরআনের আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, তার ব্যবহারে কোন উপভোগ যেন উদ্দেশ্য না হয় এবং যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়।

উল্লিখিত আয়াতের পরিষ্কার বর্ণনা ও ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা যেসব শর্ত ও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে জ্ঞান যায়, সে সমস্ত শর্তসাপেক্ষে বাবতীয় হারাম ও হারামি ঔষধের ব্যবহার তা খাবারই হোক কিংবা বাহ্যিক ব্যবহারেরই হোক সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ফিকহবিদগণের ঐকমত্যে জায়েয। এ সমস্ত শর্তের সারমর্ম হলো পাঁচটি বিষয় :

(১) অবস্থা হবে অনন্যোপায়। অর্থাৎ প্রাণনাশের আশংকা সৃষ্টি হলে, (২) অন্য কোন হালাল ঔষধ যদি কার্যকর না হয় কিংবা পাওয়া না যায়, (৩) এই ঔষধের ব্যবহারে আরোগ্য লাভ যদি নিশ্চিত হয়, (৪) এর ব্যবহারে যদি কোন আনন্দ উদ্দেশ্য না হয়, এবং (৫) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হয়।

অনন্যোপায় অবস্থা ব্যতীত সাধারণ চিকিৎসা ও ঔষধে হারাম বস্তুর ব্যবহার : অনন্যোপায় অবস্থা সংক্রান্ত মাস'আলাটি তো উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোরআনের স্পষ্ট আয়াত ও ওলামাগণের একমত্যে প্রমাণিত হয়ে গেল, কিন্তু সাধারণ রোগ-ব্যাদিতেও না-পাক ও হারাম ঔষধ ব্যবহার করা জায়েয কিনা, এ মাস'আলার ব্যাপারে ফকীহগণের মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহর মতে অনন্যোপায় অবস্থা এবং উল্লিখিত শর্তাশর্তের অবর্তমানে কোন হারাম বস্তু ঔষধরূপে ব্যবহার জায়েজ নয়। কারণ, হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্ ইমানদারদের জন্য কোন হারামের মধ্যে আরোগ্য রাখেন নি।” —(বুখারী)

অপরূপ কোন কোন ফকীহ হাদীসে উদ্ধৃত এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি হলো ওরায়নাবাসিগণের, যা সমস্ত হাদীস গ্রন্থেই উদ্ধৃত রয়েছে। তা হলো এই যে, এক সময় কিছু সংখ্যক গ্রাম্য লোক মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা ছিল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। মহানবী (সা) তাদেরকে উষ্ট্রীর দুধ ও মূত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করেছিল।

কিন্তু এ ঘটনায় এমন কতিপয় সম্ভাব্যতা বিদ্যমান, যাতে হারাম বস্তুর ব্যবহারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কাজেই সাধারণ রোগ-ব্যাদির ক্ষেত্রে অনন্যোপায় অবস্থা এবং শর্তসমূহের উপস্থিতি ছাড়া হারাম ঔষধ ব্যবহার না করাই হচ্ছে আসল হুকুম।

কিন্তু পরবর্তী যুগের ফকীহগণ বর্তমান যুগে হারাম ও নাপাক ঔষধপত্রের আধিক্য এবং সাধারণ অভ্যাস ও জনগণের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্য কোন হালাল ও পবিত্র ঔষধ এ রোগের জন্য কার্যকর নয় কিংবা পাওয়া না যাওয়ার শর্তে তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

كما في الدر المختار قبيل فصل البير اختلف في الدواى بالجرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر ولكن نقل المصنف ثم وهنا عن الحاوى قيل يرخص اذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء اخر كما رخص في الخمر للعطشان وعليه الفتوى . ومثله في العالكيه .

অর্থাৎ—দূর-মুখতার গ্রন্থের ‘বি’র বা কূপ-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখ রয়েছে যে, হারাম বস্তু-সামগ্রী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার প্রশ্নে মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণভাবে শরীয়ত অনুযায়ী উহা নিষিদ্ধ। যেমন, ‘বাহরোর-রায়েক’ গ্রন্থের স্তন্যদান সংক্রান্ত পরিচ্ছেদেও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু ‘তানবীর’ রচয়িতা এক্ষেত্রে স্তন্যদান সম্পর্কেও ‘হাবী কুদসী’ থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোন কোন ওলামা ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তু সামগ্রীর ব্যবহারকে এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, সে ঔষধের ব্যবহারে আরোগ্য লাভ সাধারণ ধারণায় নিশ্চিত হতে হবে এবং কোন হালাল ঔষধও তার বিকল্প হিসাবে যদি না থাকে। যেমন, একান্ত তৎক্ষণাত ব্যক্তির জন্য মদের এক ঘোট পান করে জীবন রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একই অভিমত আলমগিরিতেও ব্যক্ত করা হয়েছে।

মাসআলা : উল্লিখিত বিশ্লেষণে সে সমস্ত বিলেতী ঔষধপত্রের হুকুমও জানা গেল, যা ইউরোপ প্রভৃতি দেশ থেকে আমদানী হয়ে আসে এবং যাতে শরাব, এ্যালকোহল কিংবা অপবিত্র বস্তুর উপস্থিতি জানাও নিশ্চিত। বস্তুত যেসব ঔষধে হারাম ও নাপাক বস্তুর উপস্থিতি সন্দেহ, তার ব্যবহারে আরও অধিকতর অবকাশ রয়েছে। অবশ্য সতর্কতা উত্তম। বিশেষত যখন কোন কঠিন প্রয়োজন থাকে না তখন সতর্কতা অবলম্বন করাই কর্তব্য।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَهَ
بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْغُفْرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٢٠﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٢١﴾

(১৭৪) নিশ্চয় যারা গোপন করে, কিভাবে যা আল্লাহ নাখিল করেছেন এবং সেজন্য গ্রহণ করে অল্প মূল্য, তারা আস্তন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে। বস্তুত তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৫) এরাই হলো সে সমস্ত লোক, যারা খরিদ করেছে হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোষের উপর কেমন ধৈর্য ধারণকারী! (১৭৬) আর এটা এ জন্য যে, আল্লাহ সত্যসহ কিভাবে নাখিল করেছেন। আর যারা কিভাবে মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চিতই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এর পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব হারাম বস্তু-সামগ্রীর আলোচনা করা হয়েছিল, যেগুলো ছিল স্থূল বস্তু সম্পর্কিত যা ধরা-ছোঁয়া বা অনুভব করা যায়। পরবর্তীতে এমন কতকগুলো হারাম বিষয়ের আলোচনা করা হচ্ছে, যেগুলো ধরা-ছোঁয়ার মত স্থূল বস্তু নয়। সেগুলো হচ্ছে কতকগুলো গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মন্দ কাজ। যেমন, ইহুদী আলেমদের মাঝে একটি রোগ ছিল যে, তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাদের মনমত ভুল ফতোয়া দিত, এমনকি তাওরাতের আয়াতসমূহকেও বিকৃত করে তাদের মতলবমত বানিয়ে দিয়ে দিত। এ ক্ষেত্রে উন্নত-মুহাম্মদীর আলেমদের জন্যও সতর্কতা বিদ্যমান, তারা যেন এহেন গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকেন। রিপূর কামনা-বাসনা চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যেন সত্য বিধি-বিধান প্রকাশে দ্রুতি না করেন।

ধর্মকে বিক্রি করার শাস্তি : এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আল্লাহ্ কর্তৃক নাখিলকৃত কিতাবের বিষয়বস্তুকে যেসব লোক গোপন করে এবং এহেন খেয়ানতের বিনিময়ে সামান্য (পার্থিব) সম্পদ আদায় করে, তারা নিজেদের উদরকে আগুনের দ্বারাই ভর্তি করে চলছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন না তাদের সাথে (সদয়ভাবে) কথা বলবেন, আর নাইবা (তাদের পাপ মোচন করে) তাদেরকে পবিত্রতা দান করবেন। বন্ধুত্ব তাদের শাস্তি হবে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এরা এমন সব লোক, যারা (দুনিয়াতে তো) হেদায়েত পরিহার করে পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করছেই, (তদুপরি আখেরাতের) মাগফেরাত পরিত্যাগ করে (নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে) আযাব। অতএব, (তাদের দোষে গমনের সংসাহসকে ধন্যবাদ) কতই না সাহসী এরা। বন্ধুত্ব (উল্লিখিত সমস্ত) আযাব (তাদের উপর এজন্য এসেছে) যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কিতাবকে সঠিকভাবেই পাঠিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যেসব লোক (এমন যথার্থভাবে প্রেরিত গ্রন্থে) পথভ্রষ্টতা (আরোপ) করে, (তারা যে), অতি সুদূরপ্রসারী বিরোধিতায় লিপ্ত (হবে, তা বলাই বাহুল্য। আর এমন বিরোধিতার দরুন অবশ্যই তারা কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরীয়তের হুকুম-আহকামকে পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ খায়, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরছে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তা-ই। কোন কোন বিজ্ঞ আলোচকের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোষের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সেকথা পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
 الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

সূরা বাকারাহ
২৫৪-২৫৭ আয়াত

(৩) مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ — হযরত মুসা (আ)-এর সাথেই আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার আয়াতে (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ) (কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়) — আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মুসা (আ)-এর সাথে আল্লাহর কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿১৫৪﴾

(২৫৪) হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে রকমী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচাকেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফিররাই হলো প্রকৃত জালিম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহর পথে ব্যয় করতে দেরি করা অনুচিত : হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে রিয়িক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর, কিয়ামতের সে দিনটি আসার আগে যে দিন (কোন কিছুই নেক আমল বা সংকর্মের পরিপূরক হতে পারবে না। কেননা, সেদিন) বেচাকেনাও চলবে না (যে, কোন বস্তুর বিনিময়ে নেক আমল ক্রয় করবে)। আর না (অমন) বন্ধুত্ব থাকবে (যে, কেউ তোমাদেরকে নিজের নেক আমল দিয়ে সাহায্য করবে) আর নাইবা (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো) কোনও সুপারিশ (কার্যকর) হবে (ফলে তোমাদের আর সং কাজের প্রয়োজন হবে না)। কাফিররা (নিজের কর্মশক্তি এবং ধন-সম্পদ অস্থানে ব্যয় করে নিজের উপর) জুলুম করে। (তেমনভাবে তারা শারীরিক ও অর্থনৈতিক আনুগত্য পরিহার করে পাপাচারের পথ অবলম্বন করে। কাজেই তোমরা তাদের মত হয়ো না)।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরা ইবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতিনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সং কাজের মধ্যে জানমাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহর বিধানসমূহের অধিকাংশই জ্ঞান অথবা মাল সম্পর্কিত। তাছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাপে লিপ্ত হয়, এই জ্ঞানের মহত্ত্ব অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তি লাভই হলো যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ الشِّرْكَ آيَاتُهُ جَانِبُهُ تَأْتِيهِ الْمَوْتُ تَأْتِيهِ الْمَوْتُ تَأْتِيهِ الْمَوْتُ ۖ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ۖ وَهُوَ يَرْجِيهِ ۖ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ۖ وَهُوَ يَرْجِيهِ ۖ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ۖ وَهُوَ يَرْجِيهِ ۖ

এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও তালুতের ঘটনাতে বিদ্যুত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহর পথে বিনিয়োগ দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে : ... أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ — অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক ইবাদত ও মোয়ামেলাত নির্ভরশীল, তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী ক্রমকেও বেশির ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যাত্রা অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময়। পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ নিজে না ছাড়বেন।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

(২৫৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীব, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্মাত্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সেসবই তিনি জানেন; তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (এমন যে,) তিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। তিনি চিরজীব (যার কোনদিন মৃত্যু হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বকে) তিনি রক্ষা (করেন) ও আয়ত্তে রাখেন। না, তাঁকে তন্দ্রা কাবু করতে পারে, না নিদ্রা (কাবু করতে পারে)। তাঁর রাজত্বের আওতায়ই সব কিছু, (যা কিছু) আসমান ও যমীনে রয়েছে। এমন কে আছে, যে ব্যক্তি তাঁর নিকট (কারো জন্য) সুপারিশ করতে পারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত? তিনি জানেন (সমস্ত) সৃষ্টির, যাবতীয় অতীত ও বর্তমান অবস্থা। আর এ সৃষ্টিরাজির পক্ষে তাঁর জ্ঞান বিষয়গুলোর মধ্য থেকে কেউ কোন কিছুই নিজের জ্ঞান-সীমায় পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটা (জ্ঞানদান করতে তিনি) ইচ্ছা করেন ততটাই (পেতে পারে)। তাঁর সিংহাসনটি (এত বিরাট ও ব্যাপক যে,) সমস্ত আসমান ও যমীনকে নিজের বেষ্টনীতে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। আর আল্লাহ্র পক্ষে সে দু'টির (আসমান ও যমীনের) রক্ষণাবেক্ষণে কোনই অসুবিধা হয় না। তিনি মহান—মহীয়ান।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত : এ আয়াতটি কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মস্নাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল (সা) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয় করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল (সা) তা সমর্থন করে বললেন : হে আবুল মান্য়ার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

হযরত আবুযর (রা) রাসূল (সা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূল্লাহ্ (সা)! কোরআনের বৃহত্তম আয়াত কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, আয়াতুল-কুরসী। —(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, সূরা বাকারায় এমন একটি আয়াত রয়েছে, যা কোরআনের অন্য সব আয়াতের সর্দার বা নেতা। সে আয়াতটি যে ঘরে পড়া হয়, তা থেকে শয়তান বেরিয়ে যায়।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুম্বরে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন, “যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।” অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহুর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের প্রভা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের

অধিকারী হওয়া, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে পারে না। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এখন বিস্তারিতভাবে এর বাক্যগুলো লক্ষ্য করা যাক। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে।

প্রথম বাক্য : **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** —এতে ‘আল্লাহ্’ শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** —সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য। ‘ইলাহ্’ সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য : **الْحَيُّ الْقَيُّومُ** আরবী ভাষায় **حَيٌّ** অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহর নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। **قَيُّومٌ** শব্দ ‘কিয়াম’ শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকে বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। ‘কাইয়ুম’ আল্লাহর এমন এক বিশেষ গুণ, যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে ‘কাইয়ুম’ বলা জায়েয নয়। যারা ‘আবদুল কাইয়ুম’ নাম বিকৃত করে শুধু ‘কাইয়ুম’ বলে তারা গোনাহ্গার হবে।

আল্লাহর গুণবাচক নামের মধ্যে **حَيٌّ وَقَيُّومٌ** অনেকের মতে ‘ইসমে-আযম’। হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রাসূল (সা)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ে **يَا حَيُّ - يَا قَيُّومُ** বলছেন।

তৃতীয় বাক্য : **لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ** —এর যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। **نَوْمٌ** পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা‘আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে ‘কাইয়ুম’ শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা‘আলা। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিও কোন কারণ নেই। আর তার সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য : **لَا مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَافِي الْاَرْضِ** বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত "لام" অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে, সেসবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য : **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ** অর্থ হচ্ছে এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত; এতে কয়েকটি মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে। তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—রাসূল (সা) বলেছেন : হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। একে 'মাকামে-মাহমুদ' বলা হয়, যা হযুর (সা)-এর জন্য খাস; অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য : **مَا يَنْظُرُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অগ্র-পশ্চাৎ যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাৎ বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা আল্লাহর জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাৎ বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের ওপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য : **وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ** অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের কোন একটি অংশ বিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন, শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত—এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য : **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ** অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে

রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবু যর গিফারী (রা)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযর (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার ইখতিয়ারে আমার প্রাণ, তাঁর কসম—কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমীনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুরূপ।

নবম বাক্য : **وَلَا يَنْوَدُهُ حَفَظُهُمَا** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে এ দু'টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অমায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য : **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্ববর্তী নয়টি বাক্যে আল্লাহর সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহর 'যাত' ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ
وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

(২৫৬) দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'ভান্তত্ব'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল বা ভাস্তবায় নয়। আর আল্লাহ সবই শুনে এবং জানেন।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইসলাম) ধর্মে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা (আরোপের কোন স্থান) নেই, (কেননা) হেদায়েত নিশ্চয়ই গোমরাহী হতে পৃথক হয়ে গেছে। (অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা প্রকাশ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাতে জোর করার কোন স্থান নেই। 'ইকরাহ' বলা হয় অপছন্দনীয় কাজে কাউকে বাধ্য করাকে। আর ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে) কাজেই যারা শয়তানের প্রতি বিরূপ হবে এবং আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করবে) তারা অত্যন্ত শক্ত বৃত্তকে আশ্রয় করেছে। যা কোন প্রকারেই নষ্ট হতে পারে না। এবং আল্লাহ তা'আলা (বাহ্যিক) বিষয়েও অত্যন্ত শ্রবণকারী এবং (অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও) অত্যন্ত জ্ঞানের অধিকারী।

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে কোন শক্ত দড়ির বেটনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ির ছিঁড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিঁড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার।
—(বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জিহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ ইসলামে জিহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেওয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিহাদ করার বিনিময়ে কাকিরগণকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জিহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহর পছন্দনীয় নয়, অথচ কাকিররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ফাসাদকারীকে পছন্দ করেন না।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা জিহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে আদেশ দিয়েছেন। সেমতে জিহাদের মাধ্যমে অনাচারী জালিমদের হত্যা করা সাপ-বিছা ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

ইসলাম জিহাদের ময়দানে জীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনিভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিহাদ কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত উমর (রা) একজন বৃদ্ধা নাসারা জীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন সে জীলোক উত্তর দিল, انا عجزوز আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত উমর (রা) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন নি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন : اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জিহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ ও কেতালের নির্দেশ اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ আয়াতের পরিপন্থী নয়। —(মায়হারী)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولَئِكَ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٩﴾

(২৫৭) যারা ইমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোষখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا خَالِدُونَ .

আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোকের অভিভাবক যারা ইমান এনেছে। তাদেরকে তিনি (কুফরের) অন্ধকার থেকে বের করে (ইসলামের) আলোর দিকে আনয়ন করেন। আর যারা কাফির তাদের অভিভাবক হলো (মানুষ ও জিন) শয়তান। যে তাদেরকে (ইসলামের) আলো হতে বের করে (কুফরের) অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এসব মানুষ (যারা ইসলাম ত্যাগ করে কুফর গ্রহণ করে) দোষখের বাসিন্দা হবে (এবং) তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফির বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

الْمُتَرَاتِلِ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦٠﴾

(২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন। ইবরাহীম

সূরা বাকারাহ
২৬৭-২৭৩ আয়াত

উপার্জন করার কিংবা পুনরায় বাগান করার শক্তি রাখে না। কেননা, মৃত্যুর পর মানুষের সৎ-অসৎ সব কাজকর্মই বন্ধ হয়ে যায়। ছা-পোষা বৃদ্ধ স্বভাবতই অতীত উপার্জন সংরক্ষিত রাখার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী থাকে, যাতে বৃদ্ধ বয়সে তা কাজে লাগে। যদি এমনভাবে তার বাগান ও অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তার দুঃখ-দুর্দশার অবধি থাকবে না। এমনভাবে লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কৃত দান-খয়রাত ঘোর প্রয়োজনের মুহূর্তে তার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদ্কা ও খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে ইখলাস অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের জন্য নয়।

এখন সমগ্র রুকূর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর পথে ব্যয় ও সদ্কা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমত, যে ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়ত, বিতর্ক খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থত, খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমত, যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠত, যা কিছু ব্যয় করা হয়, খাঁটি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে—নাম-যশের জন্য নয়।

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। অভাবমুখী ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা কিংবা ওয়াক্ফ করে দেওয়া সুন্নাহর শিক্ষা পরিপন্থী। এ ছাড়া আল্লাহর পথে ব্যয় করার হাজারো পছা রয়েছে।

সুন্নত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে খাত নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণত এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে সৎ কাজ মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং খাতটি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও জরুরী। যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্য স্বীয় সহায়-সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়, এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِثُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٩٩﴾
 الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ
 مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٠٠﴾ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ
 مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا
 يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٠١﴾ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ
 نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
 مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٣٠٢﴾ إِنْ تُبَدُّوا إِلَى الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا
 وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّنْ
 سَيِّئَاتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٠٣﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْكُمْ
 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
 خَيْرٍ يُّؤْتِ الْيَتَامَىٰ وَإِنَّكُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿٣٠٤﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ
 أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ
 النَّاسَ الْإِحْقَاقَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٣٠٥﴾
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْكَيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
 فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٣٠٦﴾

(২৬৭) হে ইমানদারগণ ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনস্থ করো না; কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না; তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিরে নাও ! জেনে রেখ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, গুণী। (২৬৮) শরতান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে, এবং অশ্রীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে কমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। (২৭০) তোমরা যে খয়রাত বা সদ্দায় কর কিংবা কোন মানত কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেসব কিছু জানেন। অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিবে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কিছু গোনাহ্ দূর করে দেবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে সংপথে আনার দায় তোমার নয়। বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সংপথে পরিচালিত করেন। যে মাল তোমরা ব্যয় কর, তা নিজ উপকারার্থে কর। আল্লাহ্‌র সমুদ্রি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। (২৭৩) খয়রাত এসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে—জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। অস্ত্র লোকেরা যাচঞা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত। (২৭৪) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের সওয়াব রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের কোন আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ইমানদারগণ ! স্বীয় উপার্জন থেকে উত্তম বস্তু (সং কাজে) ব্যয় কর এবং তা (উত্তম বস্তু) থেকে যা আমি তোমাদের (ব্যবহারের) জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি এবং অকেজো বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না, অথচ (এমন বস্তুই যদি কেউ তোমাদেরকে প্রাপ্যের বিনিময়ে কিংবা উপটৌকনরূপে দিতে চায়, তবে) তোমরা কখনও তা নেবে না; কিন্তু চক্ষু বুঁজে (এবং

খাতিরে যদি নিয়ে নাও, তবে ভিন্ন কথা) এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন, (যে, তিনি এমন একেজো বস্তুতে সমুদ্র হবেন, তিনি) প্রশংসার যোগ্য (অর্থাৎ সন্তা ও গুণাবলীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব তাঁর দরবারে প্রশংসার যোগ্য বস্তুই পেশ করা দরকার)। শয়তান তোমাদিগকে অশান্ত-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে (অর্থাৎ যদি ব্যয় কর কিংবা উত্তম বস্তু ব্যয় কর, তবে দরিদ্র হয়ে যাবে) এবং তোমাদের মন্দ বিষয়ের (অর্থাৎ কুপণতার) পরামর্শ দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেন (ব্যয় করলে এবং উত্তম বস্তু ব্যয় করলে) নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেওয়ার এবং বেশি দেওয়ার (অর্থাৎ সংকাজে ব্যয় করা যেহেতু ইবাদত এবং ইবাদত গোনাহর কাঙ্ক্ষার হয়ে যায়, তাই ব্যয় দ্বারা গোনাহও মাফ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতেই এবং পরকালে সবাইকে ব্যয়ের প্রতিদান-বেশি বেশি দান করবেন।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময় (তিনি সবকিছু দিতে পারেন), সুবিজ্ঞ (নিয়ত অনুযায়ী ফল দান করেন। এসব কথা সুস্পষ্ট, কিন্তু এগুলো সেই বুঝে)। যার মধ্যে ধর্মের জ্ঞান রয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ধর্মের জ্ঞান দান করেন এবং (সত্য কথা হলো এই যে,) যাকে ধর্মের জ্ঞান দান করা হয় সে বিরাট কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (কেননা, জগতের কোন নিয়ামত এ নিয়ামতের সমান উপকারী নয়।) বস্তুত উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান (অর্থাৎ বিতৃষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী)। তোমরা যে কোন প্রকার ব্যয় কর কিংবা কোন রকম মানত কর, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই সবকিছু জানেন এবং অন্যায়কারীদের (কিয়ামতে) কোন সাধী (সাহায্যকারী) হবে না। যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবুও ভাল, আর যদি গোপনে কর এবং (গোপনে) অভাবগ্রস্তদেরকে দিয়ে দাও, তবে গোপনে দেওয়া তোমাদের জন্য আরো উত্তম এবং আল্লাহ্ তা'আলা (এর বরকতে) তোমাদের কিছু গোনাহও দূর করে দেবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কৃতকর্মের খুবই খবর রাখেন। (অনেক সাহাবী কাফিরদেরকে এ উদ্দেশ্যে খয়রাত দিতেন যে, সম্ভবত এ কৌশলে কিছু লোক মুসলমান হয়ে যাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ [সা]ও এ মতই প্রকাশ করেছিলেন। তাই এ আয়াতে উভয় প্রকার সম্বোধন করে বলা হচ্ছে : হে মুহাম্মদ [সা]) তাদেরকে (কাফিরদেরকে) সংপথে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্বে (ফরয-ওয়াজিব) নয় (যে কারণে এত সূক্ষ্ম আয়োজন করতে হবে), কিন্তু (এটি তো) আল্লাহ্ তা'আলা (র কাজ) যাকে ইচ্ছা, সংপথে নিয়ে আসবেন। (আপনার কাজ শুধু হেদায়েত পৌঁছে দেওয়া—কেউ হেদায়েতে আসুক বা না আসুক। হেদায়েত পৌঁছানো এ নিষেধাজ্ঞার উপর নির্ভরশীল নয় এবং (মুসলমানরা) তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিজ উপকারার্থেই কর। (এ উপকারের বর্ণনা এই যে,) তোমরা আল্লাহ্র সমুদ্র ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না (সওয়াব হলো দানের অবশ্যম্ভাবী ফল। এ উদ্দেশ্যে যে কোন অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করলে তা অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় মুসলমান অভাবগ্রস্তকেই বিশেষভাবে কেন দেওয়া হবে ?) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করছ, তার সবই (অর্থাৎ এর প্রতিদান ও সওয়াব) পুরোপুরি তোমরা (পরকালে) পেয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য মোটেও হ্রাস করা হবে না। (অতএব, প্রতিদানের

প্রতিই তোমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রতিদান সর্বাবস্থায় পাওয়া যাবে। কাজেই তোমাদের এ চিন্তা করা উচিত নয় যে, তোমাদের সদকা মুসলমানরাই পাবে—কাফিররা পাবে না। সদকা-খয়রাতের) প্রকৃত হকদার ঐ সকল গরীব লোক; যারা আল্লাহর পথে (অর্থাৎ ধর্মের কাজে) আবদ্ধ হয়ে গেছে (এবং ধর্মের কাজে বন্দী ও মশগুল হওয়ার কারণে) তারা (জীবিকার খোঁজে) দেশের কোথাও চলাফেরা করার (স্বভাবগতভাবে) শক্তি রাখে না (এবং) অজ্ঞ লোকেরা এদেরকেই ধনী মনে করে তাদের যাচঞা থেকে বিরত থাকার কারণে। (তবে) তোমরা তাদেরকে তাদের (লক্ষণ ও) গতি-প্রকৃতি দেখে চিনতে পার। (কেননা, দারিদ্র্য ও উপবাসের কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও শরীরে এক প্রকার দুর্বলতা অবশ্যই বিরাজ করে এবং এমনিতেও) তারা মানুষকে পথ আগলিয়ে ভিক্ষা করে না—(যাতে কেউ তাদেরকে অভাবগ্রস্ত বলে মনে করতে পারে। অর্থাৎ তারা ভিক্ষা চায়-ই না। কেননা, যারা চেয়ে অভ্যস্ত, তারা অধিকাংশ সময় পথ আগলিয়েই চায়) এবং (তাদের সেবার জন্য) তোমরা যা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা খুব পরিজ্ঞাত। (অন্যদেরকে দেওয়ার চাইতে তাদের সেবার সওয়াব অধিক দেবেন) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাতে অথবা দিনে (অর্থাৎ কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট না করে) গোপনে ও প্রকাশ্যে (অর্থাৎ কোন বিশেষ অবস্থা নির্দিষ্ট না করে) তারা তাদের সওয়াব পাবে (কিয়ামতের দিন) স্বীয় পালনকর্তার কাছে। আর (সেদিন) তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী রুকুতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুকুর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا... غَنَىٰ حَمِيدٌ — শানে-নুযুল দৃষ্টে طيب শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্য নিকট বস্তু নিয়ে আসত; এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালালও হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট—দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেওয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকট বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করে مَأْكُوتٍ এবং اٰخِرَجْنَا শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর لَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ বাঁকা দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে একেজো জিনিস ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির কাছে মূলতই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَا كَسَبْتُمْ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাস'আলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী (সা) বলেন : اولادكم من — তোমাদের সন্তান-সন্ততি طيب اكسابكم فكلوا من اموال اولادكم هنيئاً তোমাদের উপার্জনের একটি পুত-পবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর। —(কুরতুবী)

اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ শব্দ —بَاكِيَ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিনে (যে জমিনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন যে, ওশরী যমীনে ফসল অল্প হোক বা বেশি হোক ওশর দেওয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের اَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক ইবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—যাকাত। এ কারণেই ওশরকে 'যাকাতুল-আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ নিরেট কর। এতে ইবাদতের কোন দিক নেই। মুসলমানরা ইবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেওয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অমুসলিমরা ইবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যগত আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্যদ্রব্যের উপর বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত মাস'আলা বর্ণনার স্থান এটা নয়। ফিক্হ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ.....وَمَا يَذْكُرُ الاْ اَوَّلُوْا الْاَنْبَاَبِ -

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষত আল্লাহ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এখানে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি—প্ররোচনা ও নির্দেশ নেওয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদকা-খয়রাত করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন কিছুই অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

হিকমতের অর্থ ও ব্যাখ্যা : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ — 'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা

করা হয়েছে। তফসীর বাহুরে-মুহীতে তফসীরকারগণের এ সম্পর্কিত প্রায় ত্রিশটি উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে : প্রকৃতপক্ষে এগুলো প্রায় কাছাকাছি উক্তি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই, অভিব্যক্তির পার্থক্য মাত্র **حكمة** শব্দটি **احكام** -এর ধাতু। এর অর্থ কোন কর্ম অথবা উক্তিকে তার গুণাবলীসহ পূর্ণ করা।

এ কারণেই বাহুরে-মুহীতে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কিত সূরা বাকারার **اِنَّهُ اللّٰهُ الْمَلِكُ وَالْحَكْمَةُ** —আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

والحكمة وضع الامور في محلها على الصواب وكمال ذلك انما يحصل بالنبوة—

—হিকমতের আসল অর্থ প্রত্যেক বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করা। এর পূর্ণত্ব শুধুমাত্র নবুয়তের মাধ্যমেই সাধিত হতে পারে। তাই এখানে হেকমত বলতে নবুয়ত বোঝান হয়েছে।

ইমাম রাগেব ইম্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে বলেন : হেকমত শব্দটি আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হবে সমগ্র বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান এবং নিখুঁত আবিষ্কার। অন্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হলে এর অর্থ হয় সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান এবং তদনুযায়ী কর্ম।

এ অর্থটিই বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোথাও এর অর্থ নেওয়া হয়েছে কোরআন, কোথাও হাদীস, কোথাও বিত্তজ্ঞান, কোথাও সংকর্ম, কোথাও সত্য কথা, কোথাও সুস্থ বুদ্ধি, কোথাও ধর্মের বোধ, কোথাও মতামতের নির্ভুলতা এবং কোথাও আল্লাহর ভয়। শেষোক্ত অর্থটি স্বয়ং হাদীসে উল্লিখিত আছে। বলা হয়েছে **رأس الحكمة خشية الله** —অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ই প্রকৃত হেকমত।

يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ আয়াতে হেকমতের ব্যাখ্যা সাহাবী ও তাবে তাবেয়ীগণ কর্তৃক হাদীস ও সুন্নাহ বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, আলোচ্য **بُؤَتِ الْحِكْمَةُ** আয়াতে পূর্ববর্ণিত সবগুলো অর্থই বোঝানো হয়েছে। —(বাহুরে-মুহীত, ৩২০ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড)

এ উক্তিই শব্দটির সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট অর্থবোধক। **وَمَنْ يُّؤَتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ** বাক্য থেকেও এর দিকে ইশারা বোঝা যায়। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে, যাকে হেকমত দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রভূত মঙ্গল ও কল্যাণ দেওয়া হয়েছে।

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ ... وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

কোন প্রকার ব্যয় বলতে সর্বপ্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ; যে ব্যয়ে সব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং যে ব্যয়ে সবগুলোর কিংবা কতকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। উদাহরণত আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়নি বরং গোনাহর কাজে ব্যয় করা হয়েছে, কিংবা লোক-দেখানো ব্যয় করা হয়েছে অথবা ব্যয় করে অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা হালাল ও উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করা হয়নি ইত্যাদি, সর্বপ্রকার ব্যয়ই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমনভাবে ‘মানত’ শব্দের ব্যাপকতায় সর্বপ্রকার মানতই এসে গেছে। উদাহরণত আর্থিক ইবাদতের মানত। এ সাদৃশ্যের কারণেই ব্যয়ের সাথে মানতের উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দৈহিক ইবাদতের মানত; তা আবার শর্তহীন হোক কিংবা শর্তযুক্ত হোক, তা পূর্ণ করা হোক বা না করা হোক ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানতই আয়াতে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার ব্যয় ও সর্বপ্রকার মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেবেন। সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য ভীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে শাস্তিবাণী শুনিতে দেওয়া হয়েছে।

انْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعِمَ هِيَ ... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

বাহ্যত এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান রয়েছে। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক-দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। জাগতিক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন স্থলে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।

يُكْفَرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ — গোপনে দান করার সাথেই গোনাহর কাফফারা সম্পর্কযুক্ত নয়— শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ গোপনে দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরূপ উপকার।

لَيْسَ عَلَيْكَ هَذَا هُم ... وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ — এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবেও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে। এমনতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধু মুসলমানকেই দেবে—কাফিরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়।

এখানে আরও বুঝে নেওয়া দরকার যে, এ সদকা অর্থ নফল সদকা, যা বিশ্বী কাফিরকেও দেওয়া জায়েয। এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা বোঝান হয়নি। ফরয সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেওয়া জায়েয নয় —(মায়হারী)

মাস'আলা : দারুল-হরবের কাফিরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেওয়া জায়েয নয়।

মাস'আলা : বিশ্বী কাফির অর্থাৎ যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু যাকাত ও গুশর দান করা জায়েয নয়। অন্য সব ওয়াজিব ও নফল সদকা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

এখানে ফকীর বলতে ঐ সকল লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ — এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দূরন্ত হবে।

—(কুরতুবী)

تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ —এতে বোঝা যায় যে, লক্ষণাদি দেখে বিচার করা অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না। —(কুরতুবী)

لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا —এ আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, তারা পথ আগলিয়ে সওয়াল করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়াল করে না —এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার জা-ই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়াল করে না—
لأنهم متعففون عن المسئلة عفة —এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের কারণ, তারা সওয়াল করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে। —(কুরতুবী)

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ —এ সপ্তম আয়াতে ঐ সকল লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খরচাতের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনভাবে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, খাঁটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেওয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রুহুল-মা'আরীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একবার দশ হাজার দিরহাম দিনে, দশ হাজার দিরহাম রাতে, দশ হাজার দিরহাম গোপনে ও দশ হাজার দিরহাম প্রকাশ্যে—এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দিরহাম আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবু বকর (রা)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নুযুল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতে শানে-নুযুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَاسَلَفٌ ۖ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۚ

সূরা ইব্রাহীম
৩৫-৫২ আয়াত

হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পদ দান ও নিরামত্তের গণনা কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিরামত্তের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকের জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাকের দাবী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সন্তোষ খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকের আদান করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকের আদানের হুজাতিমিত্ত করে নেন। আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন :

إِن لَّكَ قَد شُكِرْتَ بِدَاوُدَ - অর্থাৎ স্বীকারোক্তি করাই শোকের আদানের

জনা যথেষ্ট।

আল্লাহের ক্ষেমে বলা হয়েছে : إِنَّا لَنَحْنُ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ - অর্থাৎ মানুষ

খুবই জাগ্রিম এবং অভাবিক অকৃতজ্ঞ। উদ্বেগ, কষ্ট ও বিপদে সত্তর করা, সুখ ও মনকে অভিযোজ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিশেষের লক্ষ থেকে এসেছে বিশ্বাস বিপদকে নিরামত্তই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বাভ্যাস করণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাকের তাকিদ। কিন্তু সাধারণত মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। এ কারণেই

পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মু'মিনের ওপর شُكْرٌ وَ مَهَارٌ (অধিক সন্মানকরী, অধিক শোকস্বকরী) ব্যক্ত হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّرِّ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلُنُ وَمَا يَكْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّاءِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمٰوِيْلَ وَاسْتَقٰمَ
 اِنَّ رَبِّيْ تَسْبِيْحُ الدُّعَا ۝ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ
 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ
 يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

(৩৫) যখন ইবরাহীম বললেন : হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (৩৬) হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সম্মুখে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কয়েময় রাখে। অতঃপর আপনি কিছুমোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ক্ষমাদি দ্বারা ক্ষমা দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনিতো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্দাকে ইসমাদীল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া গ্রহণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কয়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমার দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার গিতিমাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কয়েম হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এ সময়টিও স্মরণক্ষেপ) যখন ইবরাহীম (আ) (হযরত ইসমাদীল ও হযরত হাজেরাকে আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় প্রান্তরে এনে রাখার সময় দোয়া করে) বললেন : হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে শান্তির আশ্রয় করে দিন (অর্থাৎ এর অধিবাসীরা শান্তিতে থাকুক। উদ্দেশ্য, একে হরম করে দিন) এবং আমাকে ও আমার বিশেষ সন্তানদেরকে মূর্তি উপাসনা থেকে (যা এখন মূর্তীদের মধ্যে প্রচলিত আছে) দূরে রাখুন (যেমন এ যাবত দূরে রেখেছেন)। হে আমার পালনকর্তা, (আমি মূর্তিদের উপাসনা থেকে দূরে থাকার দোয়া এ জন্য করছি যে) এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। (অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে। এজন্য ভীত হয়ে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি যেমনি সন্তানদেরকে দূরে রাখার দোয়া করি, তেমন তাদেরকেও উপদেশ দান কর্তে

থাকবে।) অতঃপর (আমার উপদেশ দানের পর) যে আমার পথে চলবে, সে আমার (এবং তার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা আছেই) এবং যে (এ ব্যাপারে) আমার কথা মানবে না, (তাকে আপনি হিদায়ত করুন। কেননা) আপনি অত্যন্ত ক্ষমালীন, দয়ালু। (হিদায়ত দিয়ে তাদের ক্ষমা ও দয়ার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এ দোয়ার উদ্দেশ্য মু'মিনদের জন্য সুপারিশ এবং অমু'মিনদের জন্য হিদায়ত প্রার্থনা।) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজ সন্তানদেরকে (অর্থাৎ ইসমাইল ও তার মাধ্যমে তার ভাবী বংশধরকে) আপনার পবিত্র গৃহের (অর্থাৎ খানাহে কা'বার) নিকটে (যা পূর্ব থেকে নির্মিত ছিল এবং মানুষ সর্বদা যার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে আসছিল) একটি (অপরিসর) প্রান্তরে (যা কংকর-ময় হওয়ার কারণে) চাষাবাদযোগ্য (-ও) নয়, আবাদ করছি। হে আমাদের পালনকর্তা, (পবিত্র গৃহের নিকটে এজন্য আবাদ করছি) যাতে তারা নামাযের (বিশেষ) বন্দোবস্ত করে। (এবং যেহেতু এখন এটা একটা অপরিসর প্রান্তর) অতএব আপনি কিছু লোকের অঙ্কুর এদিকে আকৃষ্ট করে দিন (যেন তারা এখানে এসে বসবাস করে এবং এটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায়।) এবং (যেহেতু এখানে চাষাবাদ নেই, তাই) তাদেরকে (স্বীয় কুদরত বলে) ফল-মূল আহাৰ্য দান করুন—যাতে তারা (এসব নিয়ামতের) শোকর আদায় করে। হে আমাদের পালনকর্তা, (এসব দোয়া একমাত্র নিজের দাসত্ব ও অভাব প্রকাশের জন্য—আপনাকে অভাব সম্পর্কে ভাঙ করার জন্য নয়। কেননা) আপনি তো সবকিছু সম্পর্কে ভাঙ, যা আমরা গোপন রাখি এবং যা প্রকাশ করি এবং (আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ই বলব কেন) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে (তো) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কোন কিছুই অপ্রকাশ্য নয়। (আরও কিছু দোয়া পরে উল্লিখিত হবে। যাবত্থানে কিছু সংখ্যক সাবেক নিয়ামতের কারণে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাতে কৃতজ্ঞতার বরকতে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাই বলেছেনঃ) সব প্রশংসা (ও গুণ বর্ণনা) আল্লাহর জন্য (শোভা পায়) যিনি আমাকে বুদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক (দু'পুত্র) দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া প্রবণকারী।

(অর্থাৎ কবুলকারী। সেহেত সন্তান দান সম্পর্কিত আমার দোয়া رَبِّ هَبْ لِي مِن

الْمَالِ الْحَيِّ কবুল করেছেন। অতঃপর এই নিয়ামতের শোকর আদায় করে অবশিষ্ট

দোয়াংশ করছেনঃ) হে আমার পালনকর্তা, (আপনার পবিত্র গৃহের কাছে আমি আমার সন্তানদেরকে আবাদ করেছি। উদ্দেশ্য, তারা নামায কালেয় করুক। আপনি আমার এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। তাদের জন্য নামামের বন্দোবস্ত করা যেমন আমার কাম্য, তেমনিভাবে নিজের জন্যও কাম্য। তাই নিজের ও তাদের উভয় পক্ষের জন্য দোয়া করছি। যেহেতু আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবিধ্বাসীও হবে, তাই দোয়া করার জন্য করতে পারি না। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া করছি যে) আমাকেও নামায কালেয়কারী রাখুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যককে

(নামায কালেমকারী করুন)। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমার (এই) দোয়া কবুল করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে হিসাব কালেম হওয়ার দিন। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা করুন।)

আনুশঙ্গিক ভাষা বিবরণ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত মূর্খতা ও নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। তওহীদের ব্যাপারে পয়গম্বরগণের মধ্যে সবচাইতে অধিক সফল জিহাদ হয়রত ইবরাহীম (আ) করেছিলেন। এ জন্যই ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিশেষভাবে 'দীনে-হানীফ' বলা হয়।

এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতসমূহে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আরও একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী

الَّذِينَ يَدْعُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ تَقْرًا

আয়াতে মক্কার এসব কাকিরের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ঈমানকে কুফরে এবং তওহীদকে শিরকে রূপান্তরিত করেছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে তাদের ঔর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর আকীদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে পিতৃ অনুসরণে অভ্যস্ত কাকিররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত হয়।

—(বাহরে মুহীত)

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষ্যেই কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি, বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে যেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোকে ভাস্কর রাখার জন্য এসব ঘটনা বারবার কোরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম দোয়া : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا

এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাকারারও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

সেখানে بَلَدًا مَّأْمُونًا অর্থ নিরাপত্তা বলা হয়েছে। এর অর্থ অনিদিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ আরসাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কা যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নিদিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মৃত্যুপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পন্থগত্বরূপ নিষ্পাদ। তাঁরা নিরাক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হয়রত ইবরাহীম (আ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পন্থগত্বরূপ সর্বদা শংকা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকৈ মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় शामिल করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা খ্রীষ দোস্তের দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা নিরাক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রব উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধা-রূপভাবে হয়রত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার বরাতে দিয়ে ইসমাইল (আ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাইল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেন নি। বরং যে সময় তুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তান-দেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুজাহর স্মারক হিসাবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করত। এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না। বরং বায়তুজাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এবং বায়তুজাহর তাওয়াফ করা যেমন আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তাওয়াফ করাকে আল্লাহর ইবাদতের পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আ) খ্রীষ পিতা ও জাতির অভিভূতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

ثُمَّ تَبَعْنِي فَاتَّبَعْنِي وَنَنصَرُ بِكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ سَعِيرٍ

অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও রূপা করা হবে, তা বলাই বাহ্যিক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাতীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার রূপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুকরী ও অস্বীকৃতি নেওয়া হয়, তবে কাকির ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আ)-কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমনভাবেই তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে : এখানে হয়রত ইবরাহীম (আ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেন নি। একথা

বলেন নি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পরগম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পরগম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাকিরও যেন আঘাতে পতিত না হয়। “আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু”—একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেন নি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হয়রত ইসা (আ)-ও স্বীয় উম্মতের কাকিরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন :

وَأَنْتَ تَغْفِرُ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ—অর্থাৎ আপনি যদি

ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রভাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আজাহ্ তা'আলার এ দু'জন মনোনীত পরগম্বর কাকিরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন নি। কারণ এটা ছিল আদব ও নিষ্ঠাচরিত্রের পরিপন্থী। কিন্তু একথাও বলেন নি যে, কাকিরদের উপর আঘাত নাহিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ তৎপরিতে তাদের ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

বিধান ও নির্দেশ : দোয়া প্রত্যেকেই করে কিন্তু দোয়ার সঠিক চণ্ড সবায় জানা থাকে না। পরগম্বরগণের দোয়া শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকে। দোয়ায় কি জিনিস চাওয়া বিধেয় পরগম্বরগণের দোয়া থেকে তা অনুমান করা যায়। হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচ্য দোয়ায় দু'টি অংশ রয়েছে। এক, মক্কা শহরকে ভয় ও আশংকামুক্ত শান্তির আবাসস্থান করা। দুই, স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে যুতিপূজা থেকে চিরতরে মুক্তি দান করানো।

চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দু'টি বিষয়ই হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণের মৌলিক ধারা। কেননা মানুষ যদি বসবাসের জায়গায় ভয়, আশংকা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে দূর্ভাবানুভূত হতে না পারে, তবে জাগতিক ও বৈশ্বয়িক এবং ধর্মীয় ও আত্মিক কোন দিক দিয়েই তার জীবন সুখী হতে পারে না। জগতের যাবতীয় কর্ম ও সুখ যে শান্তি ও মানসিক স্থিরতার উপর নির্ভরশীল, একথা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি শত্রুর হাযলা ও বিভিন্ন প্রকার বিপদাশংকায় পরিবেষ্টিত থাকে, তার কাছে জগতের বৃহত্তম নিয়ামত, পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণের সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দাখান-কোঠা ও বাংলো এবং অর্থ সম্পদের প্রাদুর্ভ—সবই তিস্ত বিবাদ মনে হতে থাকে।

ধর্মীয় দিক দিয়েও প্রত্যেক ইবাদত ও আজাহ্‌র নির্দেশ পালন করা তখনই সম্ভবপর, যখন মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তির পরিবেশ বিরাজমান থাকে।

তাই হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম দোয়ায় মানসিক কল্যাণের, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব প্রয়োজন বোঝান হয়েছে। এই একমুখী মাধবাক্ষা দ্বারা তিনি সন্তান-সন্ততির জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রার্থনা করেছেন।

এ দোয়া থেকে আরও জানা গেল যে, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের

অর্থনৈতিক সুখস্বচ্ছন্দ্যের সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করাও পিতার অন্যতম কর্তব্য। এর চেণ্টা মুহুদ তথা দুনিয়ার ভালবাসা বর্জনের পরিণতী নয়।

দ্বিতীয় দোয়ান্নও অনেক ব্যাপকতা আছে। কেননা, যে পাপের ক্ষমা নেই তা হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। তিনি এ পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেছেন। এর পর কোন পাপ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অন্যান্য আমল দ্বারাও হতে পারে এবং কীরক সুপারিশ দ্বারাও মাক্ফ হয়ে যেতে পারে। যদি মূর্তিপূজা শব্দটিকে সূফী বুয়ুগদের ভাষা অনুযায়ী ব্যাপকতর অর্থে ধরা হয়, তবে যে বস্তু মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়, তাই তার জন্য মূর্তি বিশেষ এবং এর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে পরাভূত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অব্যাহত-ভায় লিপ্ত হওয়া তার জন্য পূজা সমতুল্য। অতএব মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখার দোয়ার মধ্যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে হিফায়ত করার বিষয়বস্তু এসে গেছে। কোন কোন সূফী বুয়ুগ এ অর্থেই নিজের মনকে সন্তোষন করে গোনাহ ও গাফিলতির প্রতি উৎসর্গ করেছেন :

سودا گشت از سجد راه بتان پيها نيم
چند بر خود تهمت دين معلاني نيم

সাধক রাসী বলেন : پر خيال شہوتے دورۂ بتے ست :

তৃতীয় আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আরও একটি বিজুলভ দোয়া বর্ণিত হয়েছে : **رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ لَا دِيْنًا** - হে আমার পালনকর্তা! আমি কিছু সংখ্যক

পরিবার-পরিজনকে পাহাড়ের এমন এক পাদদেশে আবাদ করেছি, যেখানে চাষাবাদের সম্ভাবনা নেই (এবং বাহ্যত জীবনধারণের কোন উপকরণ নেই)। পাহাড়ের এ পাদদেশটি আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটে অবস্থিত। এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা নামায কামেয় করে। এজন্য আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন, যাতে তাদের সম্প্রীতি ও বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তাদেরকে ফল দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার একটি পটভূমি আছে। তা এই যে, নূহ (আ)-এর আমলে মহা প্লাবনে কা'বা গৃহের প্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর এ পবিত্র ঘর পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজের জন্য মনোনীত করেন, এবং তাকে স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া থেকে হিজরত করে এই শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপন করার আদেশ দেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ইসমাইল (আ) তখন দুঃখগোম্য শিশু ছিলেন। ইবরাহীম (আ) আদেশ অনুযায়ী তাঁকে ও তাঁর জননী হাজেরাকে বর্তমান কা'বাপুহ ও যমযম কূপের অদূরে রেখে দিলেন। তখন এ স্থানটি পাহাড় বেষ্টিত জনশূন্য প্রান্তর ছিল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ও জনবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। ইবরাহীম (আ) তাঁদের জন্য একটি পাত্রে কিছু খাদ্য এবং মশকে পানি রেখে দিলেন।

এরপর ইবরাহীম (আ) সিরিয়ার প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান। যে জায়গায় আদেশটি লাভ করেন, সেখান থেকেই আদেশ পালন করতে রওনা হয়ে যান। স্ত্রী ও দুঃখগোষ্য সন্তানকে জনমানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে যাওয়ার কলে তাঁর মধ্যে যে মানসিক প্রতিতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারণিত পরবর্তী দোয়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্ব করাও সমীচীন মনে করেন নি যে, হাজারেক সংবাদ দেবেন এবং কিছু সাম্প্রদায়িক বাক্য বলে যাবেন।

কলে হয়রত হাজারে যখন তাঁকে যেতে দেখলেন, তখন ব্যস্ততার ভেত্রে বললেন, আপনি আমাদেয়কে কোথায় ছেড়ে যাবেন? এখানে না আছে কোন মানুষ এবং না আছে জীবনধারণের কোন উপকরণ। কিন্তু হয়রত ইবরাহীম (আ) গেছেন ফিরে দেখলেন না। সম্ভবত তিনি আল্লাহ তা'আলাই আদেশ পেয়েছেন। তাই পুনরায় ভেবে জিজ্ঞেস করলেন: আল্লাহ কি আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন? তখন ইবরাহীম (আ) গেছেন তাকিরে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। হয়রত হাজারে একথা শুনে বললেন: **إِنَّا لَا يَهْدِيهِمُ**

অর্থাৎ তবে আর কোন চিন্তা নেই। যে মালিক আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেয়কেও বিনষ্ট হতে দেবেন না।

হয়রত ইবরাহীম (আ) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন একটি পাহাড়ের পশ্চাতে পৌঁছলেন এবং হাজারে ও ইসহাঈল দু'টি থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন, তখন ব্যস্ত-তুরাহর দিকে মুখ করে আরাতে বণিত দোয়াটি করলেন।

হয়রত ইবরাহীম (আ)-এর এই দোয়া থেকে অনেক দিক নির্দেশ ও মাস'আলা জানা যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে।

দোয়ারে ইবরাহীমীর রহস্যবাকী: (১) ইবরাহীম (আ) একদিকে আল্লাহর পোস্ত হিসেবে তাঁর বা করণীর ছিল, তা করেছেন। যখন ও যে স্থানে তিনি সিরিয়ার ফিরে যাওয়ার আদেশ পান, সেই মুহূর্তে সেই স্থান থেকে গুরু জনমানবহীন প্রান্তরে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে চলে যাওয়ার ব্যাপারে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে তিনি বিপ্লবাত্ত ও বিধাবোধ করেননি। এ আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্বও সহ্য করেননি যে, তাঁর কাছে গিয়ে আল্লাহর আদেশের কথা বলবেন এবং তাঁকে দু'কথা বলে সাম্প্রদায়িক দেবেন। বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি সেখান থেকেই সিরিয়াভিমুখে রওনানা হয়ে যান।

অপরদিকে পরিবার-পরিজন ও তাদের মহত্বের হক একভাবে পরিশোধ করেছেন যে, পাহাড়ের পশ্চাতে তাদের দৃষ্টি থেকে উদ্ধাও হয়েই আল্লাহর দরবারে তাদের হিজা-মত ও সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য দোয়া করেছেন। কারণ তাঁর ফিরে ফিলাস ছিল যে, নির্দেশ পালনের সাথে সাথে যে দোয়া করা হবে, তা দরবারের দরবারে অবশ্যই কবুল হবে, হয়েছেও তাই। এই সহায়হীনা ও অবলা মহিলা এবং তাঁর শিশুপুত্র শুধু নিজেদেরই পূর্ববর্তিত হন নি। বরং তাঁদের উহিবার একটি নহর স্থাপিত হয়ে গেছে এবং শুধু তাঁরাই জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পাননি, তাঁদের বরকতে আজ পর্যন্ত মরকানবীদের উপর সর্বত্রকার নিয়ামতের দ্বার অব্যাহত রয়েছে।

এ হচ্ছে পরসম্মতসুলভ দৃষ্টি ও সুব্যবস্থা। এখানে এক দিকে লক্ষ্য দেওয়ার সময় অন্যদিক উপেক্ষিত হতো না। পরসম্মতসুলভ সাধারণ সূক্ষী-বুর্গদের মত ভাবাবেগে হারিয়ে যেতেন না। এ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

(২) হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আত্মাহুঁ পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তাঁর জননীকে ওক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি সিরিয়া চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিত্বাস জন্মেছিল যে, আত্মাহুঁ তাঁদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্য পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ার **يَا غَيْرِزِي مَا** (জলহীন প্রান্তরে) বলেন নি।

يَا غَيْرِزِي مَا (চামাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাঁদেরকে ফলমূল দান করুন, যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই যজ্ঞা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চামাবাদের ভেতন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুস্কর।—(বাহরে-মুহীত)

(৩) **عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ** থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের

ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাকারার তফসীলে বিভিন্ন রেওয়াজেত্তের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন সুজিয়া হিসেবে সন্মুখীপ পাহাড় থেকে এখানে পৌঁছানো হয় এবং জিবরাঈল বায়তুল্লাহর আয়না চিহ্নিতও করে দেন। আদম (আ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চতুর্দশ প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নুহের মহাপ্রাণের সময় বায়তুল্লাহ উঠিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়। হযরত জিবরাঈল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আ) নির্মিত এই প্রাচীর মুখতা-মুগে বিখ্যাত হয়ে গেলে কুরানশরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণ-কাজে আবু ভালিকের সাথে রসূলুল্লাহ (সা)ও নবুহুত্তের পূর্বে অংশগ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহর বিশেষণ **مُحَرَّم** উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে উত্তর বিশেষণ বিদ্যমান আছে। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রু কবল থেকে সুরক্ষিত।

(৪) **لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ**—হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়ার প্রান্তরে পূজা ও

তাঁর জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামাজ কয়েমকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামাজ হল ইহকাল ও পরকালের হাবতীর মজল সাধিত হল। এ থেকে বোঝা দেয় যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাজের অনুভূতি বঁকে দেয় তবে এটাই

সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্বস্বত্ব সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে। ইবরাহীম (আ) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়ে ছিলেন, কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ার সবাইকে শামিল রেখেছেন।

(৫) **فَوَادَّاهُ إِخْلَادًا مِّنَ النَّاسِ** শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ

অন্তর। এখানে **إِخْلَادًا** শব্দটি **نَكَرًا** এবং তার সাথে **مِّنَ** অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা **تَقْلِيلٌ وَ تَعْطِيشٌ** এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত, **إِخْلَادًا النَّاسِ** বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মজার ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ তথ্যের পরিত্রাণে ইবরাহীম (আ) দোয়ায় বলেছেন : কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

(৬) **ثَمَرًا ثَمَرَاتٍ - وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ** শব্দটি এর বহুবচন।

এর অর্থ ফল, যা স্বভাবত খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সান্ন্যম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثَمَرًا শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তার **ثَمَرًا** বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার **ثَمَرًا** বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরির ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর **ثَمَرًا**

কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় **ثَمَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ** বলা হয়েছে। এতে

شَجَرٍ শব্দ ব্যবহার না করে **شَيْءٍ** (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি, বরং প্রত্যেক বস্তুর অজিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন! সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন রহস্যম শহরেও পাওয়া যায় না।

(৭) হয়রত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের জন্য এরূপ দোয়া করেন নি যে, মজার জুমিকে চান্দাবাদযোগ্য করে দিন। এরূপ করলে মজার উপত্যকাকে শস্য-শ্যামলা করে

দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি সন্তানদের জন্য কৃষিবৃত্তি গছন্দ করেন নি। তাই কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন যাতে তারা পূর্ব-পশ্চিম ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আগমন করে এবং তাদের এ সমাবেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত ও মজ্জাবাসীদের জন্য সুখ-স্বাস্থ্যের উপায় হয়। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবুল করেছেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত চাষাবাদ ও কৃষিকাজের মুখাপেক্ষী না হয়েও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্রের অধিকারী হয়ে সুখী ও স্বাস্থ্যময় জীবন যাপন করছে।

(৮) لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ — এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক

সুখ-স্বাস্থ্যের দোয়া এক কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া গুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা-উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের একপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার ওপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা সরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, বতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِي ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে رَبَّنَا শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

অন্তরগত-অবস্থা বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুঃখপোষা শিশু ও তার জননীকে উপযুক্ত প্রান্তরে নিঃসহল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন বলে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং হাজেরার এসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ বখশ নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য হুশেস্ত। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আল্লাহের শেষে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের কিছুটি আরও বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত জুয়ুজ ও নজো-গুণ্ডে কোন বস্তুই তাঁর অন্তর্ভুক্ত নয়।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِي ۖ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড)—৩৩

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۖ

—এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিচিষ্ট।

কেননা, দোয়ার অন্যতম দিল্লীচাচর হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামতের শেকর আদায় করেছেন। নিয়ামতটি এই যে, যোর বার্ষিকের বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাইল ও ইসহাক (আ)-কে দান করেছেন।

এ প্রশংসা বর্ণনার এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসন্ত ও নিঃসন্তান অবস্থার জন্মদা প্রাক্তরে পরিতাপ নিশ্চি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাজত করুন।

অবশেষে —إِنْ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ— বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ মিষ্টর আমার পালনকর্তা দোয়া প্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ার মশগুল হয়ে যান : رَبِّ اجْعَلْنِي مَقِیمٌ

—الصلوة وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ— এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের

জন্য নামাজ কালেম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করছেন : رَبِّ اغْفِرْ لِي

—وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ— অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা।

আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন এদিন-এদিন হাশরের যন্ত্রণায় যারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এই ভিনি মাতামিতার জন্যও মাপফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আলির যে কাকির ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লিখিত আছে। সন্তানও এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আ)-কে কাকিরদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে :

وَاعْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে দোয়ার বখাবিহিত সঙ্গতি জানা গেলে যে, ব্যাব্যাক কাকুতি-মিনতি ও কল্পন সহকারে দোরা করা চাই এবং সাথে সাথে আত্মাতা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা যায় যে, দোরা কবুল হবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَنَّا يَعْلَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَافْدَتْهُمْ هَوَآؤُهُمْ ۚ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِذْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مَن قَبْلَ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۚ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۚ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۚ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ سَرَابِئُهُمْ مِّنْ قَطَرَانٍ وَتُغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۚ لِيُجْزَىٰ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ هَذَا بَلَدٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا أَنَّهُ هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ الْأُولَاءُ ۚ

(৪২) আল্লাহকে ভয় করে, সে সকলকে আল্লাহকে কখনও বৈখর্য মনে করো না।

তাদেরকে তো এ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিবে না যেহেতু, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে।

(৪৩) তারা যতক উপরে তুলে ভীতি-বিহবল ভিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। (৪৪) মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জাতিমরা বলবে : হে আমাদের পালন-কর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং পরগল্পগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করত, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিচ্ছে এবং আল্লাহর সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় ঠেলিয়ে দেওয়ার মত হবে না। (৪৭) অন্তঃপ্রাণ আল্লাহর প্রতি ধারণা করোনা যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওরাদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জায়া হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে জ্বলিতে ঢেকে নিবে। (৫১) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদমাস্মা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই—একক, এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

তবসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) জাতিমরা (অর্থাৎ কাকিররা) যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাকে (দ্রুত আযাব না দেওয়ার কারণে) বেখবর মনে করো না। কেননা, তাদেরকে শুধু ঐদিন পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন, যেদিন তাদের নেত্রসমূহ (বিস্ময় ও ভয়ের আভির্ভাষ্য) বিস্ফারিত হয়ে যাবে (এবং তারা হিসাবের ময়দানের দিকে তলব অনুযায়ী) উর্ধ্বদ্বারে দৌড়াতে থাকবে (এবং তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ অনিমেষ নেত্রে সামনে তাকিয়ে থাকবে) এবং তাদের অন্তরসমূহ (ভীষণ আতংকে) অত্যন্ত ব্যাকুল হবে এবং (সেদিন এসে গেলে কাউকে সময় দেওয়া হবে না। অন্তঃপ্রাণ) আপনি তাদেরকে ঐদিনের (আগমনের) ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে যাবে। অন্তঃপ্রাণ জাতিমরা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত আমাদেরকে (আরও) সময় দিন (এবং দুমিহাতে পুনরায় প্রেরণ করুন) আমরা (এই সময়ের মধ্যে) আপনার সব কথা মেনে নেব এবং পরগল্পগণের অনুসরণ করব। (উত্তরে বলা হবে : আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সময় দেইনি এবং) তোমরা কি (এ দীর্ঘ সময়ের কারণেই) ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) কসম খাতিয়ে যে, তোমাদেরকে (দুনিয়া থেকে) কোথাও যেতে হবে না? (অর্থাৎ তোমরা কিদ্বায়েত জরিয়াসী ছিলে এবং

এজন্য কসম খেতে, যেমন আল্লাহ্ বলেন : **وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ**

لَا يَهْتُمُّ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ

অর্থ (অবিশ্বাস থেকে বিরত হওয়ার স্বাভাবিক

কারণ উপস্থিত ছিল। সেমতে তোমরা ঐ (পূর্ববর্তী) লোকদের বাসস্থানে বাস করত, যারা (কুফর ও কিয়ামত অস্বীকার করে) নিজেদের ক্ষতি করেছিল এবং তোমরা (সংবাদ পর-
স্পরের মাধ্যমে) একথাও জানতে যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম। (অর্থাৎ কুফরী ও অস্বীকারের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। এ থেকে তোমরা জানতে পারতে যে, অস্বীকার করা গম্বের কারণ। সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া অপরিহার্য।
তাদের বাসস্থানে বাস করা সর্বদা তাদের এসব অবস্থা স্মরণ করানোর কারণ হতে পারত।
সুতরাং অস্বীকারের অবকাশ মোটেই ছিল না।) এবং এসব ঘটনা শোনা ছাড়াও সেগুলো (শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল) আমি (ও) তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। (অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থসমূহে আমিও এসব ঘটনাকে দৃষ্টান্তরূপ বর্ণনা করেছি যে, যদি তোমরা এরাপ কর তবে তোমরাও গম্ব পতিত ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। অতএব প্রথমে সংবাদ পরস্পরের মাধ্যমে ঘটনাবলী শোনা, অতঃপর আমার বর্ণনা, অতঃপর দৃষ্টান্ত, অতঃপর হ'শিয়ার করা—এত সব কারণের উপস্থিতিতে তোমরা কিরূপে কিয়ামত অস্বীকার করলে?) এবং (আমি পূর্ববর্তী যেসব লোককে কুফরী ও অস্বীকারের কারণে শাস্তি দিয়েছি,) তারা (সত্যধর্ম বিলোপ করার কাজে) নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বড় বড় কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তাদের (এসব) কূটকৌশল আল্লাহর সামনে ছিল। (তঁার জানের পরিধির বাইরে ছিল না—থাকতে পারত না।) এবং বাস্তবিকই তাদের কূটকৌশল এমন ছিল যে, তন্দ্বারা পাহাড়ও (স্থান থেকে) হটে যায়। (কিন্তু এতদসত্ত্বেও সত্যের জয় হয়েছে এবং তাদের সব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিপাত হয়েছে। এ থেকেও জানা গেল যে, পরগম্বর যা বলেন তাই সত্য এবং তা অস্বীকার করা আযাব ও গম্বের কারণ। যখন কিয়ামতে তাদের পশু'দন্ত হওয়া জানা গেল,) অতএব (হে সন্মোখিত ব্যক্তি) আল্লাহ্ তা'আলাকে পরগম্বরগণের সাথে ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে করো না। (সেমতে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে ওয়াদা ছিল তা পূর্ণ হবে; যেমন উপরে বলা হয়েছে) নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, (এবং) প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁকে কেউ বিরত করতে পারে না। সুতরাং শক্তিও অপার, এরপর ইচ্ছার সম্পর্ক উপরে জানা গেল। এমতাবস্থায় ওয়াদা ভঙ্গ করার আশংকা কোথায়? এ প্রতিশোধ ঐ দিন নেনেব,) যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হবে এই পৃথিবী ছাড়া এবং আকাশও (পরিবর্তিত হয়ে অন্য আকাশ হবে এসব আকাশ ছাড়া। কেননা, প্রথমবার শিঙ্গা ফু'কার কারণে সব জু-মগুল ও নভোমগুল ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যাবে। এরপর পুনর্বীর নতুনভাবে জু-মগুল ও নভোমগুল সৃজিত হবে) এবং সবাই এক (ও) পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে পেশ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এই দিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে।) এবং (ঐদিন হে সন্মোখিত ব্যক্তি,) তুমি অপরাধীদেরকে

(অর্থাৎ কাফিরদেরকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখবে (এবং) তাদের জামা কাতেরানের হবে। (অর্থাৎ সাদ্কা দেহ কাতেরান জড়ানো থাকবে, যাতে শ্রুত আওন লাগে। 'কাতেরান' এক প্রকার বৃক্ষ নিম্নত তৈল, মতান্তরে আলকাতরা বা গজক।) এবং আওন তাদের মুখমণ্ডলকে (ও) আবৃত করবে, (এসব এজন্য হবে) যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক (অপরাধী) ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন। (এরূপ অপরাধী অপণিত হবে, কিন্তু) নিশ্চয় আল্লাহ্ (-র জন্য তাদের হিসাব-কিতাব নেওয়া মোটেই কঠিন নয়, কেননা তিনি) শ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সবার বিচার আরম্ভ করে তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেবেন।) এটা (কোরআন) মানুষের জন্য বিধি-বিধানের সংবাদনামা (যাতে প্রচারক অর্থাৎ রসূলকে স্বীকার করে) এবং যাতে এর সাহায্যে (শাস্তির) ভয় প্রদর্শন করা হয় এবং যাতে বিশ্বাস করে যে, তিনিই এক উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

আনুষ্ঠানিক ভাষা বিবরণ

সূরা ইবরাহীমে পরম্পর ও তাঁদের সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ, আল্লাহ্ বিধানের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত পরিণাম এবং সবশেষে হমরুত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণ করেন, তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তাঁরই সন্তান-সন্ততি বনী-ইসরাইল পবিত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সর্ব প্রথম সম্বোধিত সম্প্রদায়।

সূরা ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুকুতে সান্ন-সংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসী-দেরকেই পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও চৈতন্যোদয় না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

প্রথম আল্লাতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং জালিমকে কঠোর আঘাতের সন্তর্কবাণী শোনানো হয়েছে। বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা অবকাশ নিয়েছেন দেখে জালিম ও অপরাধীদের নিশ্চিত হওয়া উচিত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ভ্রান্ত নয়, বরং ত্বরান্বিত কিংবা দলীল দ্বারা, সব আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও রহস্যের ভাষায় অবকাশ নিয়েছেন।

لَا تَحْصِيَنَّ لِلّٰهِ غَاۤلَا

অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে গাফিল

মনে ধরো না। এখানে বাহ্যত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য ঐশ্বর্যের গাফিলদেরকে শোনানো এবং হুঁশিয়ার করা। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষ থেকে এরূপ সম্বোধনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে গাফিলিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, আলিমদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসা তাদের জন্য তেমন গুস্ত নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিরামত ও পরকালের আযাবে ধৃত হয়ে যাবে। অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত পরকালের আযাবের বিবরণ এবং তন্মাবহ দৃশ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُمْ تَشْخُصُ فِيهِ إِلَّا بَمَآرٍ — অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ময়প্রাপ্ত হবে

খাববে। مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ — অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক

উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ — অর্থাৎ অপলাপ

নেড়ে চেয়ে থাকবে وَأَنفُودُتُّهُمْ هَوَاهُ — তাদের অন্তর দৃশ্য ও ব্যাকুল হবে।

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসুলুল্লাহ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন আলিম ও অপরাধীরা অপারক হয়ে বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পরগুরুগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ তা'আলার গুরু থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে : এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনভাবে বিলাস-বাসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَمَكَنتُمْ فِي مَآكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَّفْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ

এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন

করার জন্য রসুলুল্লাহ (সা)-কে وَأَنذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে

তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এককো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাকোরা কর। কিন্তু

অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে ভোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ তা'আলা অব্যাহতার কারণে ওদেরকে কিরপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সংপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও ভোমাদের চৈতন্যোদয় হল না।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَمِلُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ

لَتَرْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ--অর্থাৎ তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষে।

এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমত কটকৌশল করেছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের সব ষড়্যুৎ ও প্রকাশ্য কটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কটকৌশল এমন মারাত্মক ও ওরুতর ছিল যে, এর মুকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপ-হৃত হবে, কিন্তু আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এসব কটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণত নমরুদ, ফেরাউন, কওমে-আদ, কওমে-সামুদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসুল্লাহ (সা)-র মুকাবিলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ ان كَانَ مَكْرَهُمْ বাস্তব নৈতি-

বাচক অব্যয় সাবাস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রসুল্লাহ (সা) ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফিরদের কোন চালবাজি ও মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উল্লমতকে শোনানোর জন্য রসুল্লাহ (সা)-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَسْعَوْنَ لِلْإِثْمِ أَكْرَبَ عِلْمًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَسْعَوْنَ لِلْإِثْمِ أَكْرَبَ عِلْمًا ۚ

وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَسْعَوْنَ لِلْإِثْمِ أَكْرَبَ عِلْمًا ۚ--অর্থাৎ কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে,

আল্লাহ তা'আলা রসুলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খিলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পরমগম্বীরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ।
বলা হয়েছে :

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَ وَتَبْزُزُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ

الْقَهَّارُ — অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও ।

সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়ার একগুণ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেওয়া হবে, যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থার

বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে : لَا تَرَى فِيهَا مَوْجًا وَلَا أَمْتًا — অর্থাৎ

গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না; বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ একগুণও হতে পারে যে, সম্পূর্ণত এই পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এই আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সভাগত পরিবর্তনের কথা জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রং হবে রৌপ্যের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহ বা অন্যান্য খনের দাগ থাকবে না। মসনদে-আহমদে ও তফসীরে ইবনে জরীরে উল্লিখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। — (মায়হারী)

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-বলেন : কিয়ামতের দিন ময়দার রঙের মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বৃকে মানব-জাতিকে পুনরুজ্জিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুকুন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেইভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এই পৃথিবীতে জমায়ের

মা'আরেফুল কুরআন (৫ম খণ্ড) — ৩৪

হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তাঁর দাঁড়ানোর জায়গাইকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সিজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব-কিতাব শ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়াজে তেঁকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং পর্বত, পাহাড়, দালান-কোঠা, রুদ্ধ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়াজে তসমূহ তেঁকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে।

বরানুজ-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ) বলেন : এতদূতয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তফসীরে মাহহারীতে মসনদ আবদ ইবনে হমায়দ তেঁকে হযরত ইকরামার উক্তি বর্ণিত আছে, যশ্নারা উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই : এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পাশ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়াজে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা)-র নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল : যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : পুসসিরাতের নিকটে একটি অজ্ঞান থাকবে।

এ তেঁকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী তেঁকে পুসসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীরে গ্রন্থে এমর্মে একাধিক সাহাবীও তাবয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তাঁর নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ ছাড়া বাস্তব উপায় নাই যে,

زہاں تازہ کردن با قوارتو
نینگیختنی ملت از عارتو

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার। এটি একটি শ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে : কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেন যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক তেঁকে বিরত হয়।

সূরা বনা ঈসরাহিল
২৩-৫২ আয়াত

বিল জাতি ও মনসুফ আমল মতই ভাল দেখা যাক—প্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে

চেষ্টা ও কর্মের সাথে **سَعْيَهَا** শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণ-কর ও আল্লাহর কাছে প্রহণযোগ্য হয় না, তবু সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) ক্ষমতার উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ ও রসুলের বর্ণনা দ্বারাই জানা স্রেতে পড়ায়। কাজেই সে সৎ কর্ম মনগড়া পছন্দ করা হয়—সাধারণ মিশ'আতী পছন্দ ও এর অস্বাদুত, তা দুশুভ্র মতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন—পরকালের জন্য উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহর কাছে প্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তকসীর রাহুল মা'আনী **سَعْيَهَا** শব্দের ব্যাখ্যায় সুমত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে এ কথা ও অভিযুক্ত বাত্ন করেছে যে, কর্ম ও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সুমত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ সার্বজনিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না—এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا ۖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ
وَخُفْضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ ۚ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۚ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَادِقِينَ
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝

(২২) স্থির করো না আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিষ্কিড ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্থক্য উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উক' শব্দটিও বলা না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে নিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম্য কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে পালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

পূর্বাঙ্গের সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, ইমানসহ এবং শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী যে কর্ম করা হয়, তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আরোচা আয়াতসমূহে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শরীয়ত বাদিত। এসব নির্দেশের বাস্তবায়ন পরকালের সাক্ষ্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ পরকালের ধ্বংসের কারণ। যেহেতু উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে ইমানের শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বপ্রথম সে নির্দেশ ও তওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বাক্যের হক সম্পর্কিত নির্দেশ বাদিত হয়েছে।

তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

(প্রথম নির্দেশ তওহীদ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ—হে সম্বোধিত ব্যক্তি)

আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (অর্থাৎ শিরক করো না)। তাহলে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় হয়ে পড়বে। (অতঃপর এই তাগিদ করা হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সত্য উপাস্য তাঁকে বাতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। (এটা পরকালের চেষ্টার পছন্দ সংক্রান্ত বিষয়)।

(দ্বিতীয় নির্দেশ পিতামাতার হক আদায় করা وَبِأَوَّلِيْنَ إِلَيْنِ إِحْسَانًا)

তোমার পিতামাতার সাথে সদ্যবহার কর। যদি (তারা) তোমার কাছে থাকে এবং তাদের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে (অর্থাৎ বার্ধক্যের কারণে) উপনীত হয় এবং সে কারণে সেবা-স্বয়ের সুযোগের ক্ষতি হয়ে পড়ে এবং বাকী সন্তানরা তাদের সেবায় ব্যস্ত কঠিন মনে হয়, তবে (তখনও এতটুকু আদব কর যে) তাদেরকে (ইদ থেকে) হুঁ-ও বকে ই-এর আদবের আদর্শ দিও না এবং তাদের সাথে শ্রুত আদব-সহকারে কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে সবিনয়ে ইহুত-সন্মান করে দাও এবং (তাদের জন্য আল্লাহর কাছে) এরূপ দোয়া কর : হে পালনকর্তা, তাদের উত্তরের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (শুধু এই বাহ্যিক সন্মান প্রদর্শন-কেই যথেষ্ট মনে করো না। অন্তরেও তাদের প্রতি আদর ও আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করবে। এমনকি) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনের কথা শ্রুত জানেন। (একারণেই এর বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য একটি হাল্কা আদেশও শুনাচ্ছেন যে) যদি তোমরা (প্রকৃতই আন্তরিকভাবে) সং হও, (এবং ভুলক্রমে, যেযাঙ্গের সংকীর্ণতাহেতু কিংবা মিলিত্ববশত কোন বাহ্যিক রুটি হয়ে যায়, অতঃপর অনুতাপ হয়ে তওবা করো নাও) তবে তওবাকারীদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।

আনুশঙ্গিক ভাষা বিষয়

পিতামাতার আদব, সন্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার আদব, সন্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্যবহার

করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে ফরসা করেছেন। যেমন সূরা শৌরহানে নিজের নেতৃত্বের সাথে পিতামাতার শোকরকে একত্র করে অনগ্রহণ্য করেছেন। বলা হয়েছে: **أَن شَكَرْتَنِي وَلَوْلَا ذِيكَ** অর্থাৎ আমার শোকর কর এবং পিতামাতারও।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতামাতার অনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নাম পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও প্রমাণিত। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করল : আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন : (মুস্তাহাব) সময় হলে সয়াম পড়া। সে জাযাই প্রস্ন করল : এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন : পিতামাতার সাথে সত্যবহার।—(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতামাতার অনুগত্য ও সেবাশ্রমের কথীলত : যখন সে আহমদ। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুত্তাদিরাক হাকেম যিহুজ সমদসহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : পিতা জামাতের বধ্যবতী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিকমাত কর অথবা একে বিনশ্ট করে দাও। (মায়দারী) (১) তিরমিযী ও মুত্তাদিরাক হাকেম যিহুজ আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : পিতা জামাতের মধ্যবতী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিকমাত কর অথবা একে বিনশ্ট করে দাও। (মায়দারী) (২) তিরমিযী ও মুত্তাদিরাক হাকেম যিহুজ আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন : তাঁরা উভয়েই তোমার জামাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের অনুগত্য ও স্বেচ্ছাকৃত জামাতে নিয়ে যাব এবং তাঁদের সাথে বেআদবি ও তাঁদের অসন্তুষ্টি আহ্বানমে বেঁচে দেব।

(৪) বায়হাকী শোয়াবুল-ইমান গ্রন্থে এবং ইবনে অসাকির হযরত ইবনে আকাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতামাতার অনুগত্য করে, তার জন্য জামাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতামাতার মধ্যে থেকে একজনই ছিল, তবে জামাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করত? তিনি তিনবার বলেন :

وَأَن ظَلَمْنَا وَأَن ظَلَمْنَا وَأَن ظَلَمْنَا অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও

করত শুধু পিতামাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সম্বন্ধে এই যে, পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিপোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা কুমার করলে সন্তান সেবা-বৃত্ত ও আনুগত্যের হাত ভাঙিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে সেবাসহকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তাঁর প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। জোকেরা আরব বর্ণিল : সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বজাজেন : হ্যাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহামুল্লাহ! তাঁর ভাঙারে কোন অভাব নেই।

পিতামাতার হুকুম নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

(৬) বায়হাকী শেরাফুল ইমানে আবু বকরার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : সমস্ত খেনায়েত শাস্তির ব্যাপারে অসম্মত। তা'আলার যেখানে ইচ্ছা করেন কিম্বায়ত পর্যন্ত পিছিয়ে দিলে খান। কিন্তু পিতামাতার হুকুম নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকায়ের পূর্বে ইহকালেও সেওয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তরুনীর মা'আনেকুল থেকে উদ্ধৃত হয়েছে)।

কোন কোন বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহবিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহর কাজে আনুগত্য ওয়াজিবতৌ নয়ই, বরং আয়েমও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে : لا طاعة لمخلوق في معصية الله — অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাকসমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতামাতার সেবাসহ ও সন্তানসহকার জন্ম জীবনের মুসলমান হওয়ার প্রকারী মন্ত : ইমাম কুতুবী এ বিষয়টির সম্বন্ধে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা)-র একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা) রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন : আমার জননী মশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বজাজেন : على أمك — অর্থাৎ “তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।” কাকির পিতামাতা সম্পর্কে হযরত কোরআন পাক বলে :

وَمَا حَبَّيْنَاهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا — অর্থাৎ যার পিতামাতা কাকির এবং তাকেও কাকির হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সন্তান বজার রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে যারক বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

মাস'জানা : যে পর্যন্ত জিহাদে ফরাসি আইন না হয়ে যাবে, ফরাসি বিক্রান্তার ভয়ে থাকবে, সে পর্যন্ত পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জিহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সূর্য কবীরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক মুসলিম রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল : জীহাদে জীবিত আছেন। রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : **فَقُتِلَ أَبَاكَ** অর্থাৎ তাহলে তুমি পিতামাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর। অর্থাৎ তাঁদের সেবায়ের মাধ্যমেই তুমি জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়াজেও এর সাথে একথাও উল্লিখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল : আমি পিতামাতাকে রূপনরত অবস্থার মধ্যে এসেছি। একথা শুনে রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : যাও, তাঁদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ তাঁদেরকে গিয়ে বল : এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না।—(কুরতুবি)

মাস'জানা : এ রেওয়াজেও থেকে জানা গেল যে, কোন কৃত্রিম ফরাসি আইন না হয়ে এবং ফরাসি-বিক্রান্তার ভয়ে থাকবে সন্তানের জন্য পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরাসি পরিমাণ দীনী জেনার অধিত আছে, সে যদি বড় আশ্রয় হওয়ার জন্য সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তখন পিতামাতার অনুমতি বাধ্যতাবদ্ধ জায়েয নয়।

মাস'জানা : পিতামাতার সাথে সন্ধ্যাবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন-ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সন্ধ্যাবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : পিতার সাথে সন্ধ্যাবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সন্ধ্যাবহার করতে হবে। হযরত আবু উসাইদ খদরী (রা) বর্ণনা করেন : আমি রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রণয় করল : ইয়া রাসুলুল্লাহ! পিতামাতার ইতিহাসের পরও তাঁদের কোন হুকুম আমার শিখার আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ তাঁদের জন্য দোয়া ও ইতিহাস করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অস্বীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতামাতার এসব হুকুম তাঁদের ইমতিজানের পরও তোমার শিখার অবশিষ্ট রয়েছে।

রসুলুল্লাহ (সা)-র অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপচোকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা (রা)-র হুকুমাদার করা।

পিতামাতার জাদুর প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত মা'আলো : পিতামাতার সেবায় ও আনুগত্য পিতামাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সম্বরও বন্ধনের গতিতে সীমাবদ্ধ নয়।

সর্ববছার এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সাক্ষরতার করা ওয়াযিব। কিন্তু ওয়াযিব ও কল্লুহ কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে যতাবশ্য সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালনে সহজ করার উদ্দেশ্যে কোরআনি শাখ হেসব অবস্থার বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার মালম-পালনও স্বীকৃত এবং এর জন্য অতিরিক্ত ভাফিদও প্রদান করে। এটাই কোরআনি পাকের সাধারণ নীতি।

বার্থকো উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেবা-স্বত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও রূপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষে থেকে সামান্যও বিষমতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অনুরদিকে বার্থকোর উপসংসমূহ যতাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত বার্থকোর শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোরআন পাক এসব অবস্থার পিতামাতার মনো-ভূটি ও সুখ-শান্তি-বিধানের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সন্তানকে তাঁর শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, 'আজ পিতামাতা তোমাকে যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাঁদের মুখাপেক্ষী হিলে।' তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার জব্বর কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ ছাড়া চোকে নিরোহিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের ভাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব স্বপ্ন শোধ করা কর্তব্য। **عَمَّا رِيًّا نِي مَغِيرًا** — বরকো এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আজোচ্য আরোওসমূহে পিতামাতার বার্থকো উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক. তাঁদেরকে 'উক'-ও বলবে না। এখানে 'উক' শব্দটি বকে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যন্ত্রাঙ্গের বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘকাল ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রা) বণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন: পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উক' বললে চাইতেও কম কোন জ্বর থাকুক ও তাও স্নানশা উল্লেখ করা হত। (মোট কথা, যে কথায় পিতামাতার স্বাভাব্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, **فَوَلَا تَنْوَرُهَا** শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, **وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا عَرِيًّا** প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল মোডবাচক তাতে পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নয় স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত

সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাহ বলেন: যেমন কোন গোলাম তার রক্তচক্ষুর অংশ প্রদূর মাঝে
কখা করে।

৪৪৯

চতুর্থ আদেশ, **وَاخْفِزْ لَهَا جَنَاحَ الذَّلٰلِ مِنَ الرِّحْمَةِ**—এর সারমর্ম

এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্রম ও হেয় করে পেশ করবে, যেমন গোলাম প্রভুর
সামনে। **جَنَاح** শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতামাতার জন্য নিজ নিজ

পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে **مِنَ الرِّحْمَةِ** বলে প্রথমত ব্যক্ত করা

হচ্ছে যে, পিতামাতার সাথে এই ব্যবহার এমন মিছক লোকে দেখানো না হয় বরং
আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, এ দিকেও ইঙ্গিত হচ্ছে
পারে যে, পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার, ইহুতের পটভূমি।
কেননা এরা প করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহাবত ও অনুকম্পা।

৪৪৯

পঞ্চম আদেশ, **وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمُوْهُمَا**—এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার যোল

জানা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে
তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশত তাদের
সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ অঙ্গশ্লোকটি অত্যন্ত ব্যাপক ও
বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতামাতার খিদমত করা যায়।

মাস'আলা : পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাদের জন্য রহমতের দোয়া করা
যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাদের জীবদ্দশার এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিম্নত
থাকবে এই যে, তাঁরা পাখিই কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং সন্মানের তওফীক লাভ করুন।
মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : কুরতুবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়াজে করেন
যে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার
পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন : তোমার পিতাকে ডেকে
আন। এমন সময়ই জিবরাঈল আগমন করলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা)-কে বললেন :
তার পিতা এসে গেলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এ বাকীগুলো কি, যেগুলো সে
মনে মনে বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনে পাননি। যখন লোকটি তার পিতাকে
নিয়ে হাবির হল, তখন রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : ব্যাপার কি, আপনার পুত্র আপনার
বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার আসবাবপত্র হিনিয়ে নিতে চান? পিতা
বলল : আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার কুফু, খালা এবং নিজের জীবন রক্ষার
প্রয়োজন বাতীত কোথায় ব্যয় করি? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : **هُوَ** (অর্থাৎ বাস। আসল
ব্যাপার জানা হচ্ছে সেহে। এখন আর কোন বলার শোনার দরকার নেই।) এরপর তার
পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন : এ বাকীগুলো কি, যেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার ধ্যানও

শোনেনিঃ-কোনটি অসম্ভব করলঃ ইয়া রাসুলারহি! প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলার
আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ইমান বৃদ্ধি করে দেন। (যে কথা কেউ শোনেনিঃ
তা আপনার জানা হয়ে গেছে। এটা একটা মুজিবা) অতঃপর সে বললঃ এটা ঠিক যে,
আমি মনে মনে কল্পক দাঁহন কবিতা বলেছিলাম, যেগুলো আমার কানও শোনেনিঃ রসুল-
ল্লাহ (সা) বললেনঃ কবিতাগুলো আমাকে শোনান। তখন সে নিশ্চিন্ত পংক্তিগুলো
অবিস্তার করলঃ

غَدَوْتُ مَوْلُودًا وَمَلَكْتُ يَانَعًا
تَعْلِيْمًا اجْنَى عَلَيْكَ وَتَهْمِلُ

ঃ আমি প্রেক্ষাকে শৈশবে খাদ্য দিচ্ছি এবং মৌখিক ও ভৌমার দয়িত্ব বহন করছি।
তোমার আশীর্বাদ খাওয়া-পরা আমারই উপার্জন থেকে ছিল।

اِذَا لَيْلَةٌ مَا فَتَى بِالْعَمِّ لَمْ اَبْتِ
لَسَقَمِي الْاَسَاطِيرَ اَتَمْلَمُ

ঃ কোন রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন আমি সারা রাত তোমার
অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি।

مَا نِي اِنَّا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِاَذَى
طَرَقْتَنِي بِكَ دُونَِي فَسَعَيْتَنِي تَهْمِلُ

ঃ যেন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে—তোমাকে নয়। ফলে আমি সারা
রাত প্রদান করেছি।

تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَأَتَهَا
لَتَعْلَمَ اَنَّ الْمَوْتَ وَثَّقْتُ مَوْجِلُ

ঃ আমার অস্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হত, অথচ আমি জীনজীম যে
মৃত্যুর জন্য দিন নিদিষ্ট করেছে—জানিয়েছে হতে পারবে না।

فَلَمَّا بَلَغْتَ السَّنَى وَالْغَايَةَ اَلَّتِي
اَلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتَ فِيهِ اَوْ مَل

ঃ অতঃপর যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বয়সের সীমা
পারিত গিয়ে গেল।

جَعَلْتُ جِزَائِي فَلْظَةً وَفَلْظَةً
كَأَنَّكَ اَنْتَ الْمُنْعَمُ الْمُنْفَعِلُ

ঃ তখন তুমি কঠোরতা ও রক্ত ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিলে, যেন তুমিই
আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদান্য করত।

فَلَيْتَنِي اَنْ لَّمْ تَسْرِعْ حَقَّ ابَوْتِي
فَعَلْتَ مَا لَجَارَ الْمَكْرُوتِ وَفَعَلَ

৪ অকস্মিক, হঠাৎ তোমার দ্বারা আমার পিতৃদের হক আমার না হ'ল, হুবে কম-
গক্ষে ততটুকুই করতে হতটুকু একজন ভদ্র প্রতিবেশী করে থাকে।

فَاُولَيْتَنِي حَقَّ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ
عَلَى مِمَالٍ دُونَ مَا لِي تَبْخُلْ

৫ তুমি কমগক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তোমাদিগে এবং স্বয়ং আমারই অর্থ-
সম্পদে আমার বেলায় কৃপণতা না করতে।

৬ রসজুজ্জাহ্ (সি) কবিতাগুলো শোনার পর পুত্রের আমার কছার চেপে ধরলেন
এবং বললেন : اَنْتَ وَمَالِكَ لَا يَبْكُ অর্থাৎ যাও, তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ
সবই তোমার পিতার। (কুরতুবী, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৪ পৃঃ) কবিতাগুলো আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ
কাব্যগ্রন্থ 'হামাসা'তেও উদ্ধৃত রয়েছে, কিন্তু কবির নাম লেখা হয়েছে উথাইয়া ইবনে
আবুসুসলত। কেউ কেউ বলেন : এগুলো আবদুল আ'লার কবিতা এবং কারিও কারিও
মতে কবিতাগুলো আলি আব্বাস অঙ্কের।—(হামিরা—কুরতুবী)

পিতার আদব ও সন্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের
মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পড়ত যে, পিতামাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে
হবে তাঁদের এবং নিজদের অবস্থাও সব সময় সমান যার না। কোন সময় মুখ দিয়ে
এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্য অসংখ্য
শক্তির কথা শোনাশোনা হয়েছে। কাজেই এখানে থেকে থেকে একটু মুখই বন্ধ হতে হবে।

আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ —আরোও মনের এই সংকীর্ণতা

সূক্ষ্ম করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেজাদবীর ইচ্ছা বাত্তিরকে কোন সমককোনপেরেশানী
অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে
আল্লাহ্ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সত্যক অবগত রয়েছেন যে, কখনো বেজাদবী
অথবা কষ্টমানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اَوْ اَيُّنِ গানের অর্থ

কোন। অর্থাৎ তওবাকারী। হাদীসে বাদ মারিবেহ হুদরাক জাত এবং ইকরীকর

নকর নামাকে اَوْ اَيُّنِ বলা হয়েছে। এতে ইদ্রিত রয়েছে যে, এই নামটিগুলো

পড়ার চতুর্থী কতাদেরই হয়, তারা اَوْ اَيُّنِ অর্থাৎ তওবাকারী।

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

(২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান এবং ভ্রাতাব্রত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য দু'টি আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে আরও দু'টি নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. গিভামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম জনগণের হক। দুই. অপব্যয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। এর সংক্ষিপ্ত তকসীর এরূপঃ) আত্মীয়কে তার (আর্থিক ও অন্যান্য) হক দান কর এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে (ভ্রাতার হক দাও)। (অর্থসম্পদ) অবধা ব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (অর্থাৎ শয়তানের মতই) আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (আল্লাহ তা'আলা তাকে বিবেক-বুদ্ধিতে স্মরণ করেছেন, কিন্তু সে এই সম্পদ আল্লাহ তা'আলার নাকরমানীর কাজে ব্যয় করেছেন) এমনভাবে অপব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা অর্থসম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তারা সেগুলো আল্লাহর নাকরমানীতে ব্যয় করে।

আনুমানিক ভাষ্য-বিবরণ

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবেঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে গিভামাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়ের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন-সাপন ও সম্বাহার করতে হবে। যদি তারা ভ্রাতাব্রত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতে দ্বারা প্রতীকৃ বিহীন তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের ওপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন-সাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বলাও চলে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেনঃ তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ—এমন আত্মীয় বহির্ভূত কিংবা বাজক-বাজিকা হয়, নিষিদ্ধ হয় এবং উপার্জন করলেও সক্ষম না হয়, এমনভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবন ধারণের মত ধনসম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের ওপর ফরিয়। যদি একই ঘরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াতঃ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (তারও এক বিধানটি প্রমাণিত হয়) — (তুফসীরে

মাহহারী)

এ আয়াতে আখীর, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার বিলম্ব করায়। দাতা সে করায়ই পালন করছে মাত্র, কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

তৈয়ী অর্থাৎ অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা : কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি তৈয়ী এবং অপরটি অসরাফ — আলোচ্য আয়াতে আরো তৈয়ী নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অসরাফ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহর কাজে কিংবা অবখা অস্থানে ব্যয় করাকে তৈয়ী ও অসরাফ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন : গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অবখা ও অস্থানে ব্যয় করাকে তৈয়ী বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে অসরাফ বলা হয়। তাই অসরাফ — এর চাইতে গুরুতর। তৈয়ী — কারীদেরকে শরতানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন : কেউ নিজের সমস্ত মাল হক জারায় করায় হানা হকর দিকে তা অবখা ব্যয় হবে না। গুরুতর যদি অন্যায়-অমুত্ব কাজে এক মুদও (স্বার্থসর) ব্যয় করে, তবে তা অবখা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে তৈয়ী বলা হয় (মাহহারী)। ইমাম মালিক (রহ) বলেন : হক পথে অর্থাৎ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে তৈয়ী বলা হয়। একে অসরাফ ও বলে। এটা হারাম। — (কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন : হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিনহার খরচ করাও তৈয়ী এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমিতকৃত খরচ করা, স্বদরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয় — এটাও তৈয়ী — এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মূল্যবান বৈধ কাজে মুক্ত হতে ব্যয় করে, তবে তা তৈয়ী — এর অন্তর্ভুক্ত নয়। — (কুরতুবী)

وَمَا تَرْضَيْنَ عَنْهُمْ اتِّفَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُومَهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

(২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করণার প্রত্যাশার অপেক্ষায় থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ আয়াতে বাঙ্গালি মুক সন্দর্ভে পঞ্চম আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় অভাবগ্রস্তদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করার ব্যবস্থা না হয় তবে তখনও তাদেরকে যেন রূঢ় ভাষায় জওয়াব না দেওয়া হয়, বরং সহানুভূতির সাথে ভবিষ্যৎ সুবিধার আশা দেওয়া হয়। তকসীরে এরূপঃ)

এবং যদি (কোন সময় তোমার কাছে তাদেরকে দেওয়ার মত অর্থ-সম্পদ না থাকে এবং এক্ষণে) তোমাকে ঐ স্রিস্থিকের প্রতীক্ষায়, যা পাওয়ার আশা পালনকর্তার কাছে কম, (তা না আসা পর্যন্ত) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে (এতটুকু খেয়াল রাখবে যে) তাদেরকে নম্র কথা বলে দেবে। (অর্থাৎ হস্তচিহ্নতার সাথে তাদেরকে এরূপ ওরাদা দেবে যে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে কোনখান থেকে এলে দেবে। পীড়াদায়ক উত্তর দেবে না।)

আনুমানিক ভাষা বিবরণ

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অতীতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়ারল হয়ে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মত কিছু না থাকায় দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আন্তরিকতারূপে অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত, বরং তা আপনার কৃতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শাসন-মুহুর সন্দর্ভে ইবনে জারের রোওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুর্কারে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুর্কার থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

মসনদে সাঈদ ইবনে যনসুর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লিখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সন্দর্ভেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِهِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقَعْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝
 إِنَّهُ كَانَ يَعْبَادُهُ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

(২৯) তুমি একেবারে স্বার-বৃষ্ঠ হইয়া না এবং একেবারে যুক্তহস্তও হইয়া না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা থাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,—সব কিছু দেখছেন।

তরসীরের সার-সংক্ষেপ

তুমি নিজের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যে, চূড়ান্ত কৃপণতার কারণে ব্যয় করা থেকে হাত ওঠিয়ে নেবে) এবং সম্পূর্ণ খুলেও দিয়ো না (যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করে অপব্যয় করবে) নতুবা তিরস্কৃত (ও) রিক্ত হস্ত হয়ে বসে থাকতে হবে। (করও অভাব-অনটন দেখে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা থাকে ইচ্ছা বেশী রিযিক দান করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা ও উপযোগিতা) সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন, দেখেন। (সমগ্র বিশ্বের অভাব দূর করা রাক্বুল আলামীনেরই কাজ। তুমি এ চিন্তা কেন করবে যে, নিজেকে বিপদে ফেলে সবার অভাব-অনটন দূর করবে। এটা এজন্য অর্থহীন যে, সবকিছু করার পরও করও অভাব দূর করা তোমার সাধ্যো ক্রমে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ করও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবে না বরং উদ্দেশ্য এই যে, সবার অভাব দূর করার সাধ্য কোন মানুষের নেই, যদিও সে নিজেকে যত বিপদে ফেলতেই সম্মত হোক। এ কাজ একমাত্র হুঈ জগতের প্রভুর। তিনি সবার অভাব ও চাহিদা সম্পর্কে জানেন এবং সবার কল্যাণ সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। কখন, কোন্ ব্যক্তির, কোন্ অভাব কি পরিমাণ দূর করা উচিত তা তাঁরই জ্ঞান আছে। মানুষের কাজ শুধু মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা—খরচ করার জায়গায় কৃপণতা না করা এবং এত বেশী খরচ না করা যে, আগামীকাল নিজেই ফকীর হয়ে যায়, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আর পরে আক্ষেপ করতে হয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ (সা)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সন্ধান দান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন যিতাতার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুশুনে ইবনে মারদওয়াইহ্ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মাসউদের রেওয়াজেতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়াজেতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল : আমার আত্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন : অন্য সময় যখন তোমার আত্মার সওয়াব পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেকে ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল : আত্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাযের সময় হল। হযরত বেলাল (রা) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভেতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আজাহর পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর : এ আয়াত থেকে বাহ্যত এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন : সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্ট পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন

গাকের ^{٨٥٨}مَسْجُور শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সং-সংসী যে, পরবর্তী কণ্টের জন্য মোটেই যাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। একারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসিত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে স্বীয় ধনসম্পদ নিঃশেষে আজাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন কিছুই করেন নি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সংকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ : আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। উবিষাৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা কোন ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপারক হয়ে পড়াও

বিশংখলা। (মাযহারী) ^{٨٥ ٨٦ ٨٧} **مَلُومًا مَّحْسُورًا** শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, **مَلُوم** শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ রূপগততার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ রূপগততার কারণে হাত ওটিরে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। ^{٨٨ ٨٩} **مَّحْسُورًا** শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী বায় কর নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে **مَّحْسُور** অর্থাৎ ব্রাহ্ম, অক্রম অথবা অনুত্তম হয়ে যাবে।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ۝

(৩৯) দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। (কেননা) সবার রিযিকদাতাই আমি। তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। (রিযিকদাতা তোমরা হলে এরূপ চিন্তা করতে পারতে) নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়ত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহিলিয়ত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অভ্যস্ত জঘন্য ও ব্রাহ্ম তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তার কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এক্ষেত্রে রিযিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ-তা'আলা যে বাস্নাকে নিজের পরিবার-পরিজনদের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য

করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

أَنَّمَا تَلْصُقُونَ وَتَرْزُقُونَ بضعفائكم

অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের উন্নয়নসাধনকারী পিতামাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়।

মাস'আলা : কোরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আশ্চে-মুচে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ডায়ালেক্সিস ও পরিবার-পরিজনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে রিযিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই দ্রাব্য ও জাহেলিয়ত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গোনাহ না হলেও এটা যে গহিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

(৬২) আর ব্যভিচারের কাছেও যোয়া না। নিশ্চয় এটা অস্বাভাবিক কাজ এবং মন্দ পথ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ব্যভিচারের কাছেও যোয়া না (অর্থাৎ এর প্রাথমিক কারণাদি থেকেও বেঁচে থাক)। নিশ্চয় এটা (নিজেও) নিতান্ত অস্বাভাবিক কাজ এবং (অন্যান্য অনিশ্চয়ের দিক দিয়েও) মন্দ পথ! (কেননা, এর পরিণতিতে শত্রুতা, গোলযোগ এবং বংশবিকৃতি দেখা দেয়।)

জানুয়ারি জাতীয় বিষয়

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. এটি একটি অস্বাভাবিক কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে

إِذَا فَاَتَى الْحَيَاءُ فَاَفْعَلَ

অর্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার।

এজন্যই রসুলুল্লাহ (সা) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন :

لِلْحَيَاءِ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (বুখারী)।

দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাস্থিতি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিমিতা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়।

বর্তমান বিবেচনায়, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে হুড়াহুড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সন্ত্রাসরি বাস্তব হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু এখানে বাস্তব হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিজে আসে, যার দ্বারা বাস্তব হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। একারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সম্মিলিত করেছে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সন্ত আকাশ এবং সন্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাহীন থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আঘাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লান্হনাও হতে থাকবে।—(বায়হাক)

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র বাচনিক অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না। মদ্যপানী মদ্য পান করার সময় মু'মিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।—(মায়হারী)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ۝

(৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যে ব্যক্তির হত্যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, কিন্তু ন্যায়ভাবে (হত্যা করা জায়েয)। অর্থাৎ যখন কোন শরীয়তসম্মত বিধানের কারণে হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা জায়েয হয়ে যায়, তখন তা আর হারামের আওতাধীন থাকে না।)

যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার (সত্যিকার অথবা নিয়োজিত) উত্তরাধিকারীকে (কিসাস প্রহণের) ক্ষমতা দান করেছি। অতএব হত্যার ব্যাপারে তার (শরীয়তের) সীমা লঙ্ঘন করা উচিত হবে না। [অর্থাৎ হত্যার নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতিরেকে হত্যাকারীকে হত্যা করবে না। হত্যাকারীর যেসব আত্মীয়-স্বজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়, শুধু প্রতিশোধ স্হায়ী উদ্দেশ্যে তাদেরকে হত্যা করবে না। এছাড়া হত্যাকারীকেও শুধু হত্যাই করবে, নাক, কান অথবা হাত-পা কেটে 'মুসলা' (অঙ্গবিকৃত) করবে না কেননা] সে ব্যক্তি (কিসাসের সীমালঙ্ঘন না করলে শরীয়তের আইনে) আজাহর সাহায্যের যোগ্য। (আর সে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তবে অপর পক্ষ উৎপীড়িত হওয়ার কারণে আজাহর সাহায্যযোগ্য হওয়ার কদর করা এবং সীমালঙ্ঘন করে এ নিয়ামতকে বিনষ্ট না করা।)

আনুমানিক জাতক্য বিষয়

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাদর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আজাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লম্বা অপরাধ। কোন কোন রেওয়াজেতে এতৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আজাহর তা'আলার সন্ত আকাশ ও সমুদ্রমলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আজাহর তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।—(ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মায়হারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আজাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে **أُتِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** অর্থাৎ এই লোকটিকে আজাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে।—(মায়হারী, ইবনে মাজা হইতে)

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়ার রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : প্রত্যেক গোনাহ আজাহর তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনেওনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস-উদের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে মুসলমান আজাহর এক এবং মুহাম্মদ আজাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়, কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রসূত বর্ষে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। দুই. সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারে। তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

অন্যায়ের জওলাব অন্যায় নয়—ইনসাক। অপরোধীর শাস্তির বেলায়ও ইনসাকের

www.pathagar.com

করবেন। তাঁর আদামতে কোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۖ إِنَّا
كَلِمَةٌ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۚ السُّتْقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۖ

(৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেনো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বীকণে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিভাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লা ওজন করবে। এটা উত্তম এর পরিণাম শুভ।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

এতীমের মালের কাছে যেনো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্তু এমন পন্থায়, যা (শরীয়তের আইনে) উত্তম, যে পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে যায়। এবং (বৈধ) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় (কিয়ামতে) অঙ্গীকার সম্পর্কে জিভাসাবাদ করা হবে। (বান্দা আত্মাহুঁর সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছে এবং মানুষের সাথে যেসব অঙ্গীকার করে থাকে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।) এবং (পরিমেষ বস্তুকে) যখন মেপে দাও তখন পুরোপুরি মেপে দাও এবং (ওজনের বস্তুকে) সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন কর দাও। এটা (প্রকৃতই) উত্তম এবং এর পরিণাম শুভ। (পরকালে সওয়াব এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি, যা ব্যবসায় ক্ষেত্রে উন্নতির উপায়।)

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে অধিক হক সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশ বর্ণা—নবম, দশম ও একাদশতম নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বর্ণিত হয়েছে।

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেনো না। অর্থাৎ এতে যেন শরীয়তবিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের হিকায়ত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যস্ত করবে। নিজেদের খোয়াল-খুশীতে অথবা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতীতই ব্যস্ত করবে না। এ কর্মধারা ততদিন

অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীয় শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হিফাজত নিয়েই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বছর।

অবৈধ পছন্দ যে কোন ব্যক্তির মাল ধ্বংস করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতীয়ের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আত্মাহু পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ভুলটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ্ আধিক হয়।

অসীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ : অসীকার পূর্ণ করার তাক্বীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অসীকার দুই প্রকার। এক. যা বান্দা ও আত্মাহু মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অসীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আত্মাহু তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অসীকারের অবশ্যস্বাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অসীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে—দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক কিংবা কাকির। এছাড়া মু'মিনের একটি অসীকার রয়েছে যা লা ইলাহা ইল্লাহু'র সাক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আত্মাহু বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অসীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অসীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে ভাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উপস্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না করার অসীকার করা। যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অসীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উপস্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উপস্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভুল করলে সে গোনাহ্‌গার হবে। হাদীসে একে কার্বত নিকাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **إِنَّ الْوَعْدَ بَيْنَ مَسْئُولٍ** —অর্থাৎ কিয়ামতে

অন্যান্য করায়, ওয়াজিব কর্ম এবং আত্মাহু বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে

যেমন জিভাসাধাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও গ্রহণ করা হবে। এখানে শুধু 'গ্রহণ করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। গ্রহণ করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে ওরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে জেন-দেনের ক্ষেত্রে মাগ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাগের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা যুতাহ্‌ফিক্বীনে উল্লিখিত আছে।

মাস'আলা : ফিকাহবিদগণ বলেছেন : আয়াতে মাগ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নিদিষ্ট ও অপিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা ভ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাগ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা : মাস'আলা— **أَوْفُوا**
الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ তরসীর বাহরে যুহীতে আবু হাইয়ান বলেন : এ আয়াতে মাগ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অগিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাগ ও ওজন পূর্ণ করার অন্য বিক্রেতা দারী।

আয়াতের শেষে মাগ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে : **ذَٰلِكَ خَيْرٌ**

وَإِحْسَنُ تَأْوِيلًا —এতে মাগ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে।

এক. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরূপ করা যতদূর দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন হাড়াও যুক্তি ও যতাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাগা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। দুই. এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা সওয়াব ও জাহাজ হাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা বাণীত অর্জিত হতে পারে না।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ
لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ
سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

(৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার গিহনে পড়ো না। নিশ্চয় কান চক্কু ও অস্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দৃষ্টতরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়।

তাকসীরের সার-সংক্ষেপ

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তাকে কার্যে পরিশ্রম করো না। (কেমনা) কান, চক্কু ও অস্তঃকরণ—এদের প্রত্যেকটিকেই (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে (যে কান ও চক্কুকে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে? সেই কাজ ভাল ছিল, না মন্দ? প্রমাণহীন বিষয়ের কল্পনা অন্তরে কেন স্থান দিয়েছে?) এবং ভূ-পৃষ্ঠে গর্বভরে বিচরণ করো না। (কেমনা) তুমি (ভূ-পৃষ্ঠে সজোরে পদক্ষেপ করে পদডায়ে) ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং (দেহকে উঁচু করে) গাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে না। (উল্লিখিত) এসব মন্দ কাজ তোমার পালনকর্তার কাছে (সম্পূর্ণ) অপছন্দনীয়।

জানুয়ারি জাতীয় বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঈদশতম ও হুম্বাদশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। ঈদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোন বিষয়কে কার্যে পরিশ্রম করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরী যে, জানার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। এক প্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের কোন সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পৌঁছা। এতে বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে। এমনভাবে বিধানাবলীও দু'প্রকার। এক, অকাটা ও নিশ্চিত বিধানাবলী, যেমন আকায়দ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ। এগুলোতে প্রথম স্তরের জ্ঞান বাহনীয়। এ ছাড়া আমল করা জায়েয নয়। দুই, ظنیات অর্থাৎ ধারণা প্রসূত বিধানাবলী, যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এই বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাটা বিধানাবলীতে প্রথম স্তরের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। অর্থাৎ আকায়দ ও ইসলামী মূলনীতিসমূহে এরূপ জ্ঞান না হলে তার কোন মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসূত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই যথেষ্ট। —(বরানুল কোরআন)

কান চক্কু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ : **أَنْتَ السَّمْعُ**

وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مُسَوِّئٍ —এ আয়াতে বলা হয়েছে

যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রর করা হবে : কানকে প্রর করা হবে : তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রর করা হবে : তুমি সারা জীবনে কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রর করা হবে : সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে, যেমন কারও গীত এবং হারাম গানবাদা কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে, যেমন ভিন্ন স্ত্রী সূত্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়ম করে থাকে, তবে এ প্রসঙ্গ ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আরাহ্

প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রর করা হবে। **لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ**

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোই উল্লেখ করা হয়েছে।

তকসীয়ে কুরতুবী ও মামহান্নীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে

বলা হয়েছিল **لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** — অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই,

তা কার্যে পরিণত করে না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রর করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জ্ঞান-শোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রর করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রর করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের যন্ত্রদানে ভিত্তি-হীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাজ্জনার কারণ হবে।

সুন্না ইব্রাহীমীয়ে বলা হয়েছে : **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا**

أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا قَالُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভাব্যত এই যে, আরাহ্ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিস্তৃত হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে।

যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহর এই নিরীক্ষণশীলতার নালিশকারী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইস্তিয়াদাত মানুশ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে—কর্ণ চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যন্ত্রাদ্বারা উদ্ভাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুশ অধিকতর জ্ঞান কর্প ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইস্তিয়াদের মধ্যে থেকে মাত্র দুটি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দুটি ইস্তিয়াদ এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবত এই যে, মানুষের জ্ঞান বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

দ্বিতীয় আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই : ভূ-পৃষ্ঠে দস্তভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যন্ত্রাদ্বারা অহংকার ও দস্ত প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টানকরে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহর হুট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ। মানুষের ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেঁয় ও লুণা মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আযয ইবনে আশ্শাম (রা)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন : ছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, মন্ত্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।—(মায়হারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। —(মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রার এক রেওয়ায়েতে হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন : বড়ত্ব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি আমার কাছে থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (চাদর ও লুঙ্গি বলে পোশাক বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব বিশিষ্টও নন যে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহর মহত্ত্বওণ বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণে আল্লাহর শরীক হতে চায় সে জাহান্নামী।)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যারা অহংকার করে, ক্ষিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিপিলিকার সমান মানবাকৃতিতে উদ্ভিত করা হবে। তাদের উপর

চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারা প্রকোষ্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, যার নাম বুলস। তাদের উপর প্রধ্বস্তর অগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি দেওয়া হবে।—(তিরমিমী)

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) একবার এক ভাষণে বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিনয় ও মন্থতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট, কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়।—(মাযহারী)

উল্লিখিত নির্দেশাবলী বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

قُلْ ذَلِكَ فَاَنْ سَيِّئَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا — অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহর কাছে মকরুহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু কল্পনীয় আদেশও আছে, যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি; যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বোঁচো থাকা; অর্থাৎ পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কহীন করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বোঁচো থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

ই'নিয়ারি : পূর্বোল্লিখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল : وَاسْعَىٰ لَهَا سَعِيهَا এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রসুলুল্লাহ (সা)-র সুমত ও শিক্রার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তদ্ব্যতীত প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার-সংক্ষেপ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।—(মাযহারী)

ذَلِكَ مِنَّا وَنَحْنُ إِلَيْكَ رَبِّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

اخْرِقْتَنِي فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْهُورًا ۝ اَقْضِ فِكْمَ رَبِّكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 وَاَتَّخِذْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنۡاٰثًا ۝ اِنۡكُمۡ لَتَقُولُوۡنَ قَوْلًا عَظِيۡمًا ۝ وَلَقَدْ
 صَرَّفْنَا فِيۡ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوۡا ۝ وَمَا يَزِيۡدُهُمۡ اِلَّا نِفُوۡرًا ۝ قُلْ
 لَوْ كَاٰنَ مَعَهُۥ اِلٰهَةٌ كَمَا يَقُوۡلُوۡنَ اِذۡلَا بَسْتَفۡوَاۡلِيۡ ذٰلِكَ الْعَرۡشُ
 سَبِيۡلًا ۝ سُبۡحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوۡلُوۡنَ عُلُوًّا كَبِيۡرًا ۝ تَسۡبِيۡحُ لَهٗ
 السَّمٰوٰتُ السَّبۡعُ وَالۡاَرۡضُ وَمَنۡ فِيۡهِنَّ ۝ وَاِنۡ مِّنۡ شَیْءٍ اِلَّا اِلَیَّهِ
 يَحۡمِۡدُ ۝ وَلٰكِنۡ لَا تَفۡقَهُوۡنَ تَسۡبِيۡحَهُمۡ ۝ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيۡمًا عَفُوۡرًا ۝

(৩৯) এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী
 মারফত দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য হিঁস করবেন না। তাহলে
 অভিসূক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিভাঙিত অবস্থার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন।
 (৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং
 নিজের জন্য কেরেনতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা ওরফতর
 কথাবার্তা বজাহ। (৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা
 করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুগ্ধতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুনঃ তাদের কথাযত
 যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ
 অন্বেষণ করত। (৪৩) তিনি নেহায়েত পবিত্র ও মহিমাম্বিত এবং তারা যা বলে থাকে
 তা থেকে বহু উর্ধ্বে। (৪৪) সন্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে
 সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর
 সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা
 তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (স), এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশাবলী] ঐ হিকমতের অংশ, যা
 আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। (হে সম্বোধিত ব্যক্তি)
 আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য হিঁস করো না। নতুবা তুমি অভিসূক্ত, বিভাঙিত হয়ে
 জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (উল্লিখিত নির্দেশাবলী প্রদানের সূচনাও তওহীদের বিষয়বস্তু
 যারা কল্পা হয়েছিল এবং শেষও এর মাধ্যমেই কল্পা হয়েছে। এরপরও তওহীদের বিষয়বস্তু

বর্ণিত হচ্ছে যে, পূর্বে যখন শিরকের মন্দ ও বাতিল হওয়া জানা গেল, তখন এরপরও কি তোমরা তওহীদের গল্পগহ্বা বিষয়াদিতে বিশ্বাস কর? (উদাহরণত) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং নিজে ফেরেশতাদেরকে (নিজের) কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? (আরকের মূর্খরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যারূপে আখ্যায়িত করত। এটা দু'কারণে বাতিল। আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত এবং দুই সন্তান ও কন্যাসন্তান মাদেরকে ছেউ নিজের জন্য পছন্দ করে না—অবশ্যই বলে মনে করে। এর ফলে আল্লাহকে আরও একটি দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।) নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর কথা বলছ। (গল্পগহ্বার বিষয় যে, শিরকের খণ্ডন ও তওহীদের বিষয়বস্তুকে) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা বুঝে নেয়। (বিভিন্ন পন্থায় বাস্তবের তওহীদের বিষয়বস্তু সপ্রমাণ এবং শিরক বাতিল করা সম্বন্ধে তওহীদের প্রতি) তাদের অনীহাই কেবল বৃদ্ধি পায়। আপনি (শিরক বাতিল করার জন্য তাদেরকে) বলুন: যদি তাঁর (সত্য উপাস্যের) সাথে অন্য উপাস্যও (অংশীদার) হত, যেমন তারা কুলে, তবে তদবস্থায় আরকের মালিক (সত্যিকার আল্লাহ) পর্যন্ত গোঁয়ার হাত্তা তারা (অর্থাৎ অন্য উপাস্যরা কবে) বের করে নিত। (অর্থাৎ তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কর, যদি তারা বাস্তবিকই অংশীদার হত, তবে আরকের মালিক আল্লাহকে আক্রমণ করে বসত এবং পথ ধুঁজে নিত। যখন কথিত উপাস্য শক্তিগোলের মধ্যে পতঙ্গের মত বেঁধে যেত, তখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলতে পারত। অথচ দুনিয়া যে একটি অটল ব্যবস্থার অধীনে চালু রয়েছে, তা প্রত্যেকের দৃষ্টির সামনে বর্তমান আছে। তাই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা বিগতভাবে চালু থাকাই এ বিশ্বের প্রমাণ হয় যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ তাঁর অংশীদার নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে) তারা যা কিছু বলে, আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্ব। (তিনি এমন পবিত্র যে) সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু (ফেরেশতা, মানুষ ও জিন) রয়েছে সবাই (ব্যক্তরূপে অথবা অবস্থাপত্যভাবে) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং (এই পবিত্রতা বর্ণনা) শুধু বিরুদ্ধবাদী মানুষ ও জিনরাই করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনাকে) বোক না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

আনুযাফিক জাতব্য বিষয়

اِنَّ لَا يَنْفَعُوْا

আল্লাহতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্টি

জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ না হন, বরং তাঁর আল্লাহুতে অন্যরাও স্রষ্টা হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কালাম শাস্ত্রের প্রমাণাদিতে এ প্রমাণটির

যমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তসবীহ পাঠ করার অর্থ : কেন্নে শতাব্দী
সবাই এবং ইমানদার মানব ও জিনদের তসবীহ পাঠ করার বিষয়টি আঙ্কল্যমান—
সবাইই জানা। ফকির মানব ও জিন বাহ্যত তসবীহ পাঠ করে না। এমনিভাবে
জগতের অন্যান্য বস্তু যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তসবীহ
পাঠ করার অর্থ কি? কোন কোন আলিম বলেন : তাদের তসবীহ পাঠের অর্থ অবস্থা-
গত তসবীহ। অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত
অবস্থা ব্যক্ত করেছে যে, তারা দ্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং দ্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার
কোন কিছুই শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তসবীহ।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাপূত তসবীহ তো শুধু ফৈয়্যুজাতা এবং ইমানদার জিম ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিপন্থভাবে আল্লাহ তা'আজা জগতের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে তসবীহ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাকিরুরাও সাধারণভাবে আল্লাহকে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহ্যত আল্লাহর অস্তিত্ব মুখে স্বীকার করে মা তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করছে, যেমন বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহর তসবীহ পাঠে যশস্তল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিপন্থ ও বাধ্যতামূলক তসবীহ সাধারণ মানবের প্রতিপোচন হয় না।

কোরআন পাকের **وَلَكِنْ لَا تَقْهَرُونَ** উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক

বস্ত্র সৃষ্টিগত তসবীহ্ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাপত
তসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই
তসবীহ্ পাঠ শুধু অবস্থাপত নয়—সত্যিকারের, কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির
উর্ধ্বে।—(কুর্তবী)

হাদীসে একটি মুজিয়া উল্লিখিত আছে। রসূলুল্লাহ (স)-র হাতের তালুতে কংকরের তসবীহ পাঠ সাহায্যে কিয়াম নিজ কানে শুনেছেন। এটি যে মুজিয়া, তা বলিই বাহ্যিক। কিন্তু 'খাসায়সে-কুবরা' প্রভৃ শাযখ জালালুদ্দীন সুন্নতী (র) বলেন : কংকরসবহের তসবীহ পাঠ রসূলুল্লাহ (স)-র মুজিয়া নয়। তারা ভেবেছিলেন খাফে, সেখানেই তসবীহ পাঠ করে; বরং মুজিয়া এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক হুজ্জা-প্রমাণ পেশ করেছেন। উদাহরণত সূরা সাদে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কে

वशा सन्नाह : اِنَّا صَغَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يَسْبَعُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاُشْرَاقِ

—অর্থাৎ আমি পাহাড়সমূহকে আতাবহ করে দিয়েছি। তারা মাউদের সাথে সফার-বিকার তসবীহ পাঠ করে। সূরা বাক্বার পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَأَن مَّثَاهَا**

لَهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ —অর্থাৎ কড়ক পাথর আল্লাহর ভয়ের নীচে পড়ে যায়।

এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা ময়িদে মিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ইসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে :

وَتَكْفُرُ الْجِبَالُ ۚ هَٰذَا أَن دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا —অর্থাৎ এরা আল্লাহর

জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুকরী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহকে স্মরণ করে—এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে, তবে প্ররক্ষার পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন :

وَقَالُوا أَتُكْفِرُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا —অতঃপর বলেন : এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত

হয় যে, পাহাড় কুকরী বাক্য শুনে প্রতাবাণ্ডিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন জু্মি কি মনে কর যে, তারা কতিল কথাবার্তা শোনে, কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর মিকর শোনে না এবং তারা প্রতাবাণ্ডিত হয় না? (কুরতুবী) রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন জিন, মনেব, পাথর ও টিলা এমন নেই, যে মুসলিমিনের আওয়ায শুনে কিয়ামতের দিন তাঁর ইমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়।—(মুয়াফা ইরশাদ মালিক, ইবনে মুজা)।

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : আয়ত আওয়ায সময় খাদ্যের তসবীহর শব্দ শুনতাম। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়ত রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে খানা খেলে খাদ্যের তসবীহর শব্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত আবেকের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি যত্নের ঐ পাথরটিকে চিনি, যে নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি। কেউ কেউ বলেন : এই পাথরটি হচ্ছে “হাজ্জের-আসওয়াদ।”

ইমাম কুরতুবী বলেন : এ বিষয়াবলী সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। ইহাযা শুভের কাহিনী তো সকল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিলর তৈরী হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সা) যখন একে ছেড়ে মিছরে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কায়দা শব্দ সাহাবায়ে কিয়ামও শুনেছিলেন।

এসব রেওয়াজেও দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, আসমান ও জম্বিনের প্রত্যেক বস্তু মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তু সত্যিকারভাবে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে। ইব্রাহীম (আ) বলেন : প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক সব বস্তুর মধ্যেই এই তসবীহ বিদ্যমান আছে। এমন কি, দরজার কপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তসবীহ আছে। ইমাম কুরতুবী বলেন : তসবীহের অর্থ অবস্থাপ্রাপ্ত তসবীহ হলে উপরোক্ত আল্লাতে হযরত দাউদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাপ্রাপ্ত তসবীহ প্রত্যেক চেতনাশীল মানুষ প্রত্যেক বস্তু থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উক্তিগত তসবীহ। খাসায়েরে কুবরা প্রস্থের বরাত দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংকরদের তসবীহ পাঠে মুজিবা ছিল না। ওরা ভো সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তসবীহ পাঠ করে। রসুলুল্লাহ (সা)-র মুজিবা ছিল এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ এমন শব্দময় হয়ে ওঠে, যা সাধারণ মানুষেরও প্রতিগোচর হয়। এমনভাবে পাহাড়-সমূহের তসবীহ পাঠও হযরত দাউদ (আ)-এর মুজিবা এ হিসাবেই ছিল যে, তাঁর মুজিবার এ তসবীহ কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ۖ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ۚ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۚ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

(৪৫) যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পর-কালে অমিশ্রাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কণ্ঠ কুহক্রে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একমুখী আহ্বান করেন, তখনও অস্বীকারমূলক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও জানি যেগনে আলোচনাকালে যখন আলিমের বলে, ডোমরা এটা এক যাদুগ্রন্থ ব্যক্তির অনুসরণ করছে। (৪৮) দেখুন ওরা আপনাকে অন্য কেমন উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে; অতএব ওরা পথ পেতে পারে না।

তরুণীর সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কোরআনে তওহীদের বিবরণ শুধু বিভিন্ন ভাষাতে বিভিন্ন হুজিগ্রন্থসহ বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও হতভাগা মুশরিকরা তা মানেন না। আলোচ্য আয়াতসমূহে ওদের না মানার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ওরা এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করে না, বরং এগুলোকে ঘূর্ণা ও বিষ্ট প করে। ফলে ওদেরকে সত্যের জ্ঞান থেকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তরুণীর সার-সংক্ষেপ এরূপ :)

যখন আমি (তবরীজের জন্য) কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও ওদের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল করে দেই, যাত্রা পরকালে বিশ্বাস করেন। (পর্দা এই যে) আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দেই, যাতে ওরা একে (অর্থাৎ কোরআনের উচ্চারণ) না বোঝে এবং ওদের কানের ওপর বোকা চাপিয়ে দেই। (যাতে ওরা একে হিদায়ত অর্জনের জন্য না শুনে। উদ্দেশ্য এই যে, সেই পর্দাটি হচ্ছে ওদের না বোঝার এবং বোঝার ইচ্ছাই না করার। বোঝার ইচ্ছা করলে ওরা আপনার নব্বয়ত চিনতে পারত)। যখন আমি কোরআনে শুধু মায় পালনকর্তার (গুণাবলী) উল্লেখ করেন (এবং ওরা যেসব উপদেশের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে সেইসব শুণ নেই) তখন তারা (নির্বিকৃত) বরং বন্ধ ব্যক্তিত্ব কারণে) ঘূর্ণাত্মে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (অন্তঃকরণ তাদের এই কুসংস্কার জন্য শান্তির ধরন বঞ্চিত হয়েছে যে) যখন তারা আপনার দিকে ফিরে আসে, তখন আমি ভালভাবেই জানি, যে নিয়তে তারা শুনে (সেই নিয়ত হচ্ছে, আপনি উপদেশ করা, দোষারোপ করা এবং সমালোচনা করা) এবং যখন ওরা (কোরআন ওনার পর) পরস্পর কানাকানি করে (আমি তাও ভালভাবেই জানি) যখন আলিমরা বলে : তোমরা তো [অর্থাৎ ওদের মধ্য থেকে যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র অনুসরণে আল্লারিহোগ করেছে] এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ, যার উপর হাদুদ (বিশেষ) ক্রিয়া [অর্থাৎ পাপমামির ক্রিয়া] হয়েছে। অর্থাৎ তার অন্তত কথাবার্তা সহই মস্তিষ্কবিকৃতির ফল। হে মুহাম্মদ (সা) [সেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপাধি বেঁধে করেছে। অতএব ওরা (সম্পূর্ণই) পথভ্রান্ত হয়ে গেছে। এখন ওরা (সত্য) পথ পেতে পারবে না। কেননা, এ ধরনের হঠকা-রিভা ও জেদ, বিশেষত আল্লাহর রসুলের সাথে এরকম ব্যবহারের কারণে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও হিদায়তপ্রাপ্তির যোগ্যতা হোপ পায়)।

আনুমানিক ভাষাত্মক বিষয়

পরশবরের ওপর হাদুদ ক্রিয়া হতে পারে : পরশবরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, তর ও বাতাস ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের ওপর হাদুদ ক্রিয়াও সত্ত্বপূর্ণ। কেননা, হাদুদ ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে, জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সা)-র ওপরও হাদুদ ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাকিররা তাঁকে হাদুদগত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম তাই, যার প্রতি তরুণীর সার-সংক্ষেপ

ইসিত করা হয়েছে যে, যাদুঘর বন্ধে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআনে তাই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিশ্বব্রহ্মবস্তুর একটি বিশেষ দানে নুশুল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে মুবারেক থেকে বর্ণনা করেন : কোরআনে যখন সূরা নাহকের নাখিল হয়, যাতে আবু নাহকের জীবিত নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার স্ত্রী রসুলুজাহ্ (সা)-র মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রা) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসুলুজাহ্ (সা)-কে বললেন : আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন : না, তার ও আমার মধ্যে আত্মা তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসুলুজাহ্ (সা)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবু বকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলতে লাগল : আপনার স্ত্রী আমার 'হিজ্ব' (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আত্মাহর কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে এতখানি বলতে-বলতে প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। তার প্রস্থানের পর কুরতুবী আবু বকর আরব করলেন : সে কি আপনাকে দেখেনি? রসুলুজাহ্ (সা) বললেন : যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

শব্দর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আয়ত : হযরত কা'ব বলেন : রসুলুজাহ্ (সা) যখন মুরসিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শব্দরা তাঁকে দেখতে পেত না।

আয়াতত্রয় এই : এক আয়াত—সূরা কাহাফের

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ—দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহকের—

طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَرَ لَهُمْ—এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিরার

أَفْرَأَيْتَ مِمَّا اتَّخَذَ آلُهُ هَوَاهُ وَأَفَلَا لِلَّهِ عَلَيْهِ حَقٌّ عَلَىٰ سَمْعَةٍ

وَقَلْبَةٍ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً—

হযরত কা'ব বলেন : রসুলুজাহ্ (সা)-র এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশত স্নান দেশে গমন করেন। বেশ

কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাকিরদের নির্বাচনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রু রা তাঁর পশ্চাৎদ্বার করে। এতেন সংকট মুহুর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি কাজবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পড়া পড়ে গেল। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রু রাও সেই রাস্তায় চলা-ফিরা করছিল। কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পারছিল না।

ইমাম সা'লাবী বলেন : হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়াজেতেটি আমি 'রায়' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সাল্লাল্লাযের কাকিররা তাঁকে প্রেষতার করত। তিনি কিছুদিন কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রু রা তাঁকে পেহনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতসমূহ পাঠ করলে আয়াত তা'আলা তাদের চোখের ওপর পড়া ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের ফাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী বলেন : উপরোক্ত আয়াতসমূহের সাথে সূরা ইয়াসীনের এই আয়াত-গুলোও যেমনো উচিত, যেমনো রসূলুলাহ (সা) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখানে দিয়ে চলে যান, বরং তাদের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করতে করতে যান, কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই :

يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ - اَفْكَ لَيْنَ الْمُتَوَسِّلِينَ - عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ - تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ - لَتَنْزِيلُ رَقُومًا مَّا آتَدِ رَابِعَهُمْ فُهِم

غَا فُلُوقٍ - لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُم لَا يُؤْمِنُونَ - اِنَّا جَعَلْنَا فِي

اَعْيُنِهِمْ اَغْلًا لَا يَفْهَمُ اِلَىٰ اِلَّا اَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ - وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

اَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَاَمْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ

ইমাম কুরতুবী বলেন : আমি অনেক আন্দালুসে কর্তোভার নিকটবর্তী মনসুর দূর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সাক্ষ্যবাহী হয়েছিলাম। অবশেষে নিকরায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সন্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রু রা দু'জন অস্বাভাবিকভাবে আমার পশ্চাৎদ্বার করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার যত কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করেছিলাম। অস্বাভাবিক কাকিররা আমার সন্মুখ দিয়ে “লোকটি কোন দরজায় হবে”

বলন্ত বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেছে। বলা বাহুল্য তারা আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। (কুরতুবী)

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ كُنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي
صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
فَسَيُنْخِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ
يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(৪৯) তারা বলে : যখন আমরা জাহিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃষ্টি হয়ে উঠিত হবে? (৫০) বলুন : তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণার খুবই কঠিন, তথাপি তারা বলবে : আমাদেরকে পুনবার কে সৃষ্টি করবে? বলুন : যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাকবে এবং বলবে : এটা কবে হবে? বলুন : হবে, সম্ভবত শীঘ্রই। (৫২) যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিল।

তরসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলে : তখন আমরা (মৃত্যুর পর) অস্থি এবং (অস্থি থেকেও অতঃপর) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি (এরপর কিয়ামতে) নতুনভাবে সৃষ্টি ও জীবিত হবে? (অর্থাৎ প্রথমত মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াই কঠিন। কারণ দেহে জীবন-ধারণের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। এরপর দেহও যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন এর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টি কে মনে নিতে পারে)? আপনি (উত্তরে) বলে দিন : (তোমরা তো অস্থি জীবিত হওয়াকেই অসম্ভব মনে করছ, কিন্তু আমি বলি যে তাহলে) তোমরা পাথর কিংবা এমন ধরনের কোন বস্তু হয়ে দেখে নাও, যা তোমাদের মনে (জীবন-ধারণের উপযুক্ততা থেকে) অনেক দূরবর্তী। (এরপর দেখ যে, জীবিত হও কিনা। বলা বাহুল্য, পাথর ও লোহা জীবন থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণ এই যে, এদের

মধ্যে কোন সময়ই জৈব জীবন সঞ্চারিত হয়নি। অর্থাৎ এর বিপরীত। কারণ, এর মধ্যে পূর্বে জীবন ছিল। অতএব পাথর ও লোহাকে জীবিত করা যখন আল্লাহ্‌র জন্যে কঠিন নয়, তখন মানুষের অল্প-প্রত্যক্ষকে পুনর্বীর জীবন দান করা কিরূপে কঠিন হবে? আল্লাতে

أَوْفُوا شَرْطَ وَتَعْلِقُوا আদেশ সূচক পদ বলে - **شرط و تعلیق** বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি খরে নেওয়ার পর্যায়ে তোমরা পথের কিংবা চৌহাও হয়ে যাও, তবে একজাবহাও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পুনর্বীর জীবিত করতে সক্ষম। অতঃপর তারা জিজ্ঞাস করবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? আপনি বলে দিন: যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে দু'টি জিনিস আবশ্যিক। এক, উপকরণ ও পাত্র অস্তিত্ব লাভের যোগ্যতা। দুই, তাকে অস্তিত্ব দানকারী শক্তি। প্রথম প্রকারটি ছিল পাত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে। অর্থাৎ সূতর পর দেহ জীবন ধারণের যোগ্য থাকে না। এর উত্তর দিয়ে পাত্রের যোগ্যতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় প্রকারটি ছিল জীবন দানকারী শক্তি সম্পর্কে; অর্থাৎ কোন কর্তা যীর প্রকৃতির ব্যক্তি এই আশ্চর্যজনক কাজটি করবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যিনি প্রথমে তোমাদেরকে এমন উপকরণ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে জীবন ধারণের যোগ্যতা আছে বলে কারণও ধারণাও ছিল না। অতএব তার জন্যে পুনর্বীর সৃষ্টি করা কিরূপে কঠিন হবে? যখন পাত্র ও কর্তা সম্পর্কিত উত্তর প্রস্তর সমাধান হয়ে গেল, তখন পুনর্জীবনের ঘটনাটি কখন ঘটবে, তা জানার জন্যে) তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে সেড়ে বলাবে: (আমহা বলুন তো) এটা (অর্থাৎ জীবিত হওয়া) কবে হবে? আপনি বলে দিন, সম্ভবত এটা নিকটবর্তী। (অতঃপর এসব অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো নতুন জীবন লাভের সময় দেখা দেবে)। এটা এদিন ইং, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (জীবিত করা ও হাশরের মরদানে একত্রিত করার জন্যে ফেরেশতায় মাধ্যমে) ডাক দেবেন এবং তোমরা (বাধ্যতামূলকভাবে) তাঁর প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ জীবিত হয়ে হাশরের মরদানে একত্রিতও হয়ে যাবে)। এবং (এ দিনের উন্নতিতে দেখে তোমাদের অবস্থা হবে এই যে, দুনিয়ার গোটা বরস ও কবরে অবস্থানের সময় সম্পর্কে) তোমরা অনুমান করবে যে, খুব কম সময়ই (দুনিয়াতে) অবস্থান করেছে। (কেননা, আজকের উন্নয়নশীল তুলনায় দুনিয়া ও কবরে কিছু না কিছু সুখ ছিল। বলা বাহুল্য, বিপদে পড়ার পর সুখের সমান মানুষের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত মনে হয়)।

আমুখিক জাভাব বিবরণ

وَعَا ۞ شَرِطٌ ۞ عَو - ۞ م ۞ عَو ۞ لَمْ تَسْتَجِبْ لَهُ ۞ وَنَاصِيَةٌ ۞

টীকা: এর অর্থ আওরাজ দিয়ে ডাকা। আল্লাহের স্বর্গ এই যে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের মরদানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার নিজের সুক দেবেন, তখন সব যত জীবিত হয়ে

হাশমের মরদানে একত্রিত হবে। এ ছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশমের মরদানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর।—(কুরতুবী)

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না)।

হাশমের কাকিররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উদ্বিগ্ন হবে :

سُتَجَابَتْ - فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِ ۝
এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশমের মরদানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে।

بِحَمْدِ ۝ অর্থাৎ মরদানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মু'মিন ও কাকির সবাই এই অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহলে কাকিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উদ্বিগ্ন হবে। তফসীলবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেন : কাকিররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سَهَّاءُ نَكَ وَبِحَمْدِ ۝ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না—(কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাও গুণবচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোন কোন তফসীলবিদ একে বিশেষভাবে মু'মিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাকিরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে : يَا وَيْلَنَا مِّنْ بَعَثْنَا

مِنْ مَّرْقَدِنَا ۝ হায় আফসোস, কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উদ্বিগ্ন

করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে يَا خَسِرْتُنَا عَلَىٰ مَا قَرَّطْنَا فِي جَنبِ اللَّهِ ۝ হায় আফসোস, আমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরাট ভুলটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উত্তর তফসীরের মধ্যে কোন বৈধরীতি নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে ওঠবে। পরে কাকিরদেরকে মু'মিনদের কাছ থেকে পৃথক করে

দেওয়া হবে; যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে—^{٨٨ ٨٩}وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ أَيُّهَا

^{٨٩ ٩٠}الْمَجْرُمُونَ

অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাকিরদের মুখ

থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাফ্যাবলী উচ্চাঙ্গিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন: হাশরে পুনরুজ্জানের শুরু হাম্দ দ্বারা হবে। সবাই হাম্দ করতে করতে উত্তিত হবে এবং

সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হাম্দের মাধ্যমে হবে। যেমন বলা হয়েছে: ^{٩٠ ٩١}وَقُضِيَ بِهِمْ

^{٩١ ٩٢}بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ হাশরবাসীদের কর্মসমাপ্তি হক

অনুমোদিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَكُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ
إِنْ يَشَأْ يُرْحِمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُفُورًا ۝

(৫৩) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শরতান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শরতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের প্রতি রহম করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আশাব দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। (৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পরগণারকে কতক পরগণার উপর প্রেতত্ত্ব দান করেছি এবং লাউনকে সবুর দান করেছি।

সূরা কাহাফ

سورة الكهف

সূরা কাহ্‌ফ

মক্কার অবতীর্ণ : ১১০ আয়াত : ১২ রুকু

সূরা কাহ্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও কবীলত : মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদ আহমদে হযরত আবুদারদা থেকে একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করে, সে দাখিলের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবুদারদা থেকেই অপর একটি রেওয়ায়েতে এই বিষয়বস্ত সূরা কাহ্‌ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

মসনদে আহমদে হযরত সাহল ইবনে মু'আযের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পঠিত করে, তার জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে, তার জন্য জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের দিগ্‌জালো দেবে এবং বিনত জুম'আ থেকে এই জুম'আ পর্যন্ত তার সব গোনাহ মাক হয়ে যাবে।—(ইমাম ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলেছেন।)

হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী 'মুখতারাহ' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাখিল বের হয়, তবে সে তার ফিতনা থেকেও মুক্ত থাকবে।—(এসব রেওয়ায়েত ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত।)

সাহল-মা'আনীতে হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সূরা কাহ্‌ফ সম্পূর্ণ হুক এক সময়ে নাখিল হয়েছে এবং সত্ত্ব হাজার ফিরিশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর সাহায্য প্রকাশ পায়।

মক্কে মুহ্ব্ব : ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন : যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুয়তের চর্চা শুরু হয় এবং কোরাশ শরা ভাতে বিব্রত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হালিস ও ওকবা ইবনে আবী মুরীতকে মদীনায় ইহদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের পণ্ডিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে তারা কি বলে, একথা জানার জন্য এই প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়েছিল। ইহদী আলিমরা তাদেরকে বলে দেন যে, তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন কর। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নাও যে, তিনি

আল্লাহর রসূল। অন্যথায় বুঝতে হবে যে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী—রসূল নন। এক, তাঁকে এসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। দুই, তাঁকে সে রাজির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তাঁর ঘটনা কি? তিন, তাঁকে রাসূল সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি?

উত্তর কোরায়েশী মহান্নর ফিরে এসে ব্রাহ্মসমাজকে বলল : আমরা একটি চূড়ান্ত ফরাসিয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহসানী ভাষায় কবিতা গুনিয়ে দিল। কোরায়েশরা রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হল। তিনি শুনে বললেন : আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। কোরায়েশরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ (সা) ওহীর আলোকে জওয়াব দেবার জন্য ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পরদিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল না। বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন ওহীও নাযিল হল না। অবস্থাদুর্লভ কোরায়েশরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ (সা) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহ্‌ফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে ওহীর বিলম্বের কারণও বর্ণনা করে দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হুঁশিয়ার করার জন্য বিলম্ব ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে :

وَلَا تَقُولَنَّ لَهَا يَ اِنِّي نَاعِلٌ لِّكَ عَبْدًا وَّآخٍ ۚ اِنَّهَا سَمَاءٌ عَلٰٓى سُرُرٍ ۙ

যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে ‘আসহাবে কাহ্‌ফ’ বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী মলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাসূল সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবও।—(কুরতুবী, মাযহারী) কিন্তু রাসূল সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেওয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে আল্লাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেই সূরা কাহ্‌ফকে সূরা বনী ইসরাঈলের পরে স্থান দেওয়া হয়েছে।—(সূরুজী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰٓی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۙ
 قِیْمًا لِّیَنْذِرَ اَبَاسًا شَدِیْدًا ۚ مِّنْ لَّدُنْهُ وِیْسٌ ۚ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ
 یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اِنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۙ مَا كَثِیْرٌ فِیْهِ اَبَدًا ۙ

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا
 لِإِبْرَاهِيمَ كِبَرٌ ۚ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا
 كَذِبًا ۚ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا
 الْحَدِيثِ آسَفًا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا
 لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا
 جُرُزًا ۝

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বাস্তব প্রতি এ গ্রন্থে নাখিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্তৃতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদেরকে—যারা সংকর্ষ সম্পাদন করে—তাদেরকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে তিরস্কাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান রাখেন। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃগুরুদেরও নেই। অতঃপর তাদের মুখমিস্ত কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের গম্ভীরতা সম্ভবত আগনি পরিভ্রম করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীই সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছে, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উত্তমদৃশ্যে মূর্তিকার পরিণত করে দেব।

তকসীয়ের সার-সংক্ষেপ

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের (বিশেষ) স্বাক্ষর [মুহাম্মদ (সা)]-এর প্রতি এ গ্রন্থে নাখিল করেছেন এবং এতে (এ গ্রন্থে কোন প্রকার) সাহায্যও বক্তৃতা রাখেননি (শাস্তিকণ্ড নয় যে, অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী হবে এবং অর্থপতও নয় যে, এর কোন বিধান হিকমতের বিরুদ্ধে যাবে; বরং একে) সম্পূর্ণ সত্যিক হওয়ার গুণে গুণাবলিত করেছেন। (নাখিল এ জন্য করেছেন) যাতে তা (অর্থাৎ এ গ্রন্থ কারিকরদেরকে সাধারণভাবে) একটি ঘোর বিপদের—যা আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাদের উপর পরকালে) পতিত হবে—ভয় প্রদর্শন করে এবং বিশ্বাসীদেরকে—যারা সংকর্ষ সম্পাদন করে—সুসংবাদ

দান করে যে, তারা পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে এবং যাতে (কাফিরদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে) তাদেরকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শন করে যারা বলে : (নাউম্বিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান রাখেন। (সন্তানের বিশ্বাস গোষণকারী কাফিরদেরকে সাধারণ কাফির থেকে আলাদা করে বর্ণনা করার কারণ এই যে, এই ব্রাহ্ম বিশ্বাসে আরবের সাধারণ লোক—মুশরিক, ইহুদী ও খৃস্টান সবাই লিপ্ত ছিল।) এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষের কাছেও নেই। খুব গুরুতর কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়েছে। তারা যা বলে, তা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে। (এটা মুক্তির দিক দিয়েও অসম্ভব। কোন স্থলবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও এর প্রবৃত্তি হতে পারে না। আপনি তাদের কুফর ও অস্বীকারের কারণে এতটুকু দুঃখিত যে) যদি তারা এই (কোরআনী) বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সম্ভবত আপনি তাদের পশ্চাতে দুঃখ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন! (অর্থাৎ এতটুকু দুঃখ করবেন না যে, নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দেবেন। কারণ, এই বিশ্ব পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে ঈমান, কুফর এবং ভাল-মন্দের সমাবেশই থাকবে এরূপ হবে না যে, সবাই ঈমানদার হয়ে যাবে। এ পরীক্ষার জন্যেই) আমি পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহকে তার (পৃথিবীর) জন্য শোভা করছি, যাতে (এর মাধ্যমে) মানুষের পরীক্ষা নেই যে, কে তাদের মধ্যে ভাল কাজ করে। (অর্থাৎ এরূপ পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য যে, কে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে বিমুগ্ধ হয়ে যায় এবং কে হয় না। মোটকথা এই যে, এটা পরীক্ষা জগত। সৃষ্টিগতভাবে এখানে কেউ মু'মিন হবে এবং কেউ কাফির থাকবে। অতএব চিন্তা অনর্থক। আপনি নিজের কাজ করে যান এবং তাদের কুফরের ফল দুনিয়াতেই প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। কেননা, এটা আমার কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে হবে। সেমতে এমন একদিন আসবে যে,) আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে একটি খোলা ময়দান করে দেব। (তখন এখানে কোন বস্তুকারী থাকবে না এবং কোন বৃক্ষ, পাহাড়, দালান-কোঠা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। মোটকথা এই যে, আপনি প্রচার কাজ অব্যাহত রাখুন। অবিশ্বাসীদের কুপরিণামের জন্য এত দুঃখিত হবেন না।)

জানুহদিক জাভাব্য বিষয়

وَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ عِوَجًا قِيمًا

দিকে ঝুঁকে পড়া। কোরআন পাক শাসনিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র। অলংকার শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর কোন জায়গায় এতটুকু ত্রুটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে

না এবং জান ও প্রচার দিক দিয়েও নয়। وَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ عِوَجًا

ধনাঙ্ক আকারে বাস্তব হয়েছে, তাগিদে জন্য এ অর্থকেই  শব্দের মধ্যে ধনাঙ্ক

অন্ধারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেননা, قِيَمًا -এর অর্থ হচ্ছে مستقيماً (সঠিক)।

তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক না থাকে। এখানে **قیم** শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে; অর্থাৎ রক্ষক ও হিফায়তকারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার বক্রতা, ভুলটি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপরাধকেও সঠিক পথে রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হিফায়ত করে। এখন উভয় শব্দের সারসংক্ষেপ এই যে, কোরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ং সম্পূর্ণকারী।—
(মায়হারী)

وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرْبَنَا عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ فِي
الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجِزْبِينَ
أَخْضَىٰ لِمَا لَيْسُوا بِأَعْدَاءَ ۝

(৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, ওহা ও পণ্ডের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনা-
বলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের ওহা আর জাগ্রত গ্রহণ করে
তখন দোয়া করে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত
দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন
আমি কয়েক বছরের জন্য ওহা তাদের কানের উপর নিদ্রার পদা ফেলে দেই। (১২)
অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করি, একথা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন
দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ভর করতে পারে।

শব্দার্থ : فَاهْ-এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য ওহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে
বলা হয়। مَرْقُوم-এর শাস্তিক অর্থ বা লিখিত বস্তু। এখানে কি বোঝানো
হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীলবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আক্বা-
সের রেওয়াজেতে দু'শট যাহহাক, সুদী ও ইবনে যুবারের মতে এর অর্থ একটি লিখিত
ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্বের নাম লিপিবদ্ধ করে ওহা
প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্বকে রুকীমও বলা হয়।
কাতাদাহ, আতিয়া, আউফী ও মুজাহিদ বলেন : রুকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত
উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্বের ওহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই
রুকীম বলেছেন। হযরত ইকরামা বলেন : আমি ইবনে আক্বাসকে বলতে শুনেছি যে,
রুকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব
আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনায্বেহ্ হযরত ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রুকীম
রোমে অবস্থিত আয়লাহ্ অর্থাৎ, আক্বার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। فَاهْ

এর অর্থ বহুবচন। এর একবচন فَاهْ-এর অর্থ যুবক। فَاهْ-এর

শাস্তিক অর্থ কর্তৃক বহু বক্তব্য দেওয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়।
ফেননা, নিদ্রা সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়।
অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।
জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত
হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

তরসীয়ের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি এ ধারণা করেন যে, আসহাবে কাহ্ব ও আসহাবে রকীম (এ দু'টি একই দলের উপাধি) আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল? [যেমন ইহুদীরা বলেছিল যে, তাদের ঘটনা আশ্চর্যজনক অথবা স্বয়ং প্রয়কারী কোরআনশরীফ একে আশ্চর্যজনক মনে করে প্রস্তুত করেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্মোহন করে অন্য লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এ ঘটনাটি যদিও আশ্চর্যজনক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলায় অন্যান্য আশ্চর্য বস্তু মুকাবিলায় এতটুকু আশ্চর্যজনক নয়, যতটুকু তারা মনে করেছে। কেননা, যমীন, আসমান, চন্দ্র ও সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করাটা আসল আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কয়েকজন যুবকের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিম্নিত খাফা, অতঃপর আগ্রহ হওয়া তার মুকাবিলায় মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। এই ভূমিকায় পর আসহাবে কাহ্বের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:] এ সময়টি সন্ধ্যাযোগা, যখন যুবকরা (তৎকালীন বে-খীন বাদশাহের কবল থেকে পরায়ন করে) গুহার (যার কাহিনী পরে বর্ণিত হবে) আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর (আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করে যে,) তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের (এ) কাজকে সঠিক করুন। (সম্ভবত রহমত বলে উদ্দেশ্য সাধন এবং সঠিক করা বলে উদ্দেশ্য সাধনে জরুরী উপকরণাদি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের হিফাযত ও সক্ষম প্রকার পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায় এভাবে বর্ণনা করেন যে,) আমি গুহার কয়েক বছরের জন্য তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে (নিদ্রা থেকে) পুনরুজ্জীবিত করি (বাহ্যিকভাবেও) একথা জানায় অন্য যে, (গর্তে অবস্থানকাল সম্পর্কে মতভেদকারীদের মধ্য থেকে) কোন দল তাদের অবস্থানের সময় সম্পর্কে অধিক ভীত ছিল। (নিদ্রা থেকে আগ্রহ হওয়ার পর তাদের একদলের বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা পূর্ণ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়েছি। অপর দল বলল: আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, তোমরা কতদিন ঘুমিয়েছ। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে দ্বিতীয় দলই অধিক ভীত ছিল। তারা সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেয়। কারণ, এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না।)

জানুয়ারি কাতব্য বিষয়

আসহাবে কাহ্ব ও রকীমের কাহিনী: এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। এক, 'আসহাবে কাহ্ব' ও 'আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোন সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ব ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহার আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম

বুখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রুকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রুকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের ওহাযর আশ্রয়গণন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর ওহাযর মুখে পড়ে যাওয়ার ওহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংকাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কুপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ার পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ার আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ার রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাকিম ইবনে হাজার (রহ) বুখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রুকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাণায এতটুকু যে, ওহাযর ঘটনার বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বশীরের রেওয়াজেতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন : নো'মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সা)-কে রুকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি ওহাযর আবহ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো কতইল বাবীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়াজেতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত সিহাহ সিভা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়াজেতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো'মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাফা উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বুখারীর রেওয়াজেতেও এই বাফা থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত এই বাফাও এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসুলুল্লাহ (সা) ওহাযর আবহ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রুকীম বলেছিলেন। বরং বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) রুকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রুকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেরী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রসুলুল্লাহ (সা) থেকে রুকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসুলুল্লাহ (সা) কোন অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেরী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেবেন—এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বুখারীর টীকাকার হাকিম ইবনে হাজার আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রুকীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রুকীমের আলোচনার সাথে সাথে ওহাযর আবহ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রুকীম ছিল।

এছাড়া হাকিম ইবনে হাজার একথাও প্রকাশ করেছেন যে, আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে কোরআনের পূর্বাঙ্গর বর্ণনা স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন যে, আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রুকীম একই দল। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাঁরা একই দল।

দ্বিতীয় আলোচনা বিষয় হচ্ছে স্বয়ং এ কাহিনীর বিবরণ। এর দু'টি অংশ আছে। এক, এ কাহিনীর প্রাণ ও আসল উদ্দেশ্য, যম্মান্না ইহাদীদের প্রবন্ধ জওলাব হয়ে যায়

এবং মুসলমানদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ। দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক শুধু এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকার সাথে। আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। উদাহরণত ঘটনাটি-কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয় যে, কাফির বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্বারূপে তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল যুগ্ম অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন?

কোরআন পাক স্বীয় বিভাজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসূফ-কাহিনী ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক প্রত্নাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেনি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশ স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছে, যা মানবীয় হিদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। (ইউসূফ-কাহিনীকে এ পদ্ধতির বাইরে রাখার কারণ সূরা ইউসূফের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।)

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন বর্ণিত অংশগুলোর এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ নিয়ে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ও যুগের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অওয়ালের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ আত্মীয় প্রসঙ্গে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহর উপদ্রষ্ট হেতু দেওয়া উচিত।

কোরআনের শিক্ষা বর্ণনা করা রসূলুলাহ (সা)-এর অভীষ্ট কর্তব্য ছিল। উপরোক্ত কারণে তিনিও কাহিনীর এসব অংশ বর্ণনা করেননি। প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেরীগণ কোরআনী বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ীই এ ধরনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন: **لَمْ يَكُنْ لَنَا فِيهِ حُكْمٌ** অর্থাৎ, যেসব বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গুলি রেখেছেন, সেগুলোকে তোমরাও অঙ্গুলি থাকতে দাও। (কারণ এতে আলোচনা ও গবেষণা উপকারী নয়।) — (ইতকান, সুন্নতী)

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেরীগণের এই কর্মপন্থার ভাগিদ অনুযায়ী এই তফসীরেও কাহিনীর এসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্বস্বত্ব কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে উল্লিখিত আছে, সেগুলো তো আল্লাহের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার

পন্নও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলাম ও খ্রিস্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইমিউনের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্য জন এমনভাবে অন্য দিককে অগ্রাধিকার দান করেন।

দীনের হিজাবতের জন্য ওহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে : ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খ্রিস্ট-ধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের ঘটনাবলী এত বেশি সংঘটিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যাক লোক আল্লাহর ইবাদতের জন্য ওহায় আশ্রয় গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্নকের খাওয়া হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্নকের স্থান ও কাল : তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এখানে কিছু শ্রুতি ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহহাকের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রুকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি ওহায় একশ জন লোক শায়িত আছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে আতিয়া খেফে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি ওহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার পাওয়া বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্নক। ওহায় নিকটে একটি মসজিদ ও একটি গৃহও নির্মিত আছে : একে রুকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস পার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়া বলেন : পার্নাতার 'লাওয়া' নামক গ্রামের অদূরে একটি ওহা আছে। একে রুকীম বলা হয়। এই ওহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি কঙ্কাল এবং কিছু সংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী অতিক্রম হয়েছে, কিন্তু বিসৃষ্ট উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। কিছুসংখ্যক লোক বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্নক। ইবনে আতিয়া বলেন : এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো ভেঁমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রুকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা বিরাট রাজপ্রাসাদ ছিল। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জগলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন : পার্নাতার উপরিতাপে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের মিদর্শন। শহরের নাম 'লাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং ফব্বর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী

এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহ্ফ বলতে অগ্রসৃত। ইবনে আতিয়াও চাকুয দেখা সত্ত্বেও দৃষ্টান্ত সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্রুতি বর্ণনা করেছেন মাত্র। অপর একজন আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়ান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতার জগপ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহরে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গ কুরতুবীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়ান চাকুয দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন : আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ কান্নরোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখার জন্য গমন করত। তাঁরা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তাঁরা সংখ্যা বর্ণনায় ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন : ইবনে আতিয়া যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহবার গিয়েছি এবং তাতে বিনাট বিনাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়ান লিখেছেন :

ويترجم كون أهل الكهف بالاندلس لكثرة دين النصارى بها
حتى هي بلاد ملكتهم العظمى .

অর্থাৎ যে কারণে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খৃস্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র। এ থেকে পরিকার বোঝা যায় যে, আবু হাইয়ানের মতে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য।—(তফসীর কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আউফীর জেওয়ান্নেতে হযরত ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রুকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তিনের পাদদেশে অয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রুকীম কি, আমার জানা নেই, কিন্তু কা'ব আহবানকে জিত্তেস করলে তিনি বলেন যে, রুকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহ্ফ গুহার আলয় গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।—(মুহল-আ'আনী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আক্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে রোমীয়দের মুকাবেলায় একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'শায়ওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভিতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যেক করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আক্বাস বাধা দিয়ে বললেন : এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রসুলুজাহ্ (সা)-কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যেক করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেছেন :

أَرْبَابَهُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ لَآتِيَهُمْ فِرَارًا وَكُلْتُمْ مِنْهُمْ رِجَابًا

আগনি ভাদেয়কে দেখলে পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু হয়রত মুয়াবিরা ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবত এ কারণে যে, কোরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হয়রত মুয়াবিরা কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। তারা ওহায় পৌঁছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে ভাদেয়কে ওহা থেকে বের করে দিল।—(রুহুল-মা'আনী ৫ম খণ্ড, ২২৭)

তকসীরবিদদের উল্লিখিত রেওয়াজেত ও উজ্জি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্‌কের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। এক. পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবান (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হয়রত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়াজেত এরই সমর্থন করে।

দুই. ইবনে আভিয়্যার দেখা ও আবু হাইয়্যামের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই ওহাটি গার্নাতা আন্দালুসে অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবান একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রুকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনভাবে গার্নাতার ওহা সংলগ্ন বিরাট ডগ প্রাচীরের নাম রুকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়াজেতের মধ্যে কেউই এরূপ অকাটা ফলসামা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্‌কের ওহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়াজেত স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর ভিত্তিপর।

তিন. কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তকসীর গ্রন্থের রেওয়াজেতে আসহাবে কাহ্‌ক যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসুস' এবং ইসলামী নাম 'তরসুস' বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ ওহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিত্ত্ব এবং বাকীগুলোকে স্রাস্ত বলায় কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব ওহার ঘটনাবলী নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌কের ওহা নাও হতে পারে এবং সে ওহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রুকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে, বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রুকীম এ ফলকের নাম, যার সূক্ষ্ম কোন বাদশাহ আসহাবে কাহ্‌কের নাম খোদিত করে ওহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলিম খুস্তান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্‌কের ওহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

যাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্টাকে প্রাচীন শহর রুকীয সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বান্না'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে 'রুকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইস্রায়েলের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রুকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে স্বেচ্ছা আপত্তি করেছেন যে, পাট্টা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লো পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড ৬৫৮ পৃঃ)

অধিকাংশ তরুসীয়েবিদ 'আফসুস' নগরীকে আসহাবে কাহকের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত স্কায়ামদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরকের ইজমীর (স্মার্টা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত যওলানা সৈয়দ সুলারমান নদভীও 'আব্দুল কোরআন' গ্রন্থে পাট্টা শহরের নাম উল্লেখ করে বক্তব্যে ভেতরে রুকীয লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্টা শহরের পুরোনো নাম রুকীয ছিল। যওলানা হিকমুর রহমান 'কাসাসুল কোরআনে' একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তাওরাত ও 'সহীফা সুইয়ার' বলাত দিয়ে পাট্টা শহরের নাম রাকেম বর্ণনা করেছেন।—(দারুল্লাতুল মাআরিক, আব্দাব থেকে প্রস্তুত)

জর্দানে আশ্মানের নিকটবর্তী এক শ্মশানভূমিতে একটি গুহার সম্মান পাওয়া গেলে সন্ধানকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রুকীয এবং এর পাশে আসহাবে কাহকের এই গুহা।

হাকীমুল উলুমত হযরত খানভী (রহ) বয়ানুল-কোরআনে তরুসীয়ে হক্কানীর বলাত দিয়ে আসহাবে কাহকের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন : যে অন্ত্য-চরী বাদশাহর ভয়ে পারিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহক গুহার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রিস্টাব্দ। এরপর তিন শ বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। কলে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসুলুল্লাহ (সা) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্মের ২০ বছর পূর্ব আসহাবে কাহক নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তরুসীয়ে-হক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসুস' অথবা 'তরুতুস'

শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ
বিদ্যমান রয়েছে। **والله اعلم بحقيقة الحال**

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, প্রাচীন তফসীলবিদগণের স্লেওয়ারেত ও
আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরম্ভ করেছিলাম
যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে
কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়।
স্লেওয়ারেত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইমিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং
অধ্যবসায়ের পরও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সলা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ত মহলে
ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিস্ফুট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য
এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ
ঘটনাটি হয়রত ইসা (আ)-এর পর এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র যমানার কাছাকাছি সময়ে
সংঘটিত হয়। অধিকাংশ স্লেওয়ারেত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস
অথবা ভয়ভীতি শহরের নিকটে ঘটেছে। **والله اعلم** সত্য এই যে, এসব গবেষণার
পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে স্লেওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান
নির্ধারণের না কোন প্রয়োজন আছে এবং না কোন নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব;
তফসীলবিদ ইবনে-কাসীর এ কথাই বলেছেন :

**قد أخبرنا الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتذبره ولم
يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إلا قائدة لنا
فيه ولا قصد شرعى -**

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহফের কোরআনে বর্ণিত অবস্থা-
সমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ
বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, ওহাটি কোন্ জায়গায় এবং কোন্ শহরে অবস্থিত। কারণ,
এর মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত নেই এবং শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যও এর সাথে
সম্পর্কযুক্ত নয়—(ইবনে-কাসীর, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ)

আসহাবে কাহফের ঘটনা কখন ঘটে এবং ওহার জায়েজ নেয়ার কারণ কি ছিল?
কাহিনীর এ অংশের উপরও কোরআনের কোন আয়াত বোঝা মওকুফ নয় এবং কাহিনীর
উদ্দেশ্যের উপরও এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে
কোন বর্ণনা নেই। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বর্ণনাই একমাত্র সম্ভব। এ কারণেই আবু
হাইয়ান তফসীল বাহরে-যুহীতে বলেন :

**والرواة مختلفون في قصصهم وكيف كان اجتماعهم وخروجهم
ولم يأت في العدد إلا لمصحيح كيفية ذلك ولا في القرآن**

তাদের কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। এ ব্যাপারেও মতানৈক্য আছে যে, তারা কিভাবে সর্বসম্মত কর্মপন্থা গ্রহণ করল এবং কিভাবে বের হল? কোন সহীহ হাদীসে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়নি এবং কোরআনেও না।—(বাহ্লে-মুহীত মত খণ্ড, ১০১ পৃঃ)

সবাস্তব কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য উপরে যেমন আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তেমনি তাদের কাল এবং ঘটনার কারণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্য তরুসীর ও ঐতিহাসিক রেওয়াজে থেকে নিগিষক করা হচ্ছে, কানী সানাতুন্নাহ্ পানিপথী (রহ) তরুসীর মামহারীতে এ কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন রেওয়াজে থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে শুধু ঐ সংক্ষিপ্ত ঘটনাই লেখা হচ্ছে, যা ইবনে-কাসীর অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তরুসীরবিদদের বরাতে দিয়ে গেল করেছেন। তিনি বলেন :

আসহাবে কাহ্ফ রাজ বংশের সন্তান এবং কওমের সরদার ছিলেন। কওম মূর্তি-পূজারি ছিল। শহরের বাইরে তাদের একটি বার্ষিক মেলা বসত। সেখানে তারা প্রতিমা পূজা করত এবং জন্তু-জানোয়ার কোরবানি দিত। দাকিল্লানুস নামে তাদের একজন অভ্যাচারী বাদশাহ্ ছিল। সে কওমকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করত। একবার যখন সমগ্র জাতি মেলায় সমবেত হল, তখন আসহাবে কাহ্ফের যুবকরাও সেখানে উপস্থিত হল। তারা কওমকে নিজেদের গড়া মূর্তিকে খোদা মনে করতে, তাদের ইবাদত করতে এবং তাদের জন্য কোরবানী করতে দেখল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করলেন। ফলে কওমের নির্বোধসুলভ কাণ্ডকারখানার প্রতি তাদের ঘৃণা দেখা দিল। তারা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বুঝে ফেললেন যে, এই ইবাদত একমাত্র সে সত্যের জন্য হওয়া উচিত, যিনি আসমান, স্বামী ও সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন। এই ধারণা একই সময়ে যুবকদের মনে জাগ্রত হল এবং তাদের প্রত্যেকেই কওমের নির্বোধসুলভ ইবাদত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম একজন যুবক সমাবেশ থেকে দূরে একটি বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসে পড়ল। এরপর দ্বিতীয় একজন এল এবং সেও সে বৃক্ষের নিচে বসে পড়ল। এমনভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আসতে লাগল এবং বৃক্ষের নিচে বসতে লাগল। কিন্তু তাদের একজন অপরাধ-জনকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যও জানত না। প্রকৃতগত্রে তাদেরকে এখানে সে শক্তি একত্রিত করেছিল, যা তাদের অন্তরে ইমান সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয়তা সংঘবদ্ধতার আসল ভিত্তি : এই বর্ণনার পর ইবনে-কাসীর বলেন : মানুষ জাতীয়তাবাদকে পারস্পরিক সংঘবদ্ধতার কারণ মনে করে। কিন্তু প্রকৃত সত্য সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐক্য ও অনৈক্য প্রথমে আত্মসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এর প্রতিক্রিয়া এ জগতের দেহে প্রতিফলিত হয়। আদিকালে যেসব আত্মার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য পরদা হয়েছে, তারা এ জগতেও পরস্পরে প্রীতি ও এক দলে পরিণত হয় এবং যাদের মধ্যে এই-সম্প্রীতি ও পারস্পরিক ঐক্য না থাকে, বরং সেখানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যে এখানেও বিচ্ছিন্নতা থাকবে। আলোচ্য

ঘটনাই এর দৃষ্টান্ত। কিভাবে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এ ধারণাই তাদের সবাইকে অজান্তে এক জায়গায় একত্র করে দিয়েছে।

মোটকথা, তারা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে গেলেও প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাসকে অগ্নের কাছ থেকে গোপন করছিল। কারণ, সে যদি বাদশাহর কানে খবর পৌঁছে দেয়, তবে আর রক্ষা নেই—প্রেক্ষতার হতে হবে। কিছুকণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক ব্যক্তি বলল : ভাই, আমরা সবাই যে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে পৌঁছেছি এর কোন কারণ তো অবশ্যই আছে। কাজেই আমাদের একে অগ্নের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যাওয়াই সমীচীন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল : সত্য বলতে কি, আমি আমার কওমকে যে ধর্ম ও যে ইবাদতে লিপ্ত পেয়েছি, আমার বিশ্বাস, তা সম্পূর্ণ বাতিল। ইবাদত তো একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই হওয়া উচিত, জগত সৃষ্টিতে যার কোন অংশীদার নেই। একথা শুনে অন্যরাও সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকেই স্বীকার করল যে, এ বিশ্বাসই তাদেরকে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে পৌঁছে দিয়েছে।

এখানে এই সমমনা দলটি একে অগ্নের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে গেল। তারা পৃথকভাবে নিজেদের একটি উপাসনার নির্মাণ কল্পন এবং একত্রিত হয়ে তারা আল্লাহ্‌ তা'আলাই ইবাদত করতে লাগল।

কিন্তু আন্তে আন্তে তাদের কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং ঙ্গতচররা তাদের সংবাদ বাদশাহর কানে পৌঁছে দিল। বাদশাহ তাদেরকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে তারা দরবারে হাজির হল। বাদশাহ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও তরীকা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সাহস দান করলেন। তারা নির্ভয়ে তওহীদে বিশ্বাস ব্যক্ত করে দিল এবং স্বয়ং বাদশাহকেও এর প্রতি দাওয়াত দিল। কোরআনের আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

لَنْ نَدْعُو مِن دُونِهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا -

আমি তাদের চিত্তকে মৃৎ করে দিলাম, তারা যখন উত্তীর্ণ হলো। অতঃপর তারা বলল : আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনও তাঁর পরিকর্তে অন্য কোন উপাসাকে আহ্বান করব না। করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে।

তারা যখন নির্ভয়ে বাদশাহকে ইমানের দাওয়াত দিল, তখন বাদশাহ অস্বীকার করল এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করল। অতঃপর তাদের সেহ থেকে রাজপুত্রের আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক খুলে নিল। বাদশাহ তাদেরকে চিন্তা-ভাবনার জন্য কিছু দিনের সময় দিয়ে বলল : তোমরা যুবক। আমি তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি হত্যা করতে চাই না। এখনও যদি তোমরা স্বজাতির ধর্মে ফিরে আস, তবে তোমাদের মর্যাদা পুনর্বহাল করে দেওয়া হবে, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।

মু'মিন বাস্লামদের উপর এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী ও কৃপা। এ অবকাশ তাদের জন্য পলায়নের পথ খুলে দিল। তারা সেখান থেকে পলায়ন করে শুহায় আশ্বেগোপন করল।

তুফসীরবিদদের সাধারণ র্লেওয়ালেত মতে তারা খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। ইবনে-কসীর ও অন্যান্য তুফসীরবিদ একথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে-কসীর এ যুক্তির ভিত্তিতে এর সাথে একমত হননি যে, তারা খৃষ্টধর্মের অনুসারী হলে মদীনার ইহুদীরা তাদের প্রতি শত্রুতা বশত তাদের ঘটনা সম্পর্কে প্রর করত না এবং তাদের কোন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু এটা এমন কোন ভিত্তিই নয় যার কারণে সবগুলো র্লেওয়ালেত নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে। মদীনার ইহুদীরা শুধু একটি আশ্চর্য ঘটনা হওয়ার কারণেই এ সম্পর্কে প্রর করেছিল; যেমন মূলকারনাইন সম্পর্কিত প্ররও এ কারণেই ছিল। এ ধরনের প্রর খৃষ্টত্ব ও ইহুদীত্বের সাম্প্রদায়িকতা মাঝখানে না আসাই সুস্পষ্ট।

তুফসীর মাযহাবীতে ইবনে ইসহাকের র্লেওয়ালেত দৃষ্টে তাদেরকে একত্ববাদী গণ্য করা হয়েছে। খৃষ্টধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর ওনাঙনতি যে করেকজন সভাপতী জীবিত ছিল, তারা তাদেরই অন্যতম ছিল। তারা বিশুদ্ধ খৃষ্টধর্ম এবং একত্ববাদে বিশ্বাস করত। ইবনে ইসহাকের র্লেওয়ালেতেও অত্যাচারী বাদশাহ্ নাম দাকিয়ানুস উল্লেখ করা হয়েছে এবং শুহায় আশ্বেগোপনের পূর্বে যুবকরা যে শহরে বাস করত, তার নাম আকসুস বলা হয়েছে।

হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে আকাসের র্লেওয়ালেতেও ঘটনাটি এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাদশাহ্ নাম দাকিয়ানুস বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাকের র্লেওয়ালেতে আলও বর্ণিত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের আগ্রত হওয়ার সময় দেশের উপর বেসব খৃষ্টধর্মের অনুসারী লোকের আধিপত্য কামেম ছিল, তাদের বাদশাহ্ নাম ছিল বায়দুসীস।

সব র্লেওয়ালেতদৃষ্টে প্রবল ধারণার পর্যায়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, আসহাবে কাহ্ফ খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের সময়কাল খৃষ্টজন্মের পর এবং যে মুশরিক বাদশাহ্ কাহ্ফ থেকে তারা পলায়ন করেছিল, তার নাম ছিল দাকিয়ানুস। তিন শত নয় বছর পন্ত আগ্রত হওয়ার সময় যে ঈমানদার ন্যায়পন্থায়ণ বাদশাহ্ রাজত্ব ছিল, ইবনে ইসহাকের র্লেওয়ালেতে তার নাম 'বায়দুসীস' বলা হয়েছে। এর সাথে বর্তমান যুগের ইতিহাস মিলিয়ে দেখলে আনুমানিকভাবে তাদের সময়কাল নির্দিষ্ট হতে পারে। এর বেশি নির্ণয়ের প্রয়োজনও নেই এবং এত উপায়ও নেই।

আসহাবে কাহ্ফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তুফসীর মাযহাবীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত র্লেওয়ালেত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের আগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্ফ বাদশাহ্ কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহ্ জন্য দোয়া করে। বাদশাহ্ উপস্থিতিতেই তারা নিজদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নিশ্চিন্ত রেওয়াজেতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন :

قَالَ قَتَادَةُ فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَمَرُوا بِكَهْفٍ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَرَأَوْا فِيهِ عِظَامًا نَقَالُ قَائِلُ هَذِهِ عِظَامُ أَهْلِ الْكَهْفِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَقْدُ بَلِيَّتِ عِظَامِهِمْ مِنْ أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ سَنَةٍ .

কাতাদাহ বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহা ক্রয় করে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল : এগুলো আসহাবে কাহ্‌ফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন : তাদের হাড়তো তিনশ বছর পূর্বে মৃত্যিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতদুশ্চেট এসব বিষয়ের কোন অকাটা ফরসালো করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কোরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের নিম্নে উল্লেখ করা হবে।

এ পর্যন্ত কোরআন পাক সংক্ষেপে কাহিনী উল্লেখ করেছে। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۖ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
إِذَا شَطَطًا ۖ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَوْ لَمْ
يَأْتُوا عَلَيْهِمْ بِسَاطِنٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا ۖ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَابْعُدُونِ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى
الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ
أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝

(১৩) আপনান্ন কাহে তাদের ইতিহাসে সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সংগে চমক শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৪) আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল : আমাদের পালনকর্তা আসমান ও মর্যাদার পালনকর্তা, আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাসকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৫) এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহ্গার আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হয়ে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহার আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনান্ন কাহে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। (এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর বিপরীতে যা কিছু দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা সঠিক নয়।) তারা (আসহাবে কাহ্ফ) ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি (সে যুগের খৃস্টধর্ম অনুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের হিদায়েতে আরও উন্নতি দান করেছিলাম (অর্থাৎ ঈমানের গুণাবলী, দৃঢ়তা, বিপদাপদে সবর, সংসার বিমুখতা, পন্থাকালের চিন্তা ইত্যাদিও দান করেছিলাম। ঈমানের গুণাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে,) আমি তাদের চিত্ত মজবুত করেছিলাম যখন তারা দৃঢ় হয়ে (পন্থাপনে কিংবা বিরুদ্ধবাদী বাদশাহর সামনা সামনি) বলতে লাগল : আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাসকের ইবাদত করব না। (কেননা, খোদা না করুন, যদি এরূপ করি) তাহলে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। এরা আমাদেরই স্বজাতি, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। (কেননা তাদের কণ্ঠ ও সমসাময়িক বাদশাহ্ সবাই মূর্তিপূজারি ছিল।) অতএব তারা স্বীয় (উপাস্য হওরা) সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? (যেমন একত্ববাদীরা একত্ববাদ সম্পর্কে প্রকাশ্য ও নিশ্চিত প্রমাণের অধিকারী।) তার চাইতে অধিক দুর্বল আর কে হবে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রচনা করে (যে তাঁর কিছুসংখ্যক সমতুল্য ও অংশীদারও রয়েছে)? এবং (তারা পন্থাপনে বলল :) তোমরা যখন তাদের থেকে (বিশ্বাসেই) পৃথক হয়েছ এবং তাদের উপাসাদের (ইবাদত) থেকেও (পৃথক হয়ে গেছ) কিন্তু আল্লাহ্ থেকে (পৃথক হয়নি, বরং তাঁর কারণে সবকিছু ভাগ করেছে) তখন (সমীচীন এই যে,) তোমরা (অমূলক) গুহার (যা পরামর্শক্রমে স্থির হয়ে থাকবে) আশ্রয় গ্রহণ কর (যাতে নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে আল্লাহর ইবাদত করতে পারো)। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি স্বীয় রহমত বিস্তার করবেন এবং তোমাদের

কাজকর্মে সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করে দেবেন। (আল্লাহর কাহ্ থেকে এই আশা নিয়ে) ওহাব যাওয়ার সময় তারা সর্বপ্রথম এই দোয়া করে :

رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحِمَةً وَهَيَّا لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

আনুমানিক জাতিব্য বিবরণ

فَلْيُتْلَ—এর বহুবচন ফُلْيُ অর্থ শ্রবক। তফসীরবিদগণ লিখেছেন,

এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হিদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। যুদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে লেগে পড়ে বসে যে, মৃত্যুই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুস্কাহ হয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন শ্রবক।—(ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়ামন)

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ—ইবনে-কাসীরের বরাতে গিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা

হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন মর্তিপঞ্জারি অভ্যাচারী বাসশাহ শ্রবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসা-বাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশংকা সবেও আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহাবত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মুকাবিলার হত্যা, বৃত্তা ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিকারভাবে স্বীয় ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করে না—ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহর জন্য কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَأَوَّاهٌ إِلَى الْكَهْفِ—ইবনে-কাসীর বলেন : আসহাবে কাহ্‌কের

অবস্থাপিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে ওহাব আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পরামর্শের সূত্র। তাঁরা একাগ্র হীন থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহর ইবাদত হতে পারে।

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فُجُوءٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ

مِنْ آيَةِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ
 لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝ وَتَحْسَبُهُمْ آيَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ
 الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ
 عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلَمَّتْ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝

(୧୭) ତୁମି ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଦେଖିବେ ଯଦ୍ୟତ୍ ଉଦିତ ହୁଅ, ତାହାର ଗହା ଥେକେ ମାତ୍ର କେଟି ତାନନିକେ
 ତଳେ ଯାଉ ଏବଂ ଯଦ୍ୟତ୍ ଅନ୍ତ ଯାଉ, ତାହାର ଥେକେ ମାତ୍ର କେଟି ବାୟନିକେ ତଳେ ଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାରା
 ଗହାର ପ୍ରସନ୍ନ ଚକ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏଠି ଆଜ୍ଞାହର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନାବଳୀର ଅନ୍ୟତମ । ଆଜ୍ଞାହ ଯାକେ
 ସଂପନ୍ନେ ଚାଲାନ ସେ-ହି ସଂପନ୍ନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ତିନି ଯାକେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଟି କରନ୍ତି, ଆମି କଦ୍ୟତ୍ ତାର
 ଜନା ମଧ୍ୟସ୍ଥନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପାବେନ ନା । (୧୮) ତୁମି ଯଦ୍ୟତ୍ କରବେ ତାରା ଗହାର, ଅର୍ଥାତ୍
 ତାରା ନିସ୍ଥିତ । ଆମି ତାହାଙ୍କେ ମାତ୍ର ମରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ତାନନିକେ ଓ ବାୟନିକେ । ତାହାର
 କୁକୁର ହିଲ୍ ସାମନେ ନା ଦୃଷ୍ଟି ଗହାହାରେ ପ୍ରସାରିତ କରେ । ଯଦି ତୁମି ଓଁକି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାଙ୍କେ
 ଦେଖିବେ, ତଦ୍ବେ ମେହନ କିନ୍ତୁ ମଜାମାନ କରାତ୍ ଏବଂ ତାହାର ତଳେ ଗାତଂକରଣ ହୁଅ ମଡ଼ୁତେ ।

ତତ୍ତ୍ୱଗୀତାର ମାର-ସଂକ୍ଷେପ

ଏବଂ (ହେ ସାମୋଦିତ ବାକି, ଗହାଟି ଏମନ୍ତାବେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେ,) ଯଦ୍ୟତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଅ,
 ତଦ୍ୟତ୍ ତୁମି ତାଙ୍କେ ଦେଖିବେ ଯେ, ଗହାର ତାନନିକେ ମାତ୍ର କେଟି ଯାଉ (ଅର୍ଥାତ୍ ଗହାର ପ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ
 ଥେକେ ତାନନିକେ ମୁଖକ ଥାକେ) ଏବଂ ଯଦ୍ୟତ୍ ଅନ୍ତ ଯାଉ, ତଦ୍ୟତ୍ (ଗହାର) ବାୟନିକେ ମାତ୍ର
 ଥାକେ (ଅର୍ଥାତ୍ ତଦ୍ୟତ୍ ଗହାର ଅନ୍ତାନ୍ତରେ ଗୋଟି ପ୍ରସେନ କରନ୍ତି ନା, ଯାତେ ତାରା ଗୋଟିର ଗହାତାପେ
 କଣ୍ଠ ନା ମାତ୍ର) ଏବଂ ତାରା ଗହାର ଏକଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଚକ୍ରେ ହିଲ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାତୀୟ ଗହାର
 ଗହାବତ୍ତ୍ୱେ କୋଥା ଓ ଅଗ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ କୋଥା ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ଥାକେ । ତାରା ଗହାର ଏମନ୍ତ ଚକ୍ରେ
 ହିଲ୍, ଯା ପ୍ରସନ୍ନ, ଯାତେ ବାତାସ ମୋହେ ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣେ ଯଦ୍ୟତ୍ ଅସ୍ଥିରତା ନା
 ଆସେ ।) ଏଠି ଆଜ୍ଞାହ ତା'ଆଜ୍ଞାର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ (ଯେ, ବାହାକ କାରଣମାନଙ୍କ ବିମୁକ୍ତିତେ
 ତାହାର ଜନା ଆଜ୍ଞାହର ବାବଦା କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ।) ସୁଦ୍ଧାଂ ଜାନା ମେଲ ଯେ,) ଯାକେ ଆଜ୍ଞାହ
 ସଂପନ୍ନେ ଚାଲାନ, ସେହି ସଂପନ୍ନ ମାତ୍ର ଏବଂ ଯାକେ ତିନି ମଧ୍ୟସ୍ଥଟି କରନ୍ତି ଆମି ତାର ଜନା
 କେନ ମଧ୍ୟସ୍ଥନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପାବେନ ନା । (ଗହାର ଯେ ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହୁଅନ୍ତେ ତା
 ହେଉ, ଏହି ଯେ, ଗାତେ ମକାଲେ ମୁଖାଦିଗର ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ପ୍ରସେନ କରନ୍ତି ନା ଏବଂ
 ବିକାଲେ ମୁଖାଦିଗର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସେନ କରନ୍ତି ନା । ଏଠି ତଦ୍ୟତ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦ୍ୟତ୍ ଗହାର ଉଦ୍ଭବମୁଖୀ ଅଥବା
 ମୁଖାଦିଗମୁଖୀ ହୁଅ । କେନନ, ଆଜ୍ଞାହେ ଯେ ତାନନିକ ବାୟନିକ ବଦା ହୁଅନ୍ତେ, ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି
 ଗହାର ପ୍ରସେନକାରୀର ତାନନିକ-ବାୟନିକ ହୁଅ, ତଦ୍ବେ ଗହାଟି ଉଦ୍ଭବମୁଖୀ । ମକାଲେ ଯଦି ଗହାର
 ଥେକେ ନିର୍ଗମନକାରୀର ତାନନିକ-ବାୟନିକ ଅର୍ଥ ହୁଅ, ତଦ୍ବେ ଗହାଟି ମୁଖାଦିଗମୁଖୀ ହୁଅ ।) ଏବଂ

(হে সন্ধ্যাধিত ব্যক্তি, তারা যখন গুহার পেল এবং আমি তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলাম, তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তবে) তুমি তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। (কেননা, আল্লাহর শক্তি তাদেরকে নিদ্রার লক্ষণাদি থেকে মুক্ত রেখেছিল, যেমন ঘাস-প্রধানের পরিবর্তন, দেহ তিলে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চক্ষু বন্ধ হলেও তা নিদ্রার নিশ্চিত আলামত নয়) এবং (নিদ্রার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি তাদেরকে (কোন সময়) ডানদিক এবং (কোন সময়) বামদিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম (এবং এমনভাবে) তাদের কুকুর (যেটি কোন কারণে তাদের সাথে এসে গিয়েছিল, গুহার) প্রবেশদ্বারে সাযনের পা দু'টি প্রসারিত করে (বসা) ছিল। (তাদের আল্লাহ প্রদত্ত ভয়ভীতির অবস্থা ছিল এই যে,) যদি (হে সন্ধ্যাধিত ব্যক্তি) তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে তুমি আতঙ্কিত হয়ে পড়তে। [এ আল্লাতে সাধারণ লোকদেরকে সন্ধ্যাধন করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (সা)-এর ভীত-সন্তুষ্ট হওয়া জরুরী নয়। এসব ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা তাদের হিকমতের জন্য করেছিলেন। কেননা, জাগ্রত ব্যক্তিকে হামলা করা সহজ হয় না। দীর্ঘ সময়ের নিদ্রার পার্শ্ব পরিবর্তন মা করলে এক পার্শ্বকে মাটি থেকে ফেলত। গুহার প্রবেশপথে কুকুর বসে থাকে যে হিকমতের ব্যবস্থা, তা বলই বাহ্যিক।]

আনুমানিক জাতক বিবরণ

আলোচ্য আল্লাতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কহফের তিনটি আশ্চর্যজনক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসাবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

এক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রার অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকে সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আল্লাতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিদ্রাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল। দেহের উপর রোদ না পড়ায় তাদের দেহ ও পোশাকের হিকমতও হস্তিগ।

তাদের উপর রোদ না পড়া গুহার বিশেষ অবস্থানের কারণেও হতে পারে, যেমন গুহার প্রবেশপথ উত্তর কিংবা দক্ষিণে এমনভাবে ছিল যে, রোদ সম্ভাব্যতাই ভেতরে প্রবেশ করত না। ইবনে কুতায়বা-এর বিশেষ অবস্থানস্থল নির্ণয়ের জন্য এরূপ কণ্ট দীক্ষার করেছেন যে, অংকশাস্ত্রের মূলনীতির নিম্নিখে সে স্থানের প্রাচীনা, অক্ষাংশ তথা দৈর্ঘ্য দেশান্তর রেখা (Longitude) ও গ্রহ দেশান্তর রেখা (Latitude) এবং গুহার সমক নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন।—(যাযহারা) এর বিপরীতে বাজাজ বলেন: তাদের উপর থেকে রোদ দু'দুই থাকে কোন বিশেষ অবস্থানের কারণে নয়, বরং তাদের কারামতের কারণে

আলৌকিকভাবে এটাও ছিল। আমাদের শেষে **ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ** যাক থেকেও বাহাত তাই বোঝা যায় যে, স্নান থেকে হিকায়তের এই বাবহা আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই একটি নিদর্শন ছিল।—(সম্মত)

পরিষ্কার কথা এই যে, তাদের দেহে যাতে স্নান বা পড়় আল্লাহ তা'আলার সেরাপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থা শুধার বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে হোক কিংবা স্নানের সময় মেঘখণ্ড ইত্যাদির আড়াল করে হোক কিংবা সূর্যের কিরণকে আলৌকিকভাবে তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে হোক। আমাদের সব সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসসায়ে কহক এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত : দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই যে, আসসায়ে কহককে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সম্ভবও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং অবস্থা ছিল এরূপ যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তরুণীবিদ বলেন : তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে তিলাভাব আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহাত এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কীরামতই ছিল। এর বাহাত কারণ ছিল তাদের হিকায়ত করা—যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আস-বাবপল্ল চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পাখ পল্লিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পাখ কে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসসায়ে কহকের কুকুর : সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে ইবনে উমরের রোওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হিকায়তকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তাঁর গুণা থেকে দু'কিরাত হাঙ্গ পায়—(কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।) হযরত আবু-হুরায়রার রোওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ খসাকেরের হিকায়তের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর ভক্ত আসসায়ে কহক কুকুর সঙ্গে নিয়ন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়াতে মুহাম্মদীয় বিধান : সম্ভবত খুঁটখুঁটে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও গুণপালনকারী ছিলেন। ওজলার হিকায়তের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুত্ব সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওজনা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সংসংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়া বলেন : আমার ভ্রাতার পিতা বলেছেন যে তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল

করল অশুভরীর একটি ওয়াড় গুলেছেন। তিনি বিশ্বস্তে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি
সংলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মেহের অংশ সেও পায়। দেখ, আসহাবে কাহফের
কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা
কোশ্বায়েও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুরী স্বীয় শুকসীর প্রহে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন : একটি কুকুর যখন সবলোক ও ওপীদের সংসর্গের কারণে এই মর্বাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব প্রধানদার তওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সবলোকদেরকে ভাল-বাসে, তাদের মর্বাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সাধনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমল কাঁচা, কিন্তু রসুলুল্লাহ (স)-কে মনেপ্রাণে ভালবাসে।

সহীদ নুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : একদিন আমি ও রসূলুল্লাহ (সা) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল : ইয়া রসূলুল্লাহ ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্য তাত্ত্বিত করছ) ? এ কথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল : আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও) তুমি (কিয়ামতে) তাঁর সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বললেন : রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশি আনন্দিত কোন সময় হইনি। এরপর হযরত আনাস আরও বলেন : (আলহামদুলিল্লাহ) আমি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব—(কুরতুবী)

অন্যদিকে কংগ্রেসকে জিজ্ঞাস্য তা জানা এত উন্নতি মান করেছিলেন যে, যে দেখত

আতঙ্কপ্রসূ হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না : **لَوْ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمْ** বাহ্যত এতে সাধারণ লোককে সন্ধানন করা হয়েছে। কাজেই জরুরী নয় যে, আসিহাবে কাহকের উন্নতি রসুল্লাহ (সা)-কেও আশঙ্ক করতে পারত। আসিহাবে সাধারণ লোককে সন্ধান করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উকি মেনে দেখ, তবে আতঙ্কপ্রসূ হয়ে পলায়ন করবে।

এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কোরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এটাই যে, তাদের হিংস্রতার জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে স্নান পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আকর্ষ করে দিত যাতে পূর্ণরূপে দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির প্ৰত্যক্ষ ফলস্বরূপ। সন্তবপর এবং কার্যমত হিসাবে অলৌকিক উপায়ে ফলপ্রসূত সন্তবপর। কোরআন ও হাদীস যখন এর প্রেক্ষাপট বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিহক অনুমানের ডিক্টিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নিরর্থক।

তফসীর মামহারীতে এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শারবা, ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আক্বাসের এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন : আমরা রোমকদের মুকাবিলায় হযরত মুআবিয়া সাথে এক জিহাদে শরীক হয়েছিলাম, যা 'গযওক্সাভুল মুযীক' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া আসহাবে কাহ্‌ফকে জানা ও দেখার জন্য গুহার যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আক্বাস নিষেধ করে বললেন : আল্লাহ তা'আলা আপনার চাইতে বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সা)-কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি **لَوْ اَنَّكَ طَلَعْتَ** আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আক্বাসের মতে আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে সন্ধান করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া ইবনে আক্বাসের মত কবুল করলেন না। (সম্ভবত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সন্ধান করা হয়েছে অথবা কোরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কাহ্‌ফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহু দিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া ইবনে আক্বাসের কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহার প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা ভীষণ উত্তম হাওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি। —(মামহারী)

و كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۚ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝

(৯৯) আমি এমনভাবে তাদেরকে জ্ঞাপিত করলাম, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বলল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল : তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে

তোমাদের এই মুরাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নব্বতী সহকারে স্বপ্ন ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাক্ষ্য লাভ করবে না।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি যেমন স্বীকৃত পক্ষ বলে তাদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিত্তিত রেখেছি) এমনভাবে (এই দীর্ঘ নিদ্রার পর) আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। (যাতে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আত্মাহুত কুদরত ও হিকমত তাদের কাছে খুলে যায়। (সুমনতে) তাদের একজন বলল: (নিদ্রাবস্থায়) তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? (উত্তরে) কেউ কেউ বলল: (সম্ভবত) একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম সময় অবস্থান করছি। অন্য কেউ কেউ বলল: (এ নিয়ে খোঁজাৰ্জ জির কি প্রয়োজন?) এ সম্পর্কে তো (সঠিকভাবে) তোমাদের পালন-কর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল (নিদ্রার) অবস্থান করেছ। এখন (এই অনর্থক পর্যালোচনা ছেড়ে) জরুরী কাজ করা দরকার। তা এই যে,) তোমাদের একজনকে তোমাদের এই টাকা (যা তোমাদের কাছে ছিল। কেননা, খরচাদির জন্য তারা কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। মোটকথা, কাউকে এই টাকা) দিয়ে শহরে প্রেরণ কর। (সেখানে পৌঁছে) সে যেন দেখে কোন খাদ্য হালাল। (এখানে ইবনে-জরীরের নেওয়ায়েতে হযরত সাদীদ ইবনে জুবায়ের থেকে **أزى** শব্দের তকসীর হালাল খাদ্য বর্ণিত আছে। একথা বলা জরুরী ছিল। কারণ, তাদের কওম প্রতিমার নামে জন্ত হবেহ করত এবং বাজারে হারাম গোশত প্রচুর পারস্পরিমাণে বিক্রি হত।) অতঃপর তা থেকে সে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং বিচরণতার সাথে কাজ করে (অর্থাৎ এমন ভাবসার নিয়ে যাবে যে, কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে এবং খাদ্য যাচাই করার মধ্যেও যেন এ কথা জানতে না দেয় যে, সে মৃত্তিক নামে যাবেহ কর্ত গোশত হারাম মনে করে।) এবং কাউকে যেন তোমাদের বিষয়ে জানতে না দেয়। (কেননা) তারা যদি (অর্থাৎ শহরবাসীরা। তারা তাদেরকে নিজেদের সমানার মূল্যবোধ মনে করত।) তোমাদের খবর পেয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে হত্যা পাথর মেরে হত্যা করবে, না হত্যা (জোরজবরদ-স্তিভাবে) তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। এরূপ হলে তোমরা কখনই সাক্ষ্য লাভ করবে না।

আমুসলিক জাতিয়া বিবরণ

كذبت

এ শব্দটি তুমামূলক ও দুস্তাভমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত

নিদ্রাভিক্ত থাকার, যা কাহিনীর শুরুতে **فَرَرْنَا عَلَىٰ أَزَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ** এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে আগ্রহ হওয়া। উক্ত ঘটনা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে আগ্রহ করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে **كَذَلِكَ** শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও সাধারণ জাগরণ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এরপর **لَتَسَاءَلُوا** বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা আগ্রহ করার আসল মকদ্দম নয়, বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর **لَمْ** তফসীরবিদগণ **لَمْ** অথবা **مُتَوَرِّث** নাম দিয়েছেন।—(আবু হাইয়ান, কুরতুবী)

যেটুকু তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় আগ্রহ হওয়াও ছিল আল্লাহর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রায় থাকা বিস্ময়টিকে স্বয়ং তারাও জানুক, তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পদ্ধতী **كَذَلِكَ أَعْتَرْنَا** আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতামতের সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহার নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপার সবাই মনেই বিশ্বাস করে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ—কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, গুহার

অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতামতের মিল এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে সে কথারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আসহাবে কাহকের এক বক্তি প্রথমে তুলে যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহার প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহার প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যরা অনুভব করল, যে, এটা সম্ভবত সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : **رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ** অতঃপর তারা এ আলো-

চনাতে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে প্রেরণ করা হোক।

إِلَى الْمَدِينَةِ — এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, ওহাব নিকটে একটি বড়

শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবু হাইয়ান তফসীর বাহরে মুহীতে বলেন : যে সময়ে আসহাবে কাহফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল ‘আফসুস’। বর্তমানে এর নাম ‘তরসুস’। কুরতুবী স্বীয় তফসীর প্রছে বলেন : এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল ‘আফসুস’। অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন মুসলিম শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরসুস।

بِوَرَقٍ — থেকে জানা যায় যে, তারা ওহাব আসার সময় কিছু টাক-

পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় উন্নয়নগোচরিত ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও ভাঙাচুরার পরিপন্থী নয়। —(বাহরে মুহীত)

أَزْكَىٰ — অর্থ পাক-সাক। ইবনে জুবায়েরের

তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এ জন্য দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে যবেহ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

যাস’জাল্লা : এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়।

وَأَوْفِرْ لَهُمْ

رِجْمًا — অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। ওহাব

যাওয়ার পূর্বে যদিখাহ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্ম-ত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

ইসলামী শরীয়াতে বিবাহিত নারী ও পুরুষের যিনার শাস্তিও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা। সত্ত্বেও এরও কারণ এই যে, যে ব্যক্তি জাফারের মত সব বাধা ছিন্ন করে এহেন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়, তার হত্যা প্রকাশ্য স্থানে সব লোকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া

উচিত। এভাবে তার লোকনাও পুরোপুরি হবে এবং মুসলমান কার্যক্ষেত্রে স্বীয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে যাতে ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

فَا بُعِثُوا آدَمُ إِلَىٰ مَكَّةَ ۖ فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِمَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ

শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে টাকা অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন : এ থেকে কয়েকটি মাস'আলা জানা যায়। এক. অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জারয়েম। দুই. অর্থ সম্পদে উকিল নিযুক্ত করা জারয়েম এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। তিন. খাদ্যপ্রবোদ কর্তব্যকর্ম সঙ্গী শরীক হলে তা জারয়েম, যদিও খাদ্যের পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়—কেউ কম খায় আর কেউ কেউ বেশী খায়।

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذِ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا ۚ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۖ

(২১) এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আলাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতর্ক করতেন, তখন তারা বলল : তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে তাদের মত প্রবল হলো, তারা বলল : আমরা প্রবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।

তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি যেভাবে স্বীয় কুদরতবলে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করেছি এবং জাগ্রত করেছি) এমনিভাবে আমি স্বীয় কুদরত ও হিকমত দ্বারা তখনকার লোকদেরকে তাদের বিশ্বাস আনিতে দিয়েছি, যাতে (অন্যান্য অনেক উপকারের মধ্য থেকে একটি উপকার এ-ও হয় যে,) তারা (এ ঘটনার সূত্র ধরে) এ বিষয়ে বিশ্বাস (অথবা অধিক বিশ্বাস) অর্জন করে যে, আলাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। (তারা যদি পূর্বে থেকে কিয়ামতে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী থেকে থাকে, তবে এ ঘটনা দ্বারা তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পূর্বে কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়, তবে এ ঘটনা দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। আসহাবে কাহ্ফের জীবদ্দশায় এ ঘটনা ঘটে। এরপর তারা শুহর যথেষ্ট প্রাণ ত্যাগ করে। তখন তাদের সম্পর্কে

সমসাময়িক লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পদ্ধতী আয়াতে এই মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে।)। এই সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন তখনকার লোকেরা তাদের নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে পারস্পরিক বিতর্ক করতেন। (এই বিতর্ক ছিল ওহার মুখ বন্ধ করার ব্যাপারে, যাতে তাদের মৃতদেহ নিরাপদ থাকে অথবা তাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়)। তারা বলল : তাদের (ওহার) নিকটে সৌধ নির্মাণ কর। (এরপর মতানৈক্য হলো যে, সৌধটি কি হবে? এই মতানৈক্যের সময়) তাদের পালনকর্তা তাদের (বিভিন্ন মতামতের) বিষয় ভাল জানতেন। (অবশেষে) যারা স্বীয় ফর্তব্যে অটল ছিল (অর্থাৎ রাজপরিবারের লোক, যারা তখন সত্যধর্মের অনুসারী ছিল) তারা বলল, আমরা তাদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করব। (মসজিদটি এ বিষয়েরও চিহ্ন হবে যে, তারা স্বয়ং উপাসনাকারী ছিল—উপাস্য ছিল না। অন্য রকম কোন সৌধ নির্মাণ করলে ভবিষ্যত বংশধররা হয়তো তাদেরকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে ফেলতে পারত)।

আনুমানিক জাতক বিষয়

وَكَذَلِكَ أَتَتْهُنَّ عَلَيْنَهُنَّ

এ আয়াতে আসহাবে কাহকের রহস্য শহর-রাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া, এর রহস্য এবং পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অজিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

আসহাবে কাহকের বিষয় শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া : আসহাবে কাহকের প্রধানকালে অত্যাচারী ও মুশরিক বাদশাহ্ দাফিগানুসের রাজত্ব ছিল। তার মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হলে শহরের উপর সত্যপন্থী ওওহীদবাদী লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বাদশাহ্ ছিলেন একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি। তফসীর মাহহারীতে ঐতিহাসিক স্কেওয়ারেতে দুশ্চেষ্ট তার নাম 'বাইদুসীস' লেখা রয়েছে। তার শাসনকালে ঘটনাক্রমে কিয়ামতে মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রসঙ্গ মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়ে। একদল একে অস্বীকার করতে থাকে। তারা বলে যে, মানবদেহ পচে-গলে অণু-পরমাণুর আকারে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ার পর পুনরায় জীবিত হওয়া অসম্ভব। বাদশাহ্ খায়দুসীস চিন্তিত্ব হলেন যে, কিভাবে তাদের সমেহ নিরসন করা যায়। কোন উপায় না দেখে তিনি চট্টের পোশাক পরিধান করত হাই-এর সুপে বসে আক্কাহর কাছে কামাকাটি করে দোয়া করতে লাগলেন : হে আক্কাহ, আপনিই তাদের বিশ্বাস সংশোধন ও সৎ পথে ফিরে আসার কোন উপায় করে দিন। একদিকে বাদশাহ্ কামাকাটি ও দোয়ার মশগুল ছিলেন, অপরদিকে আক্কাহ তার দোয়া কবুল করার ব্যবস্থা করলেন যে, আসহাবে কাহকের নিরাপত্তা হলো। তারা তাদের 'ভামলিখা' নামক এক ব্যক্তিকে খাদ্য আনার জন্য বাজারে প্রেরণ করল। সে দোকানে পৌঁছল এবং খাদ্যের মূল্য হিসাবে তিন শ বছর পূর্বকার বাদশাহ্ দাফিগানুসের আমলে প্রচলিত মুদ্রা পেশ করল। দোকানদার অস্বাভাবিকভাবে তাকিয়ে রইল। এ মুদ্রা কোথা থেকে এল? কোন আমলের? তা অন্যান্য

দোকানদারকে দেখানো হলো। সবাই বলল : এ ব্যক্তি কোথাও প্রাচীন ধনভাণ্ডার লাভ করেনি। সেখান থেকেই এই মুদ্রা বের করে এনেছে। সে অস্বীকার করে বলল : আমি কোন ধনভাণ্ডার পাইনি এবং কারও কাছ থেকে এ মুদ্রা আনিনি। এটা আমার নিজের।

বাজারীরা তাকে প্রেক্ষতার করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাদশাহ সাধু ও আল্লাহভক্ত লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন রাজকীয় ধনভাণ্ডারে রক্ষিত সে ফলকটিও দেখেছিলেন, যাতে আসহাবে কাহ্ফের নাম ও তাদের পলায়নের ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। কারও কারও মতে স্বয়ং অত্যাচারী বাদশাহ দাফিনানুস এই ফলকটি লিখেছিলেন এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, এরা দাগী অপরাধী। এদের নাম-তিকাণী সংরক্ষিত থাকতে হবে। যখন যেখানে পাওয়া যায়, প্রেক্ষতার করতে হবে। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে শাহী দফতরে কিছুসংখ্যক ঈমানদারও ছিল। তারা মৃত্যুপূজাকে ঘৃণা করত এবং আসহাবে কাহ্ফকে সত্যপন্থী মনে করত। তবে তা প্রকাশ করার সাহস তাদের ছিল না। তারা স্মৃতি হিসেবে এই ফলক লিপিবদ্ধ করেছিল। সে ফলকের নামই রুকীম। সে কারপেই আসহাবে কাহ্ফকে আসহাবে রুকীমও বলা হয়।

মোটকথা, বাদশাহ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা ভীত ছিলেন। এ সময় তার আন্তরিক কামনা ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে মানুষ জানুক যে, মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

এজন্য তামলিখার অবস্থা শুনে বাদশাহর নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, সে আসহাবে কাহ্ফের একজন। বাদশাহ বললেন : আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যে, আমাকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেও, যারা বাদশাহ দাফিনানুসের আমলে ঈমান রক্ষা করার জন্য পলায়ন করেছিলেন। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন। এতে মৃতদেহ জীবিত করে হাশরে একত্র করাকে বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ নিহিত থাকতে পারে। এরপর বাদশাহ তামলিখাকে বললেন : আমাকে সে গুহার নিম্নে চল, যেখান থেকে তুমি এসেছ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ**

বাদশাহ নগরবাসীদের এক বিরাট দল সমভিব্যাহারে গুহার পৌঁছাল। গুহার নিকটবর্তী হয়ে তামলিখা বলল : আপনারা একই ধামুন। আমি সঙ্গীদেরকে প্রকৃত ব্যাপারটি জানিয়ে দেই যে, এখন বাদশাহ তুওহীদবাদী মুসলমান। কওমও মুসলমান। তারা সাক্ষাতের জন্য আগমন করেছে। একথা জানিনোয় আগে আপনারা গেলে তারা মনে করবে যে, আমাদের শত্রু বাদশাহ চড়াও হয়েছে। সেমতে তামলিখা গুহার পৌঁছে তাদেরকে আদোপ্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করল। আসহাবে কাহ্ফ এতে খুব আনন্দিত হলো এবং সসন্মানে বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানাল। অতঃপর তারা গুহার ফিরে গেল। অধিকাংশ রেওয়াজেতে রয়েছে, তামলিখা যখন সঙ্গীদেরকে সকল ব্রূহত্ত অবহিত করল, তখনই সবার মৃত্যু হয়ে গেল, বাদশাহর সাথে সাক্ষাত হতে পারেনি। বাহরে-মুহীতে আব্দু হাইয়ান একেত্রে এই রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাক্ষাতের পর গুহাবাসীরা

বাদশাহ ও নগরবাসীদেরকে বলল : এখন আমরা বিদায় হতে চাই। এই বলে তারা ওহাব্‌র অভ্যন্তরে চলে গেল এবং তখনই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে মৃত্যুদান করলেন।

মোটকথা, আল্লাহ্‌র কুদরতের এই আশ্চর্য ঘটনাটি নগরবাসীদের সামনে জাহল্যমান হয়ে ফুটে উঠল। তাদের বিশ্বাস হলো যে, যে সজ্জা জীবিত মানুষদেরকে তিন শ বছর পর্যন্ত পানাহার ছাড়া জীবিত রাখতে পারেন এবং এত দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন রাখার পর আবার সুস্থ ও সবল অবস্থায় জাগ্রত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরও মৃতদেহগুলোকে জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়। এই ঘটনার ফলে তাদের অবিশ্বাসের কারণ দূর হয়ে গেল। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার কুদরতকে মানবীয় ক্রমভাৱে আলোকে বোঝার চেষ্টা করা মূর্খতা বৈ নয়।

এ বক্তব্যের প্রতিই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে : **لِيَعْلَمُوا أَن وَعد**

اللَّهُ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا — অর্থাৎ আমি আসহাবে কাহ্ফকে

দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন রাখার পর জাগ্রত করে বসিয়ে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা অর্থাৎ কিয়ামতে মৃতদেরকে জীবিত করার ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

আসহাবে কাহ্ফের ওফাতের পর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য : আসহাবে কাহ্ফের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা সম্পর্কে করারও দ্বিমত ছিল না। তাদের ওফাতের পর সবাই মনে করল যে, ওহাব্‌র নিকটে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সৌধটি কি ধরনের হবে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, নগরবাসীদের মধ্যে তখনও কিছু মূর্তিপূজারী ছিল। তারাও আসহাবে কাহ্ফের যিয়ারতের জন্য আগমন করত। তারা মত দিল যে, কোন জনহিতকর সৌধ নির্মাণ করা হোক। কিন্তু শাসকবর্গ ও বাদশাহ মুসলমান ছিলেন এবং তারাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা প্রস্তাব দিল যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক যা স্মৃতিচিহ্নও হবে এবং ভবিষ্যতে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার কারণও হবে। এখানের

মতানৈক্যের উল্লেখ করে মাঝখানে কোরআনের এই বাকটি রয়েছে : **وَمَا أَعْلَمُ إِلَّا**

— অর্থাৎ তাদের পালনকর্তা তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন।

তফসীর বাহরে মুহীতে এ বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দু'টি সজ্জাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি নগরবাসীদেরই উক্তি। কেননা, তাদের ওফাতের পর যখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন মূর্তিসৌধে সাধারণত যাদের স্মৃতিসৌধ, তাদের নাম ও বিশেষ অবস্থাদির শিলালিপি সংযুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আসহাবে কাহ্ফের ধর্ম ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নরূপ কথাবার্তা হয়েছে। যখন তারা কোন সত্য উদ্ঘাটন

কল্পতে পারেনি, তখন নিজেরাই পরিশেষে অরুম হয়ে বলেছে : **وَيَقُولُونَ سَاءَ اَعْلَمُ بِهِمْ**

এরপর তারা আসল কাজ অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ নির্মাণে মনোনিবেশ করেছে। যারা প্রবল ছিল, তাদের মসজিদ নির্মাণসংক্রান্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হলে।

দুই. এ বাক্যটি আলাহ্ তা'আলার। এতে বর্তমানকালের বিতর্ককারী ও মতানৈক্য-কারীদেরকে হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যখন আসল সত্য জান না এবং জানার উপায়ও তোমাদের কাছে নেই তখন এই আলোচনায় জড়িয়ে অনর্থক কেন সময় নষ্ট কর? রসুলুল্লাহ্ (সা)-র যমানায় ইহদীরা এ ঘটনা সম্পর্কে এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বলত। সত্ত্বত তাদেরকে হ'শিয়ার করা উদ্দেশ্য।

মাস'আলা : এ ঘটনা থেকে এতটুকু জানা গেল যে, ওলী-দরবেশদের কবরের কাছে নামাযের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা গোনাহ্ নয়। এক হাদীসে পরগছরদের কবরকে যারা মসজিদে পরিণত করে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর অর্থ স্বয়ং কবরকে সিজদার আয়গার পরিণত করা, যা সর্ববাদীসম্মত শিরক ও হারাম।
—(মামহারী)

**سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَذِبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ
كَذِبُهُمْ رَجَبًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَذِبُهُمْ قُلْ رَبِّي
اعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ الْاِمْرَاءَ
ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝**

(২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে : তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে : তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে : তারা ছিল সাতজন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অজ্ঞ লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

তরুসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আসহাবে কাঙ্ক্ষের কাহিনী বর্ণনা করবে, তখন কেউ কেউ বলবে : তারা ছিল তিন জন, চতুর্থটি তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে : তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। (আর) তারা অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করে কথা বলছে এবং

কেউ কেউ বলবে : তারা সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। আপনি মতভেদ-কারীদেরকে বলে দিন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা খুব বিতৃষ্ণরূপে জানেন যে, (এসব বিভিন্ন উক্তির মধ্যে কোন উক্তি বিতৃষ্ণ না সবই সত্য)। তাদের সংখ্যা বিতৃষ্ণরূপে খুব কম লোকই জানে। সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যে বিশেষ কোন উপকার নিহিত নেই, তাই আয়াতে কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা করা হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, **أَفْأَمِنَ الْقَلِيلُ كَانُوا سبعة** অর্থাৎ

অল্প সংখ্যাকের মধ্যে আমিও একজন। তাদের সংখ্যা ছিল সাত। (দুরহে-মনসুর) আয়াতেও এ উক্তির সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, এ উক্তি উদ্ধৃত করে এফে নাকচ করা হয়নি। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর **وَجَمًا بِالْغَيْبِ** বলে নাকচ করা হয়েছে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** অতএব (যদি তারা মতভেদ করা থেকে বিরত না হয় তবে) আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না। (অর্থাৎ **أَفْأَمِنَ الْقَلِيلُ** এবং **قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ** বলে কোরআনে সংক্ষেপে

তাদের ধারণা নাকচ করা হয়েছে। এটাই সাধারণ আলোচনা। তাদের আপত্তির জওয়াবে এর চাইতে বেশি মনোনিবেশ করা এবং স্রীর দাবি প্রমাণের জন্য বেশি চেষ্টা করা সমীচীন নয়। কারণ, এই আলোচনাতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই।) এবং আপনি তাদের (আসহাবে কাহ্ফের) সম্পর্কে এদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। [রসূলুল্লাহ (স)-কে যেমন এদের আপত্তির উত্তরদানে পরিপ্রম ফরতে বাধণ করা হয়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, যতটুকু জরুরী ছিল, ততটুকু কোরআনেই এসে গেছে। অনাবশ্যক জিজ্ঞাসাবাদ ও খোঁজাখুঁজি পরগণারের মর্যাদার পরিপন্থী।]

আনুযয়িক ভাষ্য বিষয়

বিরোধপূর্ণ আলোচনার কথাবার্তার উত্তর গহা : **سَيَقُولُونَ**—অর্থাৎ তারা বলবে।—‘তারা’ কারা—এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে। এক. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহ্ফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।—(বাহর)

দুই. **سَيَقُولُونَ** বাক্যে নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ (স)-র সাথে আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল ‘মালকানিয়া’। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল ‘এমাকুবিয়া’।

তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ ষাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাসরীয়া'। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন : তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে প্রসুলুছাহ্ (সি)-র হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উক্তির বিশ্বাস্যতাই প্রমাণিত হয়।—(বাহ্যেরে মুহীত)

وَأَنَا مِنْهُمْ

এখানে ঐ বিষয়টি প্রাধান্যবোধ্য যে, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে : তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাত্রখানে **وَأَنَا مِنْهُمْ** (সংযোগকারী ওয়াও)

ব্যবহার না করে বলা হয়েছে **خَمْسَةَ سَادَ سَوْمَ كُلِّهِمْ** এবং **ثَلَاثَةَ رَابِعَهُمَ كُلِّهِمْ**

কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে **وَأَنَا مِنْهُمْ** বলা হয়েছে। এনে **وَأَنَا مِنْهُمْ** এর **وَأَنَا** বলা হয়েছে।

তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আনবাদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পর যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত, যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আনবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনার **وَأَنَا مِنْهُمْ** ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে **وَأَنَا مِنْهُمْ** এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই **وَأَنَا مِنْهُمْ** নাম দেয়া হয়।—(মামহারী)

আসহাবে কাহ্ফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোন সহীহ্ হাদীস থেকে আসহাবে কাহ্ফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও ঐতিহাসিক স্নেওরীয়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থে বিজ্ঞান সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে স্নেওরীয়েত বর্ণনা করেছেন, সেটাই বিশ্বাস্যতর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :

মুসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুনুস, হুনওরাস, কারাভাতি-মুনুস।

ثَلَاثًا رَّيْبُهُمْ إِلَّا مَرَأَةً ظَنَّا هَرَامًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ আপনি আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বিতর্কে

প্রকৃত হইবে না, কারণ সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি কিছও ভাবেননি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ কাগারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরতি থাকা উচিত : বর্ণিত উক্ত বাক্যে রসুলুল্লাহ (সা)-কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলিম সম্প্রদায়ের জন্য প্রকৃতপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রকারে যতবিরোধ দেখা দিলে অল্পসীমিত বিমতভঙ্গো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনার অধিত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজেই দাবি গ্রহণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খতনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে ভিত্তিতা হ্রাসও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে কিতাব নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ব সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য প্রাপ্যভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্টি থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশি জানার জন্য, খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এখনও হতে পারে যে, তার অভিজ্ঞতা ও মূল্যবান জনসমাজে কুটে উঠুক—এটাও ও পরগল্পের চরিত্রের পরিণতি তাই ভাল ও স্বল্প উত্তর উদ্দেশ্যে অপরকে এ সারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রযুক্ত করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ
وَأَذْكُرُوا بِفَضْلِهِ أَن تَتَّبِعُوا عَلَىٰ أَن يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ
مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ۚ وَلَيَتْلُوَنَّ فِي كَهْفِهِمْ هَٰذَا وَمَا تَوْسِيتُهُمْ وَأَزْدَادُوا
سُوءًا ۚ كُلُّ اللَّهِ أَغْلَمُ بِمَا لَيَسُّوهُ لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
أَبْهُرَ بِهِمْ ۚ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ مَنَاسِكَ ۚ وَلَا يَشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۚ

২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে কারোকেই না যে, সেটি আমি 'আমারি' করে করব' (২৪) 'আজিই ইচ্ছা করলে' করা কাউকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পরামর্শকে প্রদান করুন এবং বলুন : আমি যদি আপনার পরামর্শকে এর

চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উম্মত তাদের ওহীর দিন নব্বয়র, অভিরিক্ত আরও নয় বছর অভিযাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন : তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা জানাই ভাল জানেন। নব্বয়র ও উম্মতের অসুখা বিকলের জন্য ঈশ্বরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শুনে। তিনি কতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কব্জি পরীক্ষা করেন না।

তবসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি লোকেরা আগনার কাছে কোন উত্তরসাপেক্ষ বিষয় জিজ্ঞেস করে এবং আগনি উত্তর দানের ওয়াদা করেন, তবে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' কিংবা এর সাধারণ বোধক কোন বাধা অবশ্যই সংযুক্ত করবেন, বরং বিশেষ করে ওয়াদার ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেক কাজে এর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে) আগনি কোন কাজের বিষয় এমন বলবেন না যে, আমি তা (উদাহরণত) আগামীকাল করব, কিন্তু আল্লাহর চাওরাকে (এর সাথে) যুক্ত করে বিন। [অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ' ইত্যাদিও সাথে সাথে বলা দিন।] ভবিষ্যতে এমন না হওয়া চাই, যেমন এ ঘটনার হয়েছে যে, লোকেরা আগনিকে ক্রম আসহাবে কাহক ও যুলকানুনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করার আগনি 'ইনশাআল্লাহ' না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল ওয়াদা দানের ওয়াদা করেছেন। এরপর নব্বয়র দিন পর্যন্ত ওহী আসেনি, বদরুন আগনি খুব চিন্তিত হয়েছেন। এই নির্বিশেষে সাথে সাথে প্রশ্নকারীদের প্রশ্ন হওয়ার নাখিল হয়। (জবাব)] এবং যখন আগনি ঘটনাক্রমে 'ইনশাআল্লাহ' বলা (জুলে যান, এবং পরে কোন সময় সম্মুখ হয়) তবে (তখনই 'ইনশাআল্লাহ' বলে), আগনার পালনকর্তাকে সম্মুখ করণ এবং (তাদেরকে একত্রিত) বলে দিন যে, আমি তোমার পালনকর্তা আলামকে (নব্বয়রের প্রমাণ হওয়ার দিক দিয়ে) এর (অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ' কাহিনীর) চাইতেও সত্যের নিকটতম পথনির্দেশ করবেন। [উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আল্লাহ নব্বয়রের পক্ষীক। নেতার জন্য আসহাবে কাহক ইত্যাদির কাহিনী জিজ্ঞেস করে, যা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। কিন্তু আসহাব কাহা এই যে, নব্বয়ত সম্মুখের জন্য এসব কাহিনীর প্রশ্ন ও উত্তর খুব বড় প্রশংসা হতে পারে না। এ কাজ তো-ইতিহাস ভাঙ্গার জন্য থাকলে সাধারণ লোকও করতে পারে। আমাকে আল্লাহ তা'আলা নব্বয়ত সম্মুখের জন্য চাইতেও বড় আশ্বস্তি প্রমাণাদি এবং সুখিধা দান করেছে। তুমিও সবরহা প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং কোরআন। সমস্ত বিষয় মিলেও এর একটি-আল্লাহের অনুকরণে কোন সুরা রচনা করতে পারেনি। এ ছাড়া হযরত আদম (আ) থেকে নিয়ে ক্রিয়াত পর্যন্ত সময়ের এমন ঘটনাবলী ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কাজের দিক দিয়ে আসহাবে কাহক ও যুলকানুনাইন, ঘটনার ক্রম, পূর্বকর্তা এবং যেভাবে সম্পর্কে ভাষালাভ করত ওহী ব্যতীত আরও অনেক সত্যবাক্য নয়। মোটামুটি কেসের ভাষা আসহাবে কাহক ও যুলকানুনাইনের ঘটনাকে অধিক আশ্চর্যজনক বলে মনে করে এতলোকেরই নব্বয়ত পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে পেশ করেছে, কিন্তু আল্লাহ তা'

অস্বাভাবিক এক চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক বিকল্পসমূহের ভান দেখান করেছেন)।
এবং আসসাযে কাহফের সংখ্যার ব্যাপারে তারা যেমন মতভেদ করেন, তেমনি তাদের
নির্দিষ্ট সময়কাল সম্পর্কও তারা বিভিন্ন মতভেদ করেন। আমি এ সম্পর্কে সঠিক কথা
বলি দিচ্ছি যে, তারা তাদের ক্বাহর (নিষিদ্ধাবহার) ভিন্ন ন' বহরের পর-প্রত্যন্ত নয়
বহর অবস্থান করেছেন। (যদি এই সঠিক কথা শুনেও তারা মতভেদ করতে থাকে,
তবে) আগনি বলে দিন : অজাহু তা'আলা তাদের (নিষিদ্ধ) থাকার সময়কাল তো তাদের
চাইতেও অধিক জানেন। (তাই তিনি যা বলেছেন, তাই সঠিক। আর যিশের ক্ষেত্রে এ
ঘটনার ক্ষেত্রেই কেন, তার ভেতর অবস্থা এই কে) নভোমণ্ডল ও জুমগুলের অশুভ বিষয়ের
জান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও কত চমৎকার শুনে।
তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কক্ষকে বীর কৃত্রিম শরীক
করেন না। (সত্য কথা এই যে, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং শরীকও নেই। এমন
মহান সত্য বিস্ময়ভর্যকে খুব ভয় করা উচিত।)

আমুসলিক জাহাজ বিষয়

উল্লিখিত ভায় আয়াতেই আসসাযে কাহফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তৎপরে
প্রথম দু'আয়াতে রসুলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যৎকালে
কোন কাজ করার ওরাদা বা বীকায়েতি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি যুক্ত
করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা, তা কারও জানা নেই। জীবিত
থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কেহই মুসলিমের উচিত
মনে মনে এবং মুখে বীকায়েতির মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করা ভবিষ্যতে কোন
কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার যদি, আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি
আমোদীকৃত করব। ইনশাআল্লাহ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ জরোচনার ফরাসালা করা হয়েছে। এতে
আসসাযে কাহফের আয়তের মোকদ্দম মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের
ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অজাহু ওহর নিম্নামর থাকার সময়কাল
এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিন ন' নয় বহর। কাহিনীর শুরুতে
فَمَرَرْنَا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ فِي الْكُهْفِ مَسْلُومِينَ عُدُوًّا
বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা
আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও
জুমগুলের সব অশুভ বিষয়ে পরিতোষ, প্রজ্ঞা ও দৃষ্টি। তিনি তিন ন' নয় বহরকে
সময়কাল নির্ণয় করেছেন। এতেই সবুট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ বলা : 'কুবাব' গুহে হযরত আমুসলিক ইবন
আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নূহ সন্দর্ভে বর্ণিত আছে যে, মজার কাহিনী

যখন ইকলীসের শিকা অনুযায়ী রসুলুলাহ (সঃ)-কে আসবাবের কাছক সম্পর্কে প্রশ্ন করা
 তখন তিনি ইনশাআল্লাহ না বলেই তাদের সাথে অগামীকাল জওয়াব দেবার ওয়াদা
 করেছিলেন। নৈকটীপীজনেরকে সামান্য হুটির জম্মত হ'নিয়ার করা হয়। তাই পনের
 দিন পরীক্ষাকাল ওই আগমন করেননি রসুলুলাহ (সঃ) খুবই চিন্তিত হইলেন। মুল্লিকার
 বিব্রূন ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরার প্রায়
 জওয়াব মা'মিল হল, তখন এর সাথে হিনারের জমা এ দুটি আয়াতও অবতীর্ণ হইল
 যে, ওমিয়ারে কোন কাজ করান কথা করা হলে ইনশাআল্লাহ বনে এ কথার স্বীকারোক্তি
 করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আয়াত তা'আজার ইনশার উপর নির্ভরশীল। আয়াতকে
 আসবাবের ক্ষমতার কাছিনীর সেরাংশে সংযুক্ত করা হয়েছে :

মাস'আজার : এ আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ
 বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়ত যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই সময় হয়
 তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ শুধু
 বরকতলাভ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য—কোন শর্ত লাগানো
 উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনাবেচা ও পারস্পরিক চুক্তির
 মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনাবেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয় পক্ষের
 জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির
 সমর শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সমর স্বরূপ আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত
 লাগাতে পারবে না। এ মাস'আজার কোন কোন ফিকাহবিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন।
 বিস্তারিত বিবরণ না ফিকাহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় আয়াতে ওহর নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কৌরজানের
 পূর্বপর বর্ণনা থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আয়াত তা'আজার
 পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইকন কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক-
 সংখ্যক তরুণীরবিশদের উক্তি। আবু হাইয়াম, কুশতুবী প্রমুখ তরুণীরবিদও তাই
 গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদাহ প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি
 বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদ-
 কারীদের করণ্ড কারণে পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আয়াত তা'আজার উক্তি হচ্ছে শুধু
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا বাক্যটি। কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি

যদি সারাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا বলায় কোন প্রয়োজন
 থাকে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তরুণীরবিদরা বলেন যে, উক্ত বাক্যই আয়াত তা'আজার
 নির্দিষ্ট প্রথম বাক্য বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্য এর সাথে বিরোধ
 পোষণকারীদেরকে হ'নিয়ার করা হয়েছে যে, যখন আয়াতের পক্ষ থেকে সময়কাল বর্ণিত
 হয়ে গেছে তখন কাকে মেনে নেয়া অপরিহার্য। তিনিই বলেন। নিম্নক অনুমান ও সত্যমতের
 ভিত্তিতে এর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ।

এখানে প্রায় হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশি। প্রথমুই তিন শত নয় বলেনি কেন? তরসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে সৌর বর্ষের গণনান ছিল। এই হিসাবে মোট তিন শত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ-বর্ষ গণনিত। চান্দ বর্ষের হিসাবে প্রতি একশত বছরে তিন বছর থেকে যায়। তাই তিন শত সৌর বছরে চান্দ বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষগণীর পার্থক্য বোঝাবার জন্য উপরোক্ত ভাষিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে আরও একটি প্রায় হয় যে, আসহাবে কাহকের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের আমলে, অতঃপর রসুলুজাহ (সা)-র যুগে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে দুটি বিষয়ে মত-ভেদে ছিল। এক, অতঃপরে কাহকের সংখ্যা এবং দুই, তাহার তাদের নিদ্রার সময়কাল। কোরআন পাক উভয় বিষয় একটি পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছে। সংখ্যার বর্ণনা পরিকার ভাষায় করেনি—ইঙ্গিতে করেছে। অর্থাৎ যে উক্তিটি নিভূ'ল ছিল, তার মতন করেছে। কিন্তু সময়কাল পরিকার ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে রয়েছে।

وَلْيُبَيِّنُوا لِي كُفْرَهُمْ تِلْكَ مَآةَ سَنِينَ وَارْدَادٍ وَتَعْلَمُ

যে, এই বর্ণনা পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তা এই যে, সংখ্যার আলোচনা প্রত্যেকেরই অনর্থক। এর সঙ্গে কোন সাধির ও ধর্মীয় মাস-আজার সম্পর্ক নেই। তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানবীর অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিরুপায় থাকার এবং পানাহার ছাড়া সুস্থ ও সবল থাকা এরপর দীর্ঘ দিন পর-সুস্থ অবস্থায় উঠে বসা—এগুলোর হাশ্র ও নশরের দৃষ্টান্ত এবং কিয়ামত ও পরকালের প্রমাণ হতে পারে তাই বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেসব লোক যুজিয়া ও অভ্যাস বিরোধী ঘটনাবলী অস্বীকার করে, না হয় প্রাচী-শিক্ষা বিশারদ সাল্লাল্লাহু ইহুদী ও খৃষ্টান লোক কতক উল্লিখিত আদিত্তে ভীত হয়ে এতলোভে মনো-কল্পনের সদর্থ বর্ণনা করার চরাস পার, তার আলোচ্য আদিত্তেও হবরত কাভাদাহর ভবিষ্যী অবলম্বন করে তিন শত নয় বছরের সময়কাল তৎকালীন লোকদের উক্তি সাধিত করে মতন করার প্রচাস পেয়েছে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে চিন্তা করেনি যে, কাহিনীর ওরত ۱۰۰ سنين বলা হয়েছে, যা আজাহ তা'আজার উক্তি ছাড়া কলও

উক্তি হতে পারে না। অভ্যাসবিরুদ্ধ ঘটনা ও কালামত প্রমাণ করার জন্য কয়েক বছর নিদ্রায় থেকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় উঠে বসা যথেষ্ট। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ
 عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا
 قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۖ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ ۚ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝
 أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَذَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلَّوْنَ
 فِيهَا مِنْ أَسْنَانٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ
 وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ
 مُرْتَفَقًا ۝

(২৭) আগনির প্রতি আগমার পালনকারী যে-কিভাবে প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাই-করুন। তাঁর দ্বারা পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে কাছাকাছি আগনি-করুন। যেমন-কাজের দ্বারা পাবেন না। (২৮) আগনি নিরন্তর তাদের সংস্কার-আবস্থা রাখুন তার সকল ও সকল তাদের পালনকারীকে তাঁর সমস্তই অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে এবং আগনি পথিবী জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমি আমার সম্মুখ থেকে পাকিত করে দিয়েছি, যে নিজের প্রতিটির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আগনি তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন : 'সত্য ভোম্বাদের পালনকারী পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস হ্রাসন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।' আমি জুলিয়দের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার যেটুকু তাদেরকে প্রতিক্রিয়া দেয় থাকবে। যদি তারা পানীর প্রার্থনা করে, তবে পুঞ্জের ন্যায় পানীর সেতুর দ্বারা তা তাদের পুঞ্জভর দণ্ড করবে। কত নিরন্তর পানীর এবং যুগে যুগে আগত। (৩০) যারা বিশ্বাস হ্রাসন করে এবং সহ-কর্ম প্রদান করে আমি সংস্কারীদের পুরস্কার

নষ্ট করি না। (৬১) তাদেরই জন্য আছে মসজিদের আরাতি। ভরদল পালনেন দ্বিগুণ প্রবাহিত হইল নহরসমূহ। তাদের ভাষায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হইল এবং তারা পাড়লা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করিলে এমনভাবেই যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হইল। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।

ফকসীকর আর-সংক্ষেপ

এবং (আপনাকে কাজ এতটুকু যে) আপনায় প্রতি আপনায় পালনকর্তার এই কিতাব দাখিল করা হয়েছে, তা (লোকদের সামনে) পাঠ করুন। (এর বেশি চিন্তা করবেন না যে, বড় লোকেরা যদি ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে ইসলামের উন্নতি কিতাবে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর ওয়াদা করেছেন। এবং, তাঁর বাক্যকে (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে) কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। (অর্থাৎ সারা বিশ্বের বিরোধিতা যিলেও আল্লাহকে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। আল্লাহ নিজে যদিও পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি পরিবর্তন করবেন না।) এবং (যদি আপনি আল্লাহর বিধান বর্তমানে বড়লোকদের মনোরঞ্জন করেন, তবে) আপনি আল্লাহ বাতীত কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (শরীরতের প্রমাণিত ভিত্তিতে আল্লাহর বিধান বর্তন করা মুসলিমাহ (স)-র পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখানে ভাকীদের জন্য অসম্ভবকে খর নেওয়ার পর্যায়ে একথা বলা হয়েছে।) এবং (আপনাকে যেমন কাকিরদের ধনী ও বড়লোকদের দিক থেকে বেপারওয়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমন মুসলমান নিজেদের অবস্থার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে। সুতরাং) আপনি নিজেদের সঙ্গে (উঠাবসার) আবদ্ধ রাখুন, যারা সৎ-সৎ-সৎ (অর্থাৎ সব সমস্ত) তাদের পালনকর্তার ইবাদত শুধু তাঁর সৃষ্টি অর্জনের জন্য করে (কোন পাখিব উদ্দেশ্যে নয়) এবং পাখিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি (অর্থাৎ মনোযোগ) ফিরিয়ে নেবেন না। (পাখিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে — অর্থ বড়লোকেরা মুসলমান হয়ে গেলে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এ আরতে বলা হয়েছে যে ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং আন্তরিকতা ও আনুগত্য দ্বারা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যেও আন্তরিকতা ও আনুগত্য থাকলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। (দরিদ্র মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে) এরূপ ব্যক্তির আবদার মানবেন না, যার মনকে আমি (তাঁর হঠকান্ধতার প্রতিশ্রুতি) আমার সম্মুখ থেকে গাফিল করে রেখেছি। সে নিজের প্রতিভার অনুসরণ করে এবং তাঁর এ অবস্থা (অর্থাৎ প্রতিভার অনুসরণ) সীমা অতিক্রম করেছে। আপনি (সে কাকির সরদারদেরকে ধরে দিন ১ (এ) সত্য (খ) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আশ্রয়। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক আর যার ইচ্ছা, কাকির থাকুক। (আমার কোন লাভ ক্ষতি নেই। লাভ ক্ষতি স্বয়ং তাঁরই। তা এই যে) শিশুর আমি জালিমদের জন্য (সোমকর) আশ্রয় প্রদত্ত করে রেখেছি, যার বলয় তাদেরকে পরিত্রাণ করে। (অর্থাৎ বলয়ভুক্ত আশ্রয়িতা তৈরি।) হাদীসে রয়েছে,

ভাল এই খল্লার প্রতিশ্রুতি করতে পারবে না!) যদি ভাড়া (সিগাসার কালার হতে) পানীয় গ্রহণ করা করে, তবে এমন পানীয় দ্বারা তাদের গ্রহণা-পূর্ণ করা হবে, যা (কুত্বী হওয়ার সিক-দিয়ে) তেলের গায়ের মত হবে (এবং এত উত্তম হবে যে, কাছে আনতেই) মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। (কমল মুখমণ্ডলের চামড়া উঠে যাবে। হাদীসে খাই বলা হয়েছে।) কতই না নিকৃষ্ট হবে সে পানীয় এবং কতই না মন্দ জায়গা হবে সে দোষ। (এ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন না করার ক্রটি। এখন বিশ্বাস স্থাপন করার লাভ বঞ্চিত হচ্ছে—) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকল্প সম্পাদন করে, আলি সংকল্পী-দের প্রতিদান নষ্ট করি না। এমন মোক্ষদের জন্য সর্বদা স্বর্গবাসের বাগান রয়েছে। তাদের (বাসস্থানের) উল্লেখ করে প্রবাহিত হবে নহয়। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কাংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ পরিধেয় পরিধান করবে (এবং) সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে। কিছুকালের প্রতিদান এবং (আল্লাহ) কতই না উত্তম আশ্রয়।

জাযুদীক ভাটবা বিবরণ

সীওয়াত ও তাকসীনের বিশেষ রীতি : **وَأَمْرٌ نَفْسُكَ** এ আশ্রয়ের দানে-

মুখল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আশ্রাত অবতারের কারণ হতে পারে। বগতী বর্ণনা করেন, যাকার সন্নদার ওরায়না ইবনে হিন্স রসুল্লাহ (স)-র দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সাজমান ফারসী (রা) উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিল এবং আকার-আকৃতি ককৌরের মত ছিল। তাঁর মত আশ্রাত কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওরায়না বলল : এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনেও পারি না। এমন হিম্মত-মৌমুনের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আল্লাহ এবং তাদের জন্য আল্লাহ মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মকদুরাইহ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নেতৃত্বাধীনে বর্ণনা করেন যে, টুয়াইরা ইবনে মালক জমহী রসুল্লাহ (স)-কে প্রদান দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও হিম্মত মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না, বরং কুরাইশ সন্নদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ আশ্রাত অবতীর্ণ হয়—এতে তাদের প্রদান গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ৩য় নিষেধই নয়—আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, **وَأَمْرٌ نَفْسُكَ**—অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন।

এর অর্থ এরা নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিশ্চয় রাখুন। কাজে-কর্ম তাদের কাছ থেকেই পরিত্যাগ নিন।

এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত ও বিজ্ঞির করে। তাদের কার্যকলাপ একাত্তরতাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য থেকে জানে। আল্লাহর সাহায্যতাদের জন্যই আশ্রয় করে। কণহারী পুরুষরাঃ সেবে অধির হবেন না। পরিশেষে সাহায্য ও বিজ্ঞর তারাই লাভ করবে।

কুরাশ সন্ন্যাসীদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আল্লাহের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহর সম্মুখ থেকে পাকিত এবং তাদের সমস্ত কার্য-কলাপ তাদের খোলাস-খুশীর অনুসারী। এ সব অবস্থা মানুষকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে গ্রন্থ হয় যে, তাদের জন্য আজাদা মজলিস করার পরামর্শটি ভেদ গ্রহণ-যোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হত। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বস্টনের মধ্যে অবস্থা ধনীদেব প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন থেকে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেন নি এবং এ ব্যাপারে পাকতা না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

জাহাতিদের অলংকার : — يَحُلُونَ زِينَةً — এ আয়াতে জাহাতি পুরুষ-

দেরকেও স্বর্ণের কংকন পরিধান করানোর কথা বলা হয়েছে। এতে গ্রন্থ উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজসজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিভ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে থাকে শোভা ও সৌন্দর্য মানে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তাকে স্থাপন বস্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনভাবে এক সময় কোন বিশেষ বস্ত সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মানে করা হয়। জাহাতি পুরুষদের জন্যও অলংকার এবং রেশমী বস্ত শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরি-চিত্ত হৈতবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোন অলংকার এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনভাবে রেশমী বস্তও পুরুষদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু জাহাতি পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۖ كَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ اثْنَتَا

أَكَلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، وَفَجَرْنَا خِلَافَهَا نَهْرًا ۖ وَكَانَ لَهُ
 نَهْرٌ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاعْتَرَى
 نَهْرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن
 تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَلَئِن رُّدِدتْ
 إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ
 وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ
 نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
 بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ
 لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، إِن تَرَىٰ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ
 فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۖ أَوْ يُصْبِحَ مَا وَهَا
 غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۖ وَأَحْيَيْتُ بِمِثْرِهِ فَأُصْبِحَ بِقَلْبٍ
 كَفِيِّهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ
 بَلَيْتُ الَّذِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۖ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ
 الْحَقِّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۖ

(৩২) তুমি উহাদের নিকট পেশ কর দুই ব্যক্তির উপমা : উহাদের একজনকে আমি দিয়েছিলাম
 দুইটি দ্রাক্ষা-উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই
 দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র । (৩৩) উভয় উদ্যানই ফলদান করিত

এবং তা থেকে কিছুই চ্যাস করত না এবং উভয়ের কাঁধে কাঁধে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (৬৬) সে ফল পেল। অতঃপর কথা এসে সন্নীকে বলল : আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলও আমি অধিক শক্তিশালী। (৬৭) নিজের প্রতি কুলুঙ্গ করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল : আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৬৮) এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৬৯) তার সন্নী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল : তুমি তাঁকে জব্বীকর করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? (৭০) কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মনি না। (৭১) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সম্ভানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে না : আল্লাহ যা চেনে, তাই হয়। আল্লাহর দেওয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৭২) আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আত্মন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা খরিকার ময়দান হয়ে যাবে। (৭৩) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তাল্লাশ করে জানতে পারবে না। (৭৪) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে পেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কতমিরে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানেটি কঠিনই পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (৭৫) আল্লাহ ব্যতীত তার সাহায্য করার কোন লোক হয় না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (৭৬) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহর। তাইই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান সেরা।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আগনি (দুনিয়ায় ক্ষণভঙ্গুরতা ও পরকালের স্থায়িত্ব প্রকাশ করার জন্য) দু'নিমিত্তক উদাহরণ (মাদের মধ্যে বহুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল) বর্ণনা করল (যাতে কাকিম্বদেহ ধারণা ব্যক্তিগত হয়ে যায় এবং মুসলমানরা সান্ত্বনা লাভ করে)। তাদের এক জনকে (যে ধর্মবিমুখ ছিল) আমি আদুয়ের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে পূর্বের বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং উভয় (বাগান) এর মাঝখানে করেছিলাম লম্বাছের। উভয় বাগান পুরোপুরি ফলদান করত এবং কোনটির ফলেই সামান্যও দু'টি হত না (সাধারণ বৃক্ষ এর বিপরীত। কোন সময় কোন বৃক্ষে এবং কোন বছর সব বৃক্ষে ফল কম আসে।) এবং উভয় বাগানের কাঁকে কাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম। তার কাছে আরও ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর (একদিন) সে সন্নীকে কথা এসে বলল : আমার ধনসম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলও আমি অধিক শক্তিশালী। (উদ্দেশ্য এই যে, তুমি আমার পথকে ব্যক্তিগত এবং আল্লাহর কাছে অগ্রাহ্যনীর বলে থাক। এখন তুমি নিজেই

সেই মাও যে, কে ভাঙে? তোমার দাবী সঠিক হলে বাগান উন্টো হত। কেননা, শত্রুকে কেউ বৈশিষ্ট্য দান করে না এবং বন্ধুকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করেনা।) এবং সে (কাজীকে সাথে নিয়ে) নিজের উপর অপরাধ (কুফর) প্রতিষ্ঠিত হক্কতে হক্কতে বাগানে প্রবেশ করল (এবং) বলল: আমি তো মনে করি না যে, এই কাফর (আমার জীবদ্দশায়) কক্ষমও করবদি হয়ে যাবে। (এ থেকে বোঝা গেল যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরতে বিশ্বাসী ছিল না। শুধু বাহ্যিক হিক্মতের ব্যবস্থা দেখে সে একথা বলেছে)। এবং (এমনিভাবে) আমার মনে হয় না যে, কিরামত হবে এবং যদি (অসম্ভবকে সম্ভব নেওয়ার পর্যায়ে) কিরামত হয়েই যায় এবং আমি আমার পালনকর্তার কাছে পৌঁছানো হই (যেমন, তুমি মনে কর) তবে অবশ্যই এ বাগানের চাইতে অনেক উত্তম জায়গা আমি পাই। কেননা, আল্লাহের জায়গা যে দুনিয়া থেকে উত্তম, তা তো তুমিও স্বীকার কর। এক্ষণে তুমি স্বীকার কর যে, জাহ্নাত আল্লাহর প্রিয় বাগান। আমি যে প্রিয় এর লক্ষণাদি তো দুনিয়াতেই দেখতে পাই। আমি আল্লাহর প্রিয় না হলে এমন বাগান কিরূপে পেতাম। তাই তোমার স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও আমি সেখানে দুনিয়ার চাইতে উত্তম বাগান পাই। (তার এসব কথা শুনে) তান্ন (সীনদার দমিত্র) সর্বাংকল-ইচ্ছা কি (তুওহীদ ও কিরামত অস্বীকারের মাধ্যমে) তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি থেকে [হম্বত আদম (আ)-এর মধ্যস্থতার] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তোমাকে) বীর্ষ থেকে (মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং) অতঃপর তোমাকে সুস্থ-সবল মানুষ বানিয়েছেন? (এতদসত্ত্বেও তুমি যদি তুওহীদ ও কিরামত অস্বীকার করতে চাও কর) কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং আমি তাঁর সাথে কড়িকে শরীক করি না। (আল্লাহ্ একম্ব ও কুদরত যখন প্রত্যেক যত্নর উপর প্রতিষ্ঠিত তখন বাগানের উন্নতি ও হিক্মতের সব ব্যবস্থা যে কোন সময় অবৈজ্ঞানিক হয়ে বাগান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখাই তোমার উচিত ছিল।) তুমি যখন তোমার বাগানে পৌঁছেছিলে, তখন একথা কেন বললে না যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয় (এবং) আল্লাহ্ সাহায্য ব্যতীত (কারণও) কোন শক্তি নেই। (যত দিন আল্লাহ্ চাইবেন, এ বাগান থাকবে এবং যখন চাইবেন ধ্বংস হয়ে যাবে)। যদি তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সম্ভানে কম দেখ (যে কারণে তুমি নিজেকে প্রিয় মনে করছ), তবে আমি সে সমস্তটি নিকটবর্তী দেখছি, যখন আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগানের চাইতে উত্তম বাগান দেবেন (দুনিয়াতেই কিংবা পরকালে) এবং তার (অর্থাৎ তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে কোন নির্দানিত বিপদ (অর্থাৎ সাধারণ কারণাদির মধ্যস্থতা ছাড়াই) প্রেরণ করবেন। ফলে বাগানটি হঠাৎ একটি পলিকার মরদান হয়ে যাবে অথবা তার পানি (যা নহলে প্রবাহিত রয়েছে) সম্পূর্ণ মিলে (ভূগর্ভে) নেমে (তুকিয়ে) যাবে। অতঃপর তুমি (তা পুনর্বীর আনার ও বের করার) চেষ্টাও করতে পারবেন। (এখানে ধার্মিক সর্বাংকল-ইচ্ছার বাগানের জওয়ার দিচ্ছে), কিন্তু সম্ভান সম্পর্কে কোন জওয়ার দেয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সম্ভানের প্রাপ্ত তখনই সুখকর হয় যখন তাদের জাজন-পালনের জন্য প্রচুর অর্থ-সম্পদ থাকে। অন্যথায় তা বিপদ বৈ নয়। এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তোমাকে

ধনৈর্ঘর্য দান করেছেন, এটাই তোমার কৃতিত্বস্বরূপ হওয়ার কারণ। ধন-সম্পদকে তুমি আল্লাহর প্রিয় হওয়ার লক্ষণ মনে করে নিয়েছ এবং আমার ধন-সম্পদকেই বলে তুমি আমাকে আল্লাহর অপ্রিয় মনে করছ। দুনিয়ার ধনদৌলতকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার ভিত্তি মনে করাটাই বড় ধোঁকা ও বিভ্রান্তি। আল্লাহ রাসুল আলামীন দুনিয়ার নিরাময়ত সাফ, বিহু, বাহু ও দুকর্মী সবাইকে দান করেন। পরকালের নিরাময়তই আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার আসল মাপকাঠি। পরকালের নিরাময়ত অক্ষর এবং দুনিয়ার নিরাময়ত ধ্বংসশীল) এবং (এই কথাবার্তার পর ঘটনা এই ঘটল যে) তার সব ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কঠমিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি, কঠাঘোসহ জুমিমাৎ হয়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : হায় আমি যদি কাউকে আমার পাকনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (এ থেকে জানা গেল যে, বাগান ধ্বংস হওয়ার পর তার বুঝতে বাকী রইল না যে, কুকর ও শিরকের কারণেই এ বিপদ এসেছে। কুকর না করলে প্রথমত বোধ হয় এ বিপদই আসত না, আর এলেও তার প্রতিদান পরকালে পাওয়া যেত। এখন ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। কিন্তু এতটুকু আফসোস ও পরিতাপ দ্বারা তার ইমান প্রমাণিত হয় না। কেননা এই পরিতাপ দুনিয়ার ক্ষতিকরফলপ্রসূ হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর হুকুমী ও কিয়ামতের স্বীকৃতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুসলিম বলা যায় না।) এবং আল্লাহ বাতীত তাকে সাহায্য করার কোন চোকজন হল না (সে নিজের জনবল ও সন্তানাদির উপর নির্ভর করত, তাও শেষ হল।) এবং সে-নিজ (আমার কাছে থেকে) প্রতিশোধ নিতে পারল না। এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা একমাত্র সত্য আল্লাহরই কাজ। (পরকালেও) তারই সওয়াব সর্বোত্তম এবং (দুনিয়াতেও) তাঁরই পুরস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ প্রিয় বালাদের কোন ক্ষতি হয়ে গেলে উভয় জাহানে তার শুভ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কাকির পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।

আনুমানিক জাতিসংখ্যা বিবরণ

وَمَنْ لَّهُ ثَمَرٌ - وَمَنْ لَّهُ ثَمَرٌ শব্দের অর্থ ফলের ফল এবং সাধারণ ধনসম্পদ। এখানে ব্যবহৃত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে ভিত্তীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর) কায়ুস গ্রন্থে আছে, ثَمَر শব্দটি ফলের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থ ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-বাসনের ব্যবহার্য সামগ্রীসমূহও বিদ্যমান ছিল। সত্ত্বেও তার বাক্য, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে مَا أَكْثَرَ مَالًا এ অর্থই বোঝায়।

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - শা'আবুল ইবনে হক্কাম আলানাসের রেওয়ায়েত

ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে

পান্নবে মা। (অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে) কোন কোন জেঞ্জারোতে আছে; প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চেষ্টা কাগা' বা খবদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حَسْبَانَا—হমরত কাতাদাহর মতে এর তরসীর আশাব। ইবনে আব্বাস এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রভুর বর্ষণ। **أُحِيطُ بِثَمَرِهِ** এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধনসম্পদের উপর কোন নৈসগিক বিপদ পড়িত হয়। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেলে। কোরআন পরিষ্কার ভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোচ্চারণ করেনি। বাহ্যিক বোঝা যায় যে, কোন নৈসগিক আশুন এসে সবগুলো জাতিতে দিলেই। যেমন, হমরত ইবনে আব্বাস থেকেও **حَسْبَانَا** শব্দের তরসীরে আশুনই বর্ণিত আছে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝
 الدُّنْيَا وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝
 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَاعْرِضْهُمْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَاءً لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝
 وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَبِّلُنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

(৪৫) তাদের কাছে পাখিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায় বা আমি আকাশ থেকে নাইল করি। অতঃপর এর সংযিক্তে শ্যামল-সবুজ ভূমিজ স্তম্ভ-পাতা নির্মিত হয়, অতঃপর তা এমন শুষ্ক-চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিময়। (৪৬) ধৈর্য ও সন্তান-সন্ততি পাখির জীবনের সৌন্দর্য এবং দ্বারা সংকর্যসমূহ আগন্তর পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্যন্তসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্র করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। (৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে গেল হবে গল্প-বহুভাবে এবং সলা হবে : তোমরা আমার কাছে এসে দেখ, যেমন হোমসদেরক প্রথম বার সুনীত করেছিলাম। না, তোমরা তা বলাতে রে, আমি তোমাদের জন্য কেবল প্রতিরূত প্রথম নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলমায় সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণ আপনি প্রপরার্থীদেরকে ভীত-সঙ্কত দেখাবেন। তারা বলবে : হার আকসোস, এ কেমন আমলমায়। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই খাদ সেরনি — সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আখনার পালনকর্তা কারও প্রতি ক্ষম করবেন না।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইতিপূর্বে পাখিব জীবন ও তার কণ্ডলুরতা একটি ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছিল। এখন এ বিষয়টিই একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কৃষ্টিয়ে তোলা হচ্ছে।) আপনি তাদের কাছে পাখিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন, তা পানির ন্যায় বা আমি আকাশ থেকে নাইল করি। অতঃপর এর (পানি) দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ মূব ঘন হয়ে উঠে। অতঃপর তা (সে সবুজ-শ্যামল ও তরতাজা হওয়ার পর শুকিয়ে) এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। (দুনিয়ার অবস্থাও তাই। আজ সুখ-স্বাস্থ্যসে অতঃপর দেখা গেলে কাজ তার ন্যম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।) আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর শক্তিময়। (যখন ইচ্ছা, সৃষ্টি করুন—উন্নতি দান করেন এবং যখন ইচ্ছা, ধ্বংস করে দেন। পাখিব জীবনের যখন এই অবস্থা এবং ধৈর্য ও সন্তান-সন্ততি (যখন) পাখিব জীবনের শোভা (এবং তারাই আনুষঙ্গিক বিষয়ের অতঃপর, যখন যখন ধৈর্য ও সন্তান-সন্ততি তো আরও বেশী দ্রুত ধ্বংসনীয় হবে।) এবং হীর সংকর্যসমূহ আপনার পরওয়ারদিসারের কাছে (অর্থাৎ পরকালে এ দুনিয়ার চাইতে) প্রতিদানের দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম এবং আশার দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম। (অর্থাৎ সংকর্য দ্বারা যেসব আশা করা হয়, সেগুলো পরকালে অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং আশার চাইতেও বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আসবাবপত্র এর বিপরীত। এর দ্বারা দুনিয়াতেও মানুষের আশা পূর্ণ হয় না এবং পরকালে তো আশা পূরণের কোন সম্ভাবনাই নেই।) সেদিনের কথা স্মরণ করা উচিত, যেদিন আমি পাহাড়গুলো (তাদের অবস্থান থেকে) সরিয়ে দেব (প্রথমে এরূপ হবে। তদনন্তর পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

যাবে।) এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর (কেননা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষজাতা, বন্যবাফী ইত্যাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না) এবং আমি সহাইকে (কবর থেকে উদ্ধৃত করে হাশরের মরদায়ে) সমবেত করব এবং (সেখানে না এনে) তাদের কাউকে হাড়বে না। তারা সবাই আপনার পালনকর্তার সামনে (অর্থাৎ হিসাবের কাঠ-পড়ার) সান্নিধ্যভাবে গেল হবে (কেউ কারও আড়ালে আশ্রয়গণন করার সুযোগ পাবে না। তাদের মধ্যে যারা ক্রিয়ামত অস্বীকার করত, তাদেরকে বলা হবেঃ) দেখ শেষ পর্বত তোমরা আমার কাছে (পুনর্জন্ম লাভ করে) এসেছে, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৃষ্টি করেছিলাম (কিন্তু তোমরা প্রথম জন্ম দেখা সত্ত্বেও ঐ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হওনি) বরং তোমরা মনে করতে যে, আমি তোমাদের (পুনরায় সৃষ্টির জন্য) কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা (তখন হাতে অথবা বাঁধ হাতে দিয়ে তার সামনে) রেখে দেওয়া হবে, (যেমন, অন্য এক আরয়েত

আছে وَنُفْرَجُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا بَالِقًا مَّذْهُورًا) তখন আপনি অপ-রাধীদিগকে দেখবেন যে, তাতে যা কিছু (লিখিত) আছে, (তা দেখে) তাঁর কপিলে (অর্থাৎ তার শাস্তির কারণে) ভীত-সন্তুষ্ট হচ্ছে। তারা বলবেঃ হার আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি। তারা যা কিছু (দুনিয়াতে) করেছিল, সব (লিখিত আকারে) উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতিজ্ঞা কল্পবেন না। (যে কথা হয়নি, এমন গোনাহ্ লিপিবদ্ধ করবেন অথবা শর্তাদিসহ যে সং কাজ করা হয়, তা লিপিবদ্ধ করবেন না।)

আল্‌ফরাক আতক বিবরণ

وَالْقِيَامَاتُ الْمَلَكَاتُ

—যখনদে আয্যাম, ইবনে হাইয়ান ও হাকিম হযরত আবু সাঈদ মুদরীর বাচনিক বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যত বেশী সত্য **بَاقِيَاتُ مَالِكَاتُ** অর্জন করা হয়, নিবেদন করা হয়, **مُهَيَّاتُ** **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **أَكْبَرُ** তিনি বলেনঃ

وَلَا هَوْلَ وَلَا تَوَلَّى لَا بَاقِيَاتُ

ওকালনী নো'মান ইবনে বশীরের বাচনিক রসুলুল্লাহ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, **مُهَيَّاتُ** **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **أَكْبَرُ** —এভাবেই হচ্ছে

بَاقِيَاتُ مَالِكَاتُ —এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার বাচনিক

বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রাহ রাঃ আঃ আনহু হতে বর্ণিত।
(স)-এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**

إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

কলেমাটি আযান কাহে সেসব বস্তু চাইতে অধিক প্রিয়,

যেহাজের উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারা বিশ্বের চাইতে।

হযরত আবের বলেন : **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** কলেমাটি অধিক পরি-

মাণে পাঠ করা। কেননা, এটি রোগ ও কষ্টের নিরানকইটি অধ্যায় দূর করে দেয়।
তদুপরে সবচাইতে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই আমেতা আয়াতে **بِأَيِّهَا تَمْلِكُونَ** শব্দটির তুফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ ভাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরোক্ত কলেমা-সমূহ পাঠ করা বোঝানো হয়েছে। সারীদ ইবনে জুবায়র, মসরুফ ও ইবরাহীম বলেন যে, **بِأَيِّهَا تَمْلِكُونَ** -এর অর্থ গাজেগানা নামায।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর এক রেওয়াজেতে রয়েছে যে, **بِأَيِّهَا تَمْلِكُونَ** বলে উপরোক্ত কলেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে—তা গাজেগানা নামাযই হোক অথবা অন্যান্য সৎ কর্ম হোক—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ক্বাতিদাহ থেকে এ তুফসীরই বর্ণিত হয়েছে—(মামহারী)

এ তুফসীর কোরআনের শবাবলী ও অনুকূল বটে। কেননা, **بِأَيِّهَا تَمْلِكُونَ** -এর শাসনিক অর্থ হচ্ছে স্বামী সৎ কর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে স্বামী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জরীর, তাবারী ও কুরতুবী এ তুফসীরই গ্রহণ করেছেন।

হযরত আলী (রা) বলেন : শস্যের দু'রকম : দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যের হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি আর পরকালের শস্যের হচ্ছে স্বামী সৎকর্ম-সমূহ। হযরত হাসান বসরী বলেন : **بِأَيِّهَا تَمْلِكُونَ** হচ্ছে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎ কর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওরয়েদ ইবনে উমর বলেন : **بِأَيِّهَا تَمْلِكُونَ** হচ্ছে নেক কন্যা সম্ভান। তারা গিতামাতার জন্য সর্বত্রই সওয়াবেয় প্রাপ্ত। রসুলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত হযরত আশেরার এক রেওয়াজেতে এর সমর্থন করে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি উল্লেখ্যের এক ব্যক্তিকে দেখছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল।

তারা আত্মাহুত কহে করিরাও করল : ইয়া আত্মাহু, তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালন-পালনে প্রয় স্বীকার করেছেন। তখন আত্মাহু তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।—(কুরতুবী)

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ — কিয়ামতের দিন সবাইকে বলা

হবে : আজ তোমরা এমনভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে ইব্রাহিম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসুলুল্লাহ (সঃ) এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন : লোকসকল, তোমরা কিয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পাবে, খালি শরীরে পাবে, হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। একথা শুনে হযরত আরেশা প্রমুখ হলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ, সব নারী-পুরুষই কি উলস হবে এবং একে অপসর্গকে দেখবে? তিনি বললেন : সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা দিবে যা হবে যে, কেউ কীর্তি প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবাইই নৃশিষ্ট থাকবে উপরের দিকে।

কুরতুবী বলেন : এক হাদীসে বলা হয়েছে, যুত্তরা বরযখে একে অপসর্গের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মৌজাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়াজে আছে, যুত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উদ্ভিষ্ট হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) বলেন : যুতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা তারা কিয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উদ্ভিষ্ট হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলস অবস্থায় উদ্ভিষ্ট হবে। এভাবে উত্তর প্রকার হাদীসের মধ্যে সম্মিলন সাধিত হয়ে যায়। —(মারহূমী)

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا — অর্থাৎ হাশর-কর্মনিবাহী প্রতিদান :

বাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তুফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। প্রক্টের উত্তর হযরত মাওজানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলতেন : এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ সব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎ কর্মসমূহ জাহান্নামের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ বিদ্ধ হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা হাকাত দের না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকারে ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে **إِنَّا مَالِي** আমি তোমার মাল। সং কর্ম সূত্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসর অবস্থার আভংক দূর করার জন্য আশ্রয় করবে। কোরবানীর শুভ পুণসিকাতের সওয়ারী হবে। মানুষের পোনাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথার চাপিয়ে দেওয়া হবে।

কোরআনে ইরাতীমের মাল অন্যায়ভাবে উদ্ধরণকারীদের সম্পর্কে **إِنَّمَا يَأْكُلُونَ**

فِي بَطُونِهِمْ ذَرَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা উদরে আঙন ডতি করছে। এসব আক্রান্ত ও রেওয়ারেতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হয়। উপরোক্ত বক্তব্য মনে নিল এগুলোতে রূপক অর্থের আভর নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আমল আছেই থাকি।

কোরআনে ইরাতীমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আঙন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনও আঙনই বাটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিল্লিশজাইর বাস্পকে আঙন বললে তা মিথ্যে হবে, কিন্তু এর সাহিকাপক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্মম শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্রোলকে আঙন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে, তবে এর অন্য আঙনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দীড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসং যেসব কর্ম করে, সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শাস্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোকে প্রতিক্রিয়া ও আক্রামত এ দুনিয়া থেকে ভিন্নরাপ হবে।

وَأَذِّنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلْإِدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
كَانَ مِنَ الْغِيثِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ يَتَّبِعُونَ الظَّالِمِينَ
بَدَلًا ۚ مَا أَشْهَدُتَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ
أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصِيدًا ۚ وَيَوْمَ يَقُولُ
ثَاوُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۚ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا

أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا ۖ وَقَدْ صَرَّفْنَا
 فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
 أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۖ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ
 الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ۚ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۖ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
 بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلِئِي مَا قَدْ مَتَّ
 يَدَاهُ مَتًّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
 وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا إِذَا أَبَدْنَا ۚ وَرَبُّكَ
 الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ
 الْعَذَابَ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ۖ
 وَذَلِكَ الْقَرَارُ ۚ هَذِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ
 مَوْعِدًا ۚ

(৫০) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বসায় : আমাকে সিদ্ধান্ত কর, তখন সমস্ত
 সিদ্ধান্ত করল ইব্রাহিম খাতীভ। হেহিম জিন্দার একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ
 অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবারে তাকে এবং তার বংশধরকে
 বধূরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের পর। এটা জাতিমানের জন্য খুবই বিরুদ্ধ
 বসল। (৫১) নতুনতল ও তুমুলের সূজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষা রাখিনি এবং
 তাদের নিজস্বের সূজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্য-
 কারীরূপে গ্রহণ করিব। (৫২) যে দিন তিনি বসবে : তোমরা তাদেরকে আমার পরীক্ষা

মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকে, কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের অধ্যক্ষকে রেখে দেব একটি যুত্ম গহবর। (৫৩) অপরাধীরা আতন দেবে বুথে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাত্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপহার দ্বারা আমার বাণী সুবিধেছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক উর্কগ্রিয়। (৫৫) হিদায়ত আসার পর এ প্রতীক্কাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের সীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আমার সমস্যা-সামনি। (৫৬) আমি রসূলগণকে সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরাগেই প্রেরণ করি এবং কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে অর্থ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও স্বপ্নারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ কিসিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বুখে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সং পথের প্রতি দাওরাত সেন, তবে কখনই তারা সং পথে আসবে না। (৫৮) আপনার পালনকর্তা ক্ষমানীল, দয়ালু; যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেন, তবে তাদের শাস্তি দ্বারাশ্রিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়; যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালিম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় মিলিষ্ট করেছিলাম।

তকসীরের সূরা-সংক্ষেপ

এবং (সে সময়টিও স্বরূপবোধ্য) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আমেশ দিলাম : আদম (আ)-কে সিঁজদা কর, তখন সবাই সিঁজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আমেশ অমান্য করল। (কেননা জিন সৃষ্টির প্রথম উপাদান হচ্ছে আতন। অগ্নোপাদানের তাগিদ হল অনুগত না থাকা। কিন্তু এ উপাদানজনিত তাগিদের কারণে ইবলীসকে ক্ষমাহ মনে করা হবে না। কারণ এ উপাদানজনিত তাগিদকে আত্মাহর ভয় দ্বারা পরাভূত করা সম্ভবপর ছিল।) অতএব এরপরও কি তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে (সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদেরকে) আমার পরিকর্তে বহুরূপে গ্রহণ করছ? (অর্থাৎ আমার আনুগত্য ত্যাগ করে তবু কথামত চলছ)? অথচ সে (ইবলীস ও তার দলবল) তোমাদের শত্রু। (সর্বদাই তোমাদের ক্ষতি করার চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে)। এটা অর্থাৎ ইবলীস ও (তার বংশধরের বহু) জালিমদের জন্য খুবই মন্দ বদল। ('বদল' বলার কারণ এই যে, বহুতো আমাকেই বানানো উচিত ছিল, কিন্তু তারা আমার বদলে শয়তানকে বহু বানিয়েছে; বরং শুধু

বন্ধুই নয়, তাকে আল্লাহর শরীকও মনে নিয়েছে। অথচ) আমি তাদেরকে ন্যায়মূল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির সময় (সাহায্য অথবা পরামর্শের জন্য) ডাকিনি এবং স্বয়ং তাদের সৃষ্টির সময়ও (ডাকিনি অর্থাৎ একজনকে পরদা ধ্বংসের সময় অন্যজনকে-ডাকিনি) এবং আমি এমন (অক্রম) নই যে, (কাউকে বিশেষ করে) বিব্রতকারীদেরকে (অর্থাৎ শয়তানদের) নিজ বাহবল বানাই। (অর্থাৎ সাহায্যের প্রত্যাশী সে-ই হয়, যে নিজে শক্তিশালী ও সক্রম নয়)। আর (তোমরা এখনে তাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে কর; কিরায়তে আসল হরণ জানা যাবে)। হরণ কর, যেদিন আল্লাহ তা'আলা (মুশরিকদেরকে) বলবেন : তোমরা তাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তাদেরকে (সাহায্যের জন্য) আহবান কর। তারা তাদেরকে আহবান করবে, কিন্তু তারা জবাবই দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে একটি আড়াল করে দেব। (যাতে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যার নতুবা আড়াল ব্যতীতও তাদের সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না)। অপরাধীরা সোমথকে দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তথ্য গতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে পরিত্রাণের কোন পথ পাবে না। আমি এই কোরআনে মানুষের (হিদায়তের) জন্য সব ন্যকম উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু নানাভাবে বর্ণনা করেছি। (এ সত্ত্বেও অবিশ্বাসী) মানুষ তর্কে সবার উপরে। (জিন ও জীবজন্তুর মধ্যে যদিও চেতনা ও অনুভূতি আছে, কিন্তু তারা এত তর্ক-বিতর্ক করে না)। হিদায়ত আসার পর (যার তাগিদ ছিল বিশ্বাস স্থাপন করা) মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে-এবং তাদের পালনকর্তার কাছে (কুফর ও গোনাহর জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করতে কোন কিছু বিরত রাখে না, কিন্তু এই প্রতীক্ষা যে, পূর্ববর্তী লোকদের (খারস ও আযাবের) নীতিনীতি তাদের কাছে আসুক অথবা তাদের কাছে আসবে সামনাসামনি আসুক। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অবস্থা থেকে এইই প্রতীক্ষমান হয় যে, তারা আযাবেরই অপেক্ষা করছে। নতুবা অন্য সব প্রমাণাদি তো পূর্ণ হয়ে গেছে)। আমি রসূলগণকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করি। (যার জন্য মু'জিযা ইত্যাদির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণাদি তাদের সাথে দেওয়া হয়। এর অভিন্নিত কোন কিছু তাদের কাছে করমায়েশ করা মুর্থতা)। এবং কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে যাতে তা দ্বারা সত্যকে বার্থ করে দেয়। তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং হাদীস (অর্থাৎ যে আযাব তারা) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, সেগুলোকে তাঁতীরূপে গ্রহণ করেছে। তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ হস্তবল দ্বারা বা কিছু (গোনাহ) সংকর করেছে, তাকে (অর্থাৎ তার পরিশ্রমকে) ভুলে যার? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেম তা (অর্থাৎ সত্য বিষয় তারা) না বোঝে এবং (তা শোনা থেকে) তাদের কানে হিপি এঁটে রেখেছি। (ফলে তাদের অবস্থা এই যে) আপনি যদি তাদেরকে সং পথের দিকে দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সং পথে আসবে না। (কেননা তারা কাদিয়ে সত্যের দাওয়াত শোনে না, অন্তর দ্বারা বোঝে না। কাজেই আপনি চিন্তা করবেন না)। এবং (আযাবের বিলম্ব দেখে) তারা যে মনে করেছে, আযাব আসবেই না, এর কসর এই যে, আপনীর পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু (তাই সবর দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয় ও বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া

যায়। নতুনা তাদের কার্যকলাপ এমন যে) যদি তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তি করাশ্রিত করতেন। (কিন্তু তিনি এরূপ করেন না)। তাদের (শাস্তির) জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় আছে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যার-এদিকে (অর্থাৎ পূর্বে) কোন আশ্রয়ের আশ্রয় পাবে না (অর্থাৎ সে সময়টি আসার আগে কোন আশ্রয়-স্থলে আশ্রয়গোপন করে তা থেকে পরিচাল্য পাবে না)। এবং (পূর্ববর্তী কাকিরদের ক্ষেত্রে এ রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সমস্ত) এসব জনপদ (যাদের কাকিনী প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত), যখন তারা (অর্থাৎ এসব অধিবাসীরা) জালিম হয়ে গিয়েছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে গিয়েছি এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করে-ছিলাম। (এমনিভাবে বর্তমান লোকদের জন্যও সময় নির্দিষ্ট রয়েছে)।

জনসংখ্যিক ভাষ্য বিবরণ

ইব্রাহীমের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরও আছে : **وَنُوحٍ**—এ বাক্য থেকে

বোঝা যায় যে, পরতানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন : এখানে **نُوحٍ** অর্থাৎ বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই পরতানের উত্তরজাতি সন্তানাদি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু হযরতী রচিত 'কিতাবুল জাযা বাইনাস সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসীর নেওয়ায়েতে উল্লিখিত একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন : তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না যারা সূরার আগ বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা বাজার এমন জায়গা, যেখানে পরতান ডিমবাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে পরতানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃতি করে কুরতুবী বলেন : পরতানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, একথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে, উত্তরজাতি সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدًّا—সমগ্র সৃষ্টিজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক

তুর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন কাকিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হবে : আমায় প্রেরিত রসুল সম্পর্কে তোমার কর্মগত কমন ছিল? সে বলবে : পরওয়ারদিগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমার আমলনামা সামনে রাখা রয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবে : আমি এই আমলনামা খানি না। আল্লাহ বলবেন : আমায় কেনে-তারা তোমার দেখানো করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে :

আমি তাদের সাক্ষাৎ মানিনি। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমার কন্ঠের সহায় তাদেরকে দেখিনি। আজাহ্ বলবেন, সামনে লওহে-মাহকুম রয়েছে। এতেও তোমার জবাব? এরপই সিদ্ধি রয়েছে। সে বলবে : পরওয়ারদিগার, আপনি আমাকে মূল্য থেকে আশ্রয় দিলেহেন কি না? আজাহ্ বলবেন : নিশ্চয় মূল্য থেকে ভূমি আমার আশ্রয় রয়েছে। সে বলবে : পরওয়ারদিগার, যেসব সাক্ষাৎ আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি জানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষাৎ হবে, আমি তাই জানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কক্ষর ও শিরক সম্পর্কে সাক্ষাৎ দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাসীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرُرُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي جَاءْتُكَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ۖ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّخَذَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَى أَنْ تَعْلَمِينَ مِنِّي عِلْمًا ۖ وَكَيْفَ تُصَدِّقُنِي مَا لَمْ يَحْضُرْ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَادِقًا وَلَا آغْوِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنِ اشْتَبَعْنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ

(৬০) যখন মুসা তাঁর শ্রমক (সঙ্গী)-কে বললেন : দুই সমুদ্রের সম্মুখীন না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সম্মুখীন পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা কুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (৬২) যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মুসা সঙ্গীকে বললেন : আমাদের নাস্তা জান। আমরা এই সফরে পরিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সে বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে প্রায় নিরেছিলাম, তখন আমি মাছের কথা কুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে কুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মুসা বললেন : আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বাসীদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মুসা তাঁকে বললেন : আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সভ্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে লেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (৬৭) তিনি বললেন : আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আরম্ভাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মুসা বললেন : আল্লাহ্ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন : যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে সমস্তটি স্মরণ কর, যখন মুসা (আ) নিজের খাদেমকে [তাঁর নাম ছিল 'ইউশা' (বোখারী)] বললেন : আমি (এই সফরে) অনবরত চলতে থাকব, যে পর্যন্ত না সে স্থানে পৌঁছে যাই, যেখানে দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়েছে, অথবা এমনই যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। এই সফরের কারণ ছিল এই যে, একবার মুসা (আ) বনী ইসরাঈলের সভায় ওয়াজ করলে অনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচাইতে ভানী কে? তিনি বললেন : আমি। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহর নৈকট্য-লাভে যেসব জ্ঞান সহায়ক, সেগুলোতে আমার সমান কেউ নেই। এটা বলা নির্ভুল ছিল। কেননা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার একজন মহামুত্ত্ব পরগড়ন ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সমান কেউ ভানী ছিল না। কিন্তু বাহ্যত তাঁর এ উজ্জ্বল অর্থ দাঁড়ায় ব্যাপক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কথাবার্তার সতর্কতা শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হল : দুই সমুদ্রের সম্মুখীন অবস্থানকারী আমার এক রাস্তা আপনার চাইতে অধিক জানের অধিকারী। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কতক বিষয়ে সে আপনার চাইতে

অধিক জ্ঞান রাখে, যদিও আল্লাহর নৈকট্যলাভে সেগুলো সহায়ক নয়। কিন্তু এর ভিত্তিতে জওয়াবে নিজকে 'অধিক জানী' বলা উচিত হয়নি। একথা শুনে মুসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ তাঁ'আলা বললেন : একটি নিম্নাপ মাছ সাথে নিয়ে সফর করুন। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সে বান্দার সাক্ষাত পাবেন।

তখন মুসা (আ) 'ইউশা'-কে সাথে নেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। অতঃপর যখন (চলতে চলতে) তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, [তখন সেখানে একটি প্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি আল্লাহর আদেশে জীবিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হল। 'ইউশা' আগ্রহ হয়ে মাছটি পেলেন না। ইচ্ছা ছিল, মুসা (আ) আগ্রহ হলে তাঁকে জানাবেন। কিন্তু একথা তাঁর মোটেই স্বপ্নও ছিল না। সম্ভবত পরিবার-পরিজন ও দেশের চিন্তা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। নতুবা এমন আশ্চর্যজনক বিষয় ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সদাসর্বদা মুজিয়া প্রত্যক্ষ করে, তার মন থেকে কোন চিন্তার কারণে নিম্নপর্যায়ের আশ্চর্যজনক বিষয় উধাও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মুসা (আ)-র জিজ্ঞেস করার সুযোগ হল না। এভাবে] তাঁরা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং মাছটি (ইতিপূর্বে জীবিত হয়ে) সমুদ্রে পথ করে চলে গেল। অতঃপর যখন তাঁরা (সেখান থেকে) সন্মুখে এগিয়ে গেলেন (এবং অনেক দূরে পৌঁছে গেলেন) তখন মুসা (আ) খাদেমকে বললেন : আমাদের বাশ্তা আন। আমরা এই সফরে (অর্থাৎ আজকের মনমিলে) অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পূর্বকার মনমিলসমূহে এত ক্লান্ত হইনি। এর কারণ বাহ্যত গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে যাওয়া ছিল। খাদেম বলল : আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন কি (যে, এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেছে), যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের নিকটে অবস্থান করছিলাম, (এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন মাছটির একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে জানান, কিন্তু আমি অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে) তখন মাছের (আলোচনায়) কথা ভুলে গিয়েছিলাম। পরতানই আমাকে এ কথা স্বপ্নরূপে ব্রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। (ঘটনা এই যে) মাছটি জীবিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (এক আশ্চর্যজনক বিষয় তো ছিল মাছটির জীবিত হওয়া। দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল এই যে, মাছটি সমুদ্রে যে পথ দিয়ে চলেছিল, সেই পথের পানি অলৌকিকভাবে সুডুজের মত হয়ে গিয়েছিল। পরে সম্ভবত সুডুজ বন্ধ হয়ে গেছে।) মুসা [(আ) এ কাহিনী শুনে বললেন] আমরা তো এ স্থানটিই হুঁজুছিলাম (সেখানেই ক্রিমে যাওয়া উচিত)। অতঃপর তাঁরা নিজদের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরে চলে গেলেন (সম্ভবত রাস্তাটি সড়ক ছিল না, তাই পায়ের চিহ্ন দেখতে হয়েছে)। অতঃপর (সেখানে পৌঁছে) তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের (অর্থাৎ খিমিরের) সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি বিশেষ রহমত (অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি) দান করেছিলাম (রহমতের অর্থ বেলায়েত ও মনুরাত উভয়টি হওয়া সম্ভবপর) এবং আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যম হাড়াই) শিখিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান। [অর্থাৎ হুন্টিয়হস্যর জ্ঞান। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা জানা যাবে। আল্লাহর নৈকট্য-

জাভে এই জানের কোন প্রভাব নেই। যে জান নৈকট্যলাভে সহায়ক, তা হচ্ছে আল্লাহর রহস্যের জান। এতে মুসা (আ) অপ্রণী ছিলেন। মোটকথা মুসা (আ) তাঁকে সলাম কর-
জেন এবং তাঁকে বললেন : আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি (অর্থাৎ আমাকে আপনার
সাথে থাকার অনুমতি দিন) এই শর্তে যে, যে উপকারী তান আপনাকে (আল্লাহর পক্ষ
থেকে) দেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? তিনি বললেন : আপনি
আমার সাথে থেকে (আমার ক্রিয়াকর্ম) ধৈর্য ধরতে পারবেন না (অর্থাৎ আপনি আমার
কার্যকলাপের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করবেন। শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে শিক্ষার্থী
শিক্ষককে অনুপ্রাণিত ও অসমরোচিতভাবে প্রশ্ন করলে তা অনধিকার চর্চা হয়ে পড়ে
এবং ফলে সহঅবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে)। এমন বিষয় সম্পর্কে (এরকম ব্যাপারে)
আপনি কি করে ধৈর্য ধরবেন, যা আপনার জানের আওতার বাইরে (অর্থাৎ কানূন জানা
না থাকার কারণে বিষয়টি বাহ্যত শরীয়তবিরোধী মনে হবে। আপনি শরীয়তবিরোধী
কাজে চুপ থাকতে পারবেন না।) মুসা (আ) বললেন : (না) ইনশাআল্লাহ আপনি
আমাকে ধৈর্যশীল (অর্থাৎ সংযমী) পাবেন এবং আমি আপনার কোন জামিন অমান্য
করব না। (উদাহরণত বাধা দিতে নিষেধ করলে বাধা দেব না। এমনভাবে অন্য
কোন বিষয়েও বিরুদ্ধাচরণ করব না)। তিনি বললেন : (আচ্ছা) যদি আপনি আমার
সাথে থাকতে চান, তবে (লক্ষ্য রাখবেন যে) আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে
গর্ভস্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِفَتٰىهٖ ؕ—এ ঘটনার ‘মুসা’ বলে প্রসিদ্ধ পরগণার হযরত

মুসা ইবনে ইয়রান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। নওফল বাচ্চাজী অন্য এক মুসার সাথে
এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে
তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

فتى—এর শাব্দিক অর্থ সুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ
করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী সুবক দেখে খাদেম
স্বাধা হয়, যে সবলত্বকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে সুবক বলে ডাকা একটি
ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে
সম্বোধন করা না। বরং ভাল খেতাব দারা ডাক। এখানে فتى শব্দটিকে মুসা (আ)-র
দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মুসা (আ)-র খাদেম। হাদীসে বর্ণিত
রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা ইবনে নুন ইবনে ইফরারীম ইবনে ইউসুফ (আ)। কোন
কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, সে মুসা (আ)-র ভাগ্নের ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন
চূড়ান্ত ফরসালো করা যায় না। সহীহ্ রেওয়াজেতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল
ইউশা ইবনে নুন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।—(কুরতুবী)

مجمع البحرین — এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সমন্বয়। বলা বাহুল্য,

এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন্ জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদিসূচীতে তরুণীরবিশদদের উক্তি বিস্তারিত। কাতাদাহ বলেন : পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সমন্বয় বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও জুমহাসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন : এ স্থানটি তুর্কায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুন্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ার অবস্থিত (অনেকের মতে বাহর-আন্দালুস ও বাহর মুহীতের সমন্বয়ই হচ্ছে এই স্থান। মোট-কথা, এটা যতঃসিক যে, আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। — (কুরতুবী)

হযরত মুসা (আ) ও খিজিরের কাহিনী : সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : একদিন হযরত মুসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : সব মানুষের মধ্যে অধিক ভানী কে? হযরত মুসা (আ)-র জানামতে তাঁর চাইতে অধিক ভানী আর কেউ ছিল না। তাই বলেন : আমি সবার চাইতে অধিক ভানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়ান তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক ভানী। এ জওয়ানের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা (আ)-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সমন্বয়ে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আগনার চাইতে অধিক ভানী। [একথা শুনে মুসা (আ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক ভানী হলে তাঁর কাছ থেকে ভান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত]। তাই বললেন : ইয়া আল্লাহ আমাকে তাঁর তিকনা বলে দিন। আল্লাহ বললেন : খলিয়ার মধ্যে একটি মাহ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সমন্বয়ের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছায় পর মাহটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাফাতি পাবেন। মুসা (আ) নির্দেশমত খলিয়ার একটি মাহ নিয়ে রওজানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নুনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রকটখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা দুয়িয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাহটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং পলিমা থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাহের জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মু'জিয়া এই প্রকাশ পেল যে) মাহটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বদ্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরী-কণ করেছিল। মুসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন আগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে নুন মাহের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন। এবং সেখান

থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আ) ঋদেয়কে বললেন : আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্ষান্ত হয়ে পড়েছি। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : পদ্মবাহুল অতিক্রম করার পূর্বে মুসা (আ) মোটেই ক্ষান্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নুনর মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওষু পেশ করে বলল : শরতান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল : যুত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আ) বললেন : সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল পদ্মবাহুল)।

সময়ে ভৎসনাও তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। - প্রসঙ্গান্তরে নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আগাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মুসা (আ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিমির (আ) বললেন : এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আ) বললেন : আমি মুসা। হযরত খিমির প্রসন্ন হলেন : বনী ইসরাঈলের মুসা? তিনি জওয়াব দিলেন : হ্যাঁ, আমি বনী ইসরাঈলের মুসা। আমি আগনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিমির বললেন : আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। যে মুসা, আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আগনার কাছ থেকে নেই, পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মুসা (আ) বললেন : ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিমির বললেন : যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে এককি নৌকা এসে গেছে, তাঁরা নৌকার আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিমিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকার চড়েই খিমির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মুসা (আ) (হির থাকতে পারলেন না—) বললেন : তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিমির বললেন : আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মুসা (আ) ওষু পেশ করে বললেন : আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি ক্রটি হবে না।

রসুলুল্লাহ (সা) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : হযরত মুসা (আ)-র প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল (ইতিবাখ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু

পানি তুলে নিজ। খিযির মুসা (আ)-কে বললেন : আমার ডান এবং আপনার ডান উভয়ে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের সুকাবিলার এমন তুলনাও হয়না যেমনটি এ'পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির সহস্বে বালকটির মৃত্যুক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মুসা (আ) বললেন : আপনি একটি নিষাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহর কাজ করলেন! খিযির বললেন : আমি তো পূর্বই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাগেচ্ছা শুরুতর। তাই বললেন : এরপর যদি কোন প্রহ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওয়র-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পত্তনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মুসা (আ) বিস্মিত হয়ে বললেন : আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন, ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন :

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ — অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও

আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনার সময় স্বরূপ মুসা (আ)-র কাছে বর্ণনা করে বললেন : ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا — অর্থাৎ এ হচ্ছে সে সব ঘটনার স্বরূপ, যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করে বললেন : মুসা (আ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের আরও কিছু জানা যেত।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মুসা বলতে বনী ইসরাঈলের পরগম্বর মুসা (আ) এবং তাঁর সুবক সঙ্গীর নাম ইউশা ইবনে নুন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে মুসা (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিযির (আ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

সকরের কতিপয় আদব এবং পরগম্বরসুভত সংকরের একটি মন্বন :

لَا أُبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْشِيَ حُقُبًا — বাক্যটি হযরত

মুসা (আ) তাঁর সঙ্গী সঙ্গী ইউশা ইবনে নুনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সকরের দিক ও

পদ্মবাসন সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাসেম ও পরিচালকদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না।

حَقِيقَةً شَرَفِيَّةً এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আমি বহুরে এক হকবা। কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হকবা হয়। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মুসা (আ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সমন্বয়ে পৌঁছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাভক, পদ্মবাসনে না পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ তা'আলার আদেশ থাকলে পরসম্মতদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে মুসা (আ)-র স্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সুজিহা :

قَلَمًا بَلَّغًا مَجْمَعٍ بَيْنَهُمَا نَسِيًا حَوْثُمًا فِي تَخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَصَرِ سَرَبًا

কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মুসা (আ) পরগণার কূলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথাপকষ-নের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তাঁর কোন প্রহু নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মুসা (আ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বা-বহার বহুতাপে ব্রহ্ম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যবীমদের সামান্যতম হুটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম হুটির জন্যও তিরস্কার করা হয় এবং সে যোগ্যতাইতেই তাঁদের দ্বারা হুটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জানী' মুসা (আ)-র মুখ থেকে অসম্ভব মুহূর্তে একথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তা অগ্ৰহণ করেন। তাঁকে হ'শিয়ায় করার জন্য এমন এক বাঙ্গার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মুসা (আ)-র কাছে ছিল না। যদিও মুসা (আ)-র জ্ঞান মর্তব্যের দিক দিয়ে স্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি ইসই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে তানাজনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। কলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রশিধানযোগ্য বিষয় এই-যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মুসা (আ)-র সাক্ষাত অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মুসা (আ)-কেই পরিচালক ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। কলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হত না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে যত সাহ জীবিত হয়ে নিক্র-বেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বোখারীর হাদীস থেকে যাহ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই খজিরার যাহ লেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে—তা জানা যায় না। তবে উত্তর সত্যবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তুফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাড়া করা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সর্বকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়া ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিয়া হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছেন। মাছটির এক পার্শ্ব অক্ষত এবং অপর পার্শ্ব ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়া নিজেরও দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

কোন কোন তুফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার খলে ছাড়া পৃথক একটি খলেতে যাহ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তুফসীর থেকেও বোঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিয়াই ছিল।

হযরত খিযিরের অস্পষ্ট তিকানা দেয়ার বিষয়টিও হযরত মুসা (আ)-র জন্য এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরও পরীক্ষা ছিল এই যে,

ঠিক পদব্যাংগে পৌছে তিনি বাহের কথা ভুলে গেলেন। আরাতে **نَحْبًا حَوْثَهُمَا** বলে

তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা বাড় করা হয়েছে। কিন্তু বোখারীর হাদীসে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় মুসা (আ) নিশ্চিত হইলেন। শুধু ইউশা ইবনে নুন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং আগ্রহ হওয়ার পর মুসা (আ)-কে জানাবার ইচ্ছা করতেন। কিন্তু পরে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভুলে কেমন রাখেন। সুতরাং আরাতে 'উভয়ে ভুলে গেলেন' কথাটা এমন হবে, যেমন

অন্য এক আরাতে **مِنْهُمْ اَلْزُورُ وَالْجُرْجَانُ** বলে মিঠা সমুদ্র ও

জবপাত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মোতি শুধু জবপাত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয়। কিন্তু **تَغْلِبُ** এর কায়দা অনুযায়ী এরূপ জেথার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, সেখান থেকে সাননের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সঙ্গে নেয়ার কথা বিস্মৃত হইলেন। তাই আরাতে ভুলে যাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, বাহের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ মুসা (আ)-র ভিত্তীয় পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই বাহের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই বাহের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দুরবর্তী সফরের

প্রয়োজন হত না; কিন্তু সূরা (খা) আরও একটু কক্ষক, এটাই ছিল আলাহ তা'আলার ইচ্ছা। তাই স্বীয় সম্বন্ধে অতিক্রম করার পর সূরা ও রূপটি অনুভূত হয় এবং মাহের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলে।

মাহের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার **وَلَقَدْ** শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। সমুদ্রে ভাঙা ভৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ সম্বন্ধে ভৈরি করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাহটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইটনা ইকনে নূন পীর্থ সকলের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করে, তখন **وَلَقَدْ** শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া এবং একটি অস্থাসংকীর্ণ অগভীর ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়তের প্রমাণ : কোরআন পাকের ঘটনার এই সূত্র ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি, বরং **عَلَّمَ مِنْ عِبَارَةٍ** (আমার বাপ্পাসের একজন। বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-সামান্য। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি মেরুগই হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পরগণার ছিলেন না একজন ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আঞ্জিলের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিতরূপেই শরীফতবিরোধী। আলাহর ওহী বাতীত শরীফতের নির্দেশ কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পরগণার ছাড়া আল্লাহর ওহী কেউ পেতে পারে না। ওহী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীফতের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হয় যে, খিযির আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরীফতবিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করেছেন। কোরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তাঁর পক্ষ

থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে : **وَمَا فَعَلْنَا عَنْ أَمْرِ** অর্থাৎ আমি নির্দেশ

পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি, বরং আল্লাহর নির্দেশে করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলিমদের মতে হযরত খিযির (আ) ও একজন নবী। তবে আজাহর পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপাধিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জনও দান করা হয়েছিল। মুসা (আ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আগতি উদ্‌গণন করেছিলেন। তরুসীর কুরতুবী, বাহরে মুহীত, আবু হাইয়ান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন ওলীর পরে শরীয়াতের বাহ্যিক নির্দেশ জ্ঞান করা জায়েয নয়। অনেক মূর্খ, পঞ্চাশট, সূফীবাদের কলংকযন্ত্রণা স্নোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়াত ডিন্ন জিনিস আর তরীকাত ডিন্ন জিনিস। অনেক বিজ্ঞ শরীয়াতে হারাম, কিন্তু তরীকাতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে প্রকাশ্যে কবীরা গোনাহে জিন্ম দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কলং পরিষ্কার ধর্মপ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাগফরিতে বিচার করা যায় না। এবং শরীয়াতের বিরুদ্ধে তাঁর কোন কাজকে বৈধ বলা যায় না।

নিষেধ জনা ওরুন্ অনুসরণ অপরিহার্য : **هَلْ أَتَى عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ**

مَا عَلِمْتَ رُحْدَا এখানে হযরত মুসা (আ) আজাহর নবী ও নীর্ঘহানীর রসুল হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযিরের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনায় জান শিখা করার জন্য আগনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, নিষেধ হলেও ওরুন্ প্রতি সম্মান ও ব্রহ্ম প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জানর্জনের আদব।--(কুরতুবী, মায়হারী)

শরীয়াত বিরুদ্ধ কাজে নিষিদ্ধ থাকে আলিমের পরে জায়েয নয় :

أَفَىٰ لَنْ تَطِيعَ مَعِيَ مَهْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا

হযরত খিযির (আ) মুসা (আ)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধর্ম ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধর্ম ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জানজাতি করেছি, তা আপনার জান থেকে ডিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আগতি করবেন।

মুসা (আ) যখন আজাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছে থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে শরীয়াতবিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলিমের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়াত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণার অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিহক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মুসা (আ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। স্বাক্ষর হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদে অন্য কোন ওয়রও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনাকে থাকবে। ফেরনা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোন নবী ও রসুলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যাহোক পরগম্বত্ব ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা খিযির (আ)-এর অন্য শরীয়তের সাধারণ নিয়মবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন।—(সাম্বাহারী)

মুসা (আ)-এর জ্ঞান ও খিযির (আ)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের আর্থিক বৈপরীত্য সমাধান : একানে সম্ভাব্যতাই প্রশ্ন হয় যে, খিযির (আ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান মুসা (আ)-র জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আত্মদুঃখদণ্ড তখন উভয়ের বিধি-বিধান বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তরুণীরা স্বাভাবিকভাবে হয়ত কাহী সানাউল্লাহ পানিগামী বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

আজ্ঞাহ তা'আলা মাদুরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সম্ভাব্যত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি প্রহ ও শরীয়ত-নাযিম করা হয়। এগুলোতে জনগণের হিদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। কোরআন পাকে যত নবী রসুলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আপত্তি ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু স্থিতিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে। সে সবার জন্য সাধারণভাবে ফেরলতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন কোন পরগম্বত্বকেও আজ্ঞাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হয়ত খিযির (আ) তাঁদেরই একজন। স্থিতিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব অনুযায়িক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত, যেমন অসুখ ভুবন ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অসুখকে নিপাত করা হোক অথবা অসুখকে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জন-গণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপাখিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পরগম্বত্বের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়, যার মিম্মার স্থিতিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতানুসারে শরীয়তের আওতাবহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশিত শরীয়তের আইন-বিশেষত্বদের কল্পনা থাকে না। ফলে আমরা একে হারমিটিক বাস্তবতা হিসেবে মনে করে এটাই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি স্বাধীনভাবে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুসঙ্গিক ঘটনা শরীয়াতের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র। আবু হাইয়ান বাহর-মুহীতে বলেন :

الجمهور على أن الظرفي وكان علمه معرفة بواطن
أوحيت إليه وعلم موسى الأحكام والفتيا بالظاهر -

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন কাশফ ও ইলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্য যথেষ্ট নয়! হযরত খিমির কত ক বালক হত্যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়াতের এই আইনের উর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়--এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁর মঙ্গলকামিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা--যেমন তও সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে--মস্পূর্ণ ধর্মপ্রাণিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে মিল্লাহ ঘোষণার নামাজের।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজ্জদাহ হারুন্না (খারিজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পর লিখল যে, হযরত খিমির (আ) নাবালগ বালককে কিরাপে হত্যা করলেন, অথচ রসুলুজাহ (সা) নাবালগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন : কোন বালক সম্পকে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অজিত হয়ে যায়, যা খিমির (আ)-এর অজিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালগ হত্যা করা জায়য হ'ল যাবে। উদ্দেশ্য এই : যে, খিমির (আ) নবুয়তের ওহীর মাধ্যমে ঐ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রসুলুজাহ (সা)-র পর নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর লিপ্ত এখনি ঐ জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।—(মাহহারী)

এ মইনা থেকে এ কথা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়াতের আইনের উর্ধ্বে রাখার করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

فَانْطَلَقَ حَقِّي إِذَا رَكِبْنَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا، قَالَ أَخَرَقْتُهَا
لِتَغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْرًا، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ
لَنْ تَسْطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ لَا تَوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا
تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِ عَسْرًا، فَاَنْطَلَقَا بِهِ حَقِّي إِذَا أَقْبَا عَلَمًا
فَقَتَلَهُ، قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا رَكْبَةً، بِغَيْرِ نَفْسٍ، لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا
كَبْرًا، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا.

قَالَ إِنْ سَأَلْتِكَ عَنْ شَيْءٍ أَبْعَدْنَا فَلَا تُصِيبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُتْدًا ۖ فَإِنْ طَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا ۖ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ رَاقَا ۖ قَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَمَشَّطَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ تَسْطِمْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ

(৭২) অতঃপর তার চক্রে লাগল : অবশেষে যখন তার নবীরাও অসহ্য কলস, তখন তিনি তাকে ছিট করে দিলেন। মুসা বললেন : আগনি কি এক অসহ্য-মেরকে ছুঁতে আমার জন্য এত দূর করে দিলেন? নিশ্চয়ই আগনি একটি ভয়ঙ্কর মাল কাছ করলেন। (৭৩) তিনি বললেন : আমি কি বলিনি যে, আগনি আমার সাথে কিছুকাল ঠিক ধরতে পারবেন না। (৭৪) মুসা বললেন : আমার কাছে আমার ভুলের জন্য অসহ্য কলসে না, এবং আমার কাছে আমার উপর কর্তৃত্বতা বহুতর করলেন না। (৭৫) অতঃপর তার চক্রে লাগল : অবশেষে যখন একটি আশ্রয়কর গোক, তখন তিনি তাকে ছিট করে দিলেন। মুসা বললেন : আগনি কি একটি বিশাল শ্রীমান লোক করে দিলেন প্রাপ্ত নিমিত্তর দ্বারা? নিশ্চয়ই আগনি তো এক ভয়ঙ্কর অন্যায় মাল করলেন। (৭৬) তিনি বললেন : আমি কি বলিনি যে, আগনি আমার স্তম্ভ খেঁচ করে থাকতে পারবেন না। (৭৭) মুসা বললেন : এরপর যদি আমি আশ্রয়কে কোন বিরোধ করে করি তবে আগনি আমাকে সাথে রাখবেন না? আগনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগসূচক করে গেলেন। (৭৮) অতঃপর তার চক্রে লাগল : অবশেষে যখন একটি দ্বন্দ্বমের অধিবাসীদের কাছে গেলেন, তখন তার কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের অধিবাসীদের কাছে গেলেন, তখন তারা সেখানে একটি পল্লবসূচক প্রাচীর দেয়তে গেল, যেই তিনি সেখানে রক্তাক্ত করিয়ে দিলেন। মুসা বললেন : আগনি ঠিক করলে তাদের কাছ থেকে এক পাল্লবসূচক আশ্রয় করতে পারতেন। (৭৯) তিনি বললেন : এখানেই আমার ও আগনির মধ্যে সম্পর্কই হল। এতদেব নিমিত্ত আগনি ঠিক ধরতে পারেন নি, আমি কব্জ তাৎপর্য বলে গিছি।

তৎসীনের সার-সংক্ষেপ

(যোটকথা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা সাব্যস্ত হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (একজন একদিকে) চক্রে ছুঁলেন : (সব বত তাঁদের প্রায়ই উড়াও দিল। কিন্তু সে মুসা (আ)-এর অধীনে ছিল। তাই দু'জনেরই উল্লেখ করা হয়েছে।) অবশেষে

(তারা চমকে চমকে যখন এমন আলমার গিরে পৌঁছলেন, যেখানে নৌকার আরোহণ করার প্রয়োজন দেখা গিল, তখন) উভয়েই নৌকার আরোহণ করলেন, এসময়ে তিনি (নৌকার একটি তক্তা উঠিয়ে) তাতে হিঁদ করে দিলেন। সুসা (আ) বললেনঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে তুবিরে দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে হিঁদ করে দিলেন? আপনি একটি গুরুতর (আশংকার) কাজ করলেন। তিনি বললেনঃ আমি কি বখিনি যে, আপনি আমার সাথে খেঁই ধরতে পারবেন না? (অবশেষে তাই হয়েছে। আপনি অসাকার ঠিক রূপেই পারলেন না।) সুসা (আ) বললেনঃ (আমি তুলে গিরেছিলাম।) আপনি আমাকে তুবিরে জনা আদাকে অনুরোধ করলেন না এবং আমার এই (অনুসরণের) কাজে আমার উপর (এমন) কঠোরতা আরোপ করলেন না। (যাতে তুলারূটিও সাজনা করা যায় না। রূপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেছে।) অতঃপর উভয়েই (নৌকা থেকে নেমে সামনে) চলতে লাগলেন, অবশেষে যখন একটি (নাবালগ) বাজকের সাফাত পেয়েল, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। সুসা (আ) (অস্থির হয়ে) বললেনঃ আমি কি একটি নিশাপ্রাণীকে শেষ করে দিলেন (তাঁকে) কোন প্রাণের বলা হত্যা? নিশাপ্রাণী আপনি এক বিরাট অমায়িক কাজ করলেন। (প্রথমতঃ এটা নাফ-জেনের হত্যা, যাকে সুসের বসন্তে হত্যা করা হারিজ। তদুপরি সে ভোঁ একটি হত্যাও করেনি। এ কাজটি প্রথম কাজের চাইতেও গুরুতর। কেননা, প্রথম কাজে হিঁদ শুধু আধিক ক্ষতি। আরোহীদের নিরজিত হওয়ার আশংকা, কিন্তু তা সেরে ফেরেছিল। এ হত্যা আদালত বহির্ক সর্বপ্রকার সৈন্যাহ থেকে মুক্ত।) তিনি বললেনঃ আমি কি বখিনি যে, আপনি আমার সাথে খেঁই ধরতে পারবেন না? সুসা (আ) বললেনঃ (কাজ, অবশ্যই করা করল, কিন্তু) অতঃপর যদি আমি আদাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। নিশাপ্রাণী আপনি পক্ষ থেকে (চূড়ান্তগণে) নির্দোষ হয়ে গেছেন। [এবার সুসা (আ)-তুবিরে জনা কোন গুহর ইশন করলেন। এতে কোনকা খসি যে, এ প্রসঙ্গ তিনি পরস্পরসূক্ত মর্দাদার ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই করছিলেন।] অতঃপর উভয়েই সামনে চলতে লাগলেন, অবশেষে যখন একটি জনপদের আধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাঁদের কাছে বাধার চাইলেন (যে, আমরা অভিধি।) তখন তারা তাঁদের অভিধের ভিত্তিতে অধিবাস করল। ইতিমধ্যে তারা সৈন্যে একটি পক্ষনোমুখ আচীর দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে (হাতের ইশারায় মুজিবাকরণ) সোজা করে দিলেন। সুসা (আ) বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাঁদের কাছে থেকে এর পারিগ্রমিক আদার করতঃ পারতেন। (কলে আমাদের অভাবও দূর হত এবং তাঁদেরও অভাবতার সৈন্যেই হয়ে যেত।) তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে আদার ও আমায় বিধেই সঙ্গ (খেঁই আদার নিজেই বলেছিলেন।) এবার আমি সে বিষয়ের দরপ বলে নিছি, যে বিষয়ে আপনি খেঁই ধরতে পারেননি? —পদবর্তী আদাতে তা বর্ণিত হবে।

আমুয়িক ডাডা বিষয়

أَخْرَجَهَا لِلْفَرَقِ أَهْلًا — বুধারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, যিহির (আ)

কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা কেঁদে দেয়। কলে নৌকার পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মুসা (আ) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকার প্রবেশ করেনি—মুজিহার কারণে হোক কিংবা খিমির (আ) কড়ক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগভীর রেওয়াজেতে আছে যে, এই তক্তার অঙ্গগায় খিমির (আ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাগর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবিয়ে কোন দৃষ্টিনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপন্যাস রেওয়াজেতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتَّىٰ إِذَا الْفِئَاةُ غَلَامًا —আরবী ভাষায় غلام শব্দের অর্থ নাবালগ বালক।

যে বালককে খিমিরী (আ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকারশ তফসীলবিদ বলেন যে, সে নাবালগ ছিল। পরবর্তী বাক্য **فَمَا زَكِيَّةٌ** শব্দ থেকেও তাঁর নাবালগত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, **زَكِيَّةٌ** শব্দের অর্থ গোনাহ থেকে পবিত্র। এ ভণটি হয় পরগণার দের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালগ বালকদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালগদের আয়তনামার কোন গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

أَهْلَ قَرْيَةٍ —হযরত খিমির (আ) যে জনপদে পৌঁছেন, এবং যার আধিবাসীরা

তাঁর আতিথেয়তা করতে সক্ষমতার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে সেটিকে এতালিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়াজেতে ‘আইকা’ বলা হয়েছে। হযরত আবু হোরা-রার থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ। —(মহাহারী)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْذَلَتْ أَنْ
لِيُعِيَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۖ وَأَمَّا
الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مُخْشِبِنًا أَنْ يُرْهِقَهَا طُغْيَانًا وَ
كُفْرًا ۖ فَأَرْدَا أَنْ يُنَادِيَ لَهَا رَبُّهَا خَيْرًا مِثْلَ زَكَاةٍ وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۖ
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحِبًا ۖ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا

كَذٰهُمَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

(৭৯) নৌকাটির ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে হুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরাধিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা হিন্নিরে নিত। (৮০) বাজকটির ব্যাপার—তার পিতামাতা ছিল ইমামদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে সহস্র তার চাইতে পবিত্রতর ও ভালবাসার বনিতিতর একটি প্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বাজকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সংকর্ষপরাধ। সুতরাং জাপনার পালনকর্তা দয়াকর হইয়া করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ হাতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে নৌকার ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা (এরই অর্থসে) সমুদ্রে মেহনত-মজুরি করত। (এর দ্বারা তাই তারা জীবিকা নির্বাহ করত।) আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে হুটিযুক্ত করে দেই। (কারণ) তাদের সাধনের সিকে একজন (অত্যাচারী) বাদশাহ ছিল। সে প্রতিটি (উৎকৃষ্ট) নৌকা জোর-জবরদস্তি করে হিন্নিরে নিত। (আমি নৌকাটিকে হুটিযুক্ত করে বাহ্যত অকেজা করে না দিলে এটিও হিন্নিরে চলা হত।) কল দরিদ্র মুকুরদের জীবিকার অবলম্বন শেষ হয়ে যেত। এটিই ছিল হিন্নি করার উপকারণ। ১- বাজকটির ব্যাপার—তার পিতামাতা ছিল ইমামদার। (বাজকটি বড় হলে কাকির ও জাজিম হত। পিতামাতা তাকে খুব ভালবাসত।) অতঃপর আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরের দ্বারা তাদেরকেও না আবার প্রভাবিত করে দেয়। (অর্থাৎ পুত্রের ভালবাসার ভাৱও নাশের প্রবাহী হয়ে যায়।) সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম যে, (তাকে ভ্রো পেষ্ট করে দেয়া দরকার।) অতঃপর তার পবিত্রতর তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পবিত্রতর ও ভালবাসার বনিতিতর তার চাইতে প্রেষ্ঠ সন্তান (হলে কিংবা চৈর) দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বাজকের। এর নিচে ছিল তাদের কিছু গুপ্তধন (যা তাদের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পেয়েছিল) এবং তাদের (মৃত) পিতা ছিল সংকর্ষ-পরাধ ব্যক্তি। তার সংপূরকতার বরকতে জাহায তা'আলা তার দু'ন সংরক্ষিত রাখতে চাইলেন। প্রাচীর এই মুহূর্তে পড়ে গেলে সবাই গুপ্তধন লুটে-পুটে মিরে নিত।

এতীম বালকদের অভিভাবক সম্ভবত সেলে ছিল না যে, এর ব্যবস্থা করবে) তাই আগনার পালনকর্তা দয়ামগ্নত চাইলে যে, তারা উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজস্বের স্তম্ভধন উদ্ধার করুক। (আমি আল্লাহর আদেশে এসব কাজ করেছি এবং এর মধ্যে) কোন কাজ আমি নিজ হাতে করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ কর্ত্তে অক্ষম হয়েছিলেন, এটা হল তার স্বরূপ। [ওমানানুযারী আমি তা বর্ণনা করে দিচ্ছি। অতঃপর খিযির (আ) কিদার নিয়ে চলে গেলেন।]

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

مَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ — কব' আহবাস থেকে বর্ণিত রয়েছে

যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই যেহেতু-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সুতরাং নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকীনের সংজ্ঞা : কারও কারও হাতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনকে সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনকে অন্তর্ভুক্ত। কেবলা আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা ভাড়া ছিল, যার মূল্য নিসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে। (মামহারী)

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا — বগড়ী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা

করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাক্ছিল, সেখানে একজন জালিয় বাদশাহ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ কারণে নৌকার একটি তত্ত্বা উপাধির দেন, যাতে জালিয় বাদশাহ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা রিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়। যতজানা রুমী চমৎকার বলেছেন :

گر خضر د و بحر کشتی را شکست

مدرستی د و شکست خضر هست

وَأَمَّا الْفُلَام — হযরত খিযির (আ) যে বালকটি হত্যা করে, তার স্বরূপ

এই বর্ণনা করেছেন যে, তার হত্যার কুকুর ও পিতামাতার কবাবাঙা বিহীন ছিল। তার পিতামাতা ছিল দুই কর্মহীন রূপ লোক। হযরত খিযির (আ) বলেন : আমার আরেকা ছিল

যে, ছেলেটি বড় হয়ে সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুকরে জিন্ত হয়ে পিতামাতার জন্য ক্রিষ্টনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসার পিতামাতার বিরুদ্ধে বিপর্যয় হয়ে পড়বে।

فَارْدُنَا اَنْ يَّهْدِيَهُمَا رَحْمَةً وَكُوفَا قَرَبٍ وَرَحْمَةً

এজন্য আমি ইচ্ছা করলাম, যে আল্লাহ তা'আলা এই সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র পবিত্র হবে এবং সে পিতামাতার হকও পূর্ণ করবে।

আরোতে **فَارْدُنَا** ও **خَشْيَةً** ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা

হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, খিযির (আ) এ দুটি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় **فَارْدُنَا**—এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে খিযির অথবা অন্য কেউ শরীক হতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেটি কাকির হবে এবং পিতামাতাকে গণ্ডগ্রস্ত করবে—এ বিষয়টি যদি আল্লাহর জানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া অজরী ছিল। কেননা আল্লাহর জানের বিরুদ্ধে কোন কিছু হতে পারে না।

উত্তর এই যে, আল্লাহর জান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাকির হবে এবং পিতামাতার জন্য বিগদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহর জানের বিপর্যয় নয়।—(মামহারী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনিযির ও ইবনে আবী হাতেম আভিয়ান্ন বাটনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী (নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উম্মতকে হিদায়েত দান করেন।

وَتَحْتَهُ كُنْزٌ لَهُمَا

হয়রত আবুদুজ্জায়া রুসুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নিচে রক্তিত ইরাতীয় বাজকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার—(তিস্মিনী, ফারিস)

হয়রত ইবনে আকাস (রা) বলেন : সেটি ছিল স্বর্ণের একটি কলক। তাতে মিশ্রজিহিত উল্লেখ বাকসিহি জিহিত ছিল। হয়রত উসমান ইবনে আফফান (রা)-ও এই রেওয়াজেটি রুসুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী)

১. বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ চিত্তা-
মুক্ত হয় ।

৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ তা'আলাকে ঈশ্বরিকদাতারূপে
বিশ্বাস করে, এরপর প্রয়োজনানুসারে পরিব্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনির্যাস করে ।

৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে, অথচ আমন্ত্রিত ও
প্রবৃত্ত থাকে ।

৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে প্রত্যেকালের হিসাবনিয়মে বিশ্বাস রাখে,
অথচ সংস্কারে পাকিত্ব হয় ।

৬. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও
নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে ।

৭. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ।

পিতামাতার সংকরের উপকার সন্তান-সন্ততিদের পক্ষে : **وَكُنْ أَتُوبًا**

مَا لَكُمْ —এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত শিবির (আ)-এর মাধ্যমে ইরাতীয় বালকদের
জন্ম রক্তিত গুণতথনের হিফাযত এজন্য কল্পানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সং কর্ম-
পরায়ণ আল্লাহের প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে
এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন : আল্লাহ তা'আলা এক বান্দার সং
কর্মপরায়ণতার কারণে তাঁর পরবর্তী সন্তান-সন্ততি বংশধর ও প্রতিবেশীদের হিফাযত
করেন। —(মাবহারা)

হযরত শিবিরী (র) বলেন : আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকায় জম্মা শক্তির
কল্পণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাকন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফিররা
দারজা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে
থাকে যে, আমাদের উপর বিশৃঙ্খল বিপদ চেপেছে অর্থাৎ শিবিরী ওফাত ও দায়লামের
পতন।—(কুরতুবী: ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তকসীর-মহফাজীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ এদিকেও ইঙ্গিত করছে যে, আলিম ও
সং কর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি যোগ্যরূপে হুকুম
উচিত, যে পর্বত না তারা পুরোপুরি পাগাচরে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

وَكُنْ أَتُوبًا

এই একটি ইঙ্গিত —এর মাহাতম। অনর্থক সক্তি এবং সে
করস, যাতে কানু'র পূর্ণ শক্তি অর্জম এবং প্রায়শ্চিত্তের পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়া ইচ্ছা
আবু হানীফার মতে পঁচিশ বছর কয়রাম এবং সর্বত্রও মতে চাশিশ বছর কয়রাম।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنًا

কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে

—(মাহহারী)

পরপরসূক্ত জলংকার ও আদরের একটি দৃষ্টান্ত : এ দৃষ্টান্তটি কোরআনে একটি জরুরী বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ আল্লাহর ইচ্ছা-বশতিরূপে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালমন্দ সবই আল্লাহর সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিস্থিতিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির জন্য সবই জরুরী এবং আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহর ইচ্ছা-বশতিতে ঘটতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভাল ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোন মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা না বলা আদব। কোরআনে উল্লিখিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বাক্য এ আদবই দিচ্ছি। তিনি বলেন :

إِنِّي بِطَاعَتِكَ وَمُطِيعٌ لِّكَ وَأَنَا مَرَضٌ فِيهِ شَيْءٌ

তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহর প্রতিই সম্পূর্ণ করেছেন, কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে

নিজের প্রতি সম্পূর্ণ করে **إِنِّي مَرَضٌ فِيهِ شَيْءٌ** বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি,

তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বলেননি যে, যখন আল্লাহ আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিযির (আ)-এর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছা

বাহ্যত একটি-স্বাধীন ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে **أَرَدْتُ**

বলেননি। অতঃপর বালিক হত্যাও তাঁর পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মাধ্যমে হত্যা ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভাল কাজ। তাই এ উদ্ভবের ইচ্ছার ক্ষেত্রে

বহুবচন প্রয়োগ করে **أَرَدْنَا** অর্থাৎ 'আমরা ইচ্ছা করলাম' প্রয়োগ করে, যাক্ত বহির্ভূত মন্দ

কাজটি নিজের মাঝে এবং ভাল কাজটি আল্লাহর মাঝে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনার প্রাচীর সোজা করে ইব্রাহীমদের গুপ্তধনের হেফাজত করা একটি সম্পূর্ণ ভাল কাজ।

তাই একে পুরোপুরি আত্মাহুত দিলে সন্তুষ্ট করে **قَارَانِ رَبِّكَ** অর্থাৎ 'আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন' বলেছেন।

হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে : হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে : এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন রেওয়াজেও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোন কোন রেওয়াজেও থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। কবে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলিমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুহাম্মদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়াজেও। তাতে বলা হয়েছে : যখন রসূলুল্লাহ (সা)-র ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদাক্বো দাঈওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ডিফ তেলে ভেঙে প্রবেশ করে কাশাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তক সাহাবার কিয়ামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে :

ان في آلاء من كل مصيبة وعوفا من كل فائت وخلفا
من كل هالك فالى الله فانيبوا واليه فارغبوا فانما المحروم
من حرم الثواب.

আগন্তক দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবার আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতিদান আছে এবং তিনিই প্রত্যেক ধ্বংসীল বস্তুর পুনর্জন্ম দিচ্ছে। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা এই ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

আগন্তক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রা) ও আলী (রা) বললেন : ইনি হযরত খিযির (আ)। এ রেওয়াজেও বর্ণনা করা হয়েছে বৈশিষ্ট্য।

মুসলিমের হাদীসে আছে যে, সাক্কাল মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌঁছলে হুদয়র থেকে এক ব্যক্তি তার মুকাবিলায় অন্য বের হবেন। তিনি তৎকালীন মোকাদ্দার ক্রমাগতের হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম মোকাদ্দার অন্যতম হবেন। আবু ইসহাক বলেন : এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আ)।

ইবনে আব্বাস দুজরা কিস্তবুল হাওয়াতিকে বর্ণনা করেন যে, হযরত খিযির (রা) হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্কাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে-ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে, সে বিরাট সওয়াব, যাক্কিনাত ও রহমত পাবে। দোয়াটি এই :

يَا مَنْ لَا يَشْفَعُ سَمِعَ عَنْ سَمْعٍ وَيَا مَنْ لَا تَغْلُظُ الْمَسَائِلُ وَيَا مَنْ

لَا يَبْرُمُ مِنَ الْحَاحِ الْمَلْحُونِ أَذْ قُلَىٰ بَرٍّ عَفِوَكَ وَخَلَا وَةً مَفْغَرَتِكَ

“হে ঐ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনার প্রতিবন্ধক হয় না, হে ঐ সত্তা, যাকে একই সময়ে করা লাগে কোটি প্রশ্ন বিস্মৃত করে না এবং হে ঐ সত্তা যিনি দোষের পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবার বললে বিরক্ত হন না, আমাকে তোমার ক্ষমার দ্বার আবাদন করো এবং তোমার মগফিরাতের দ্বার দান কর।”

অতঃপর এ গ্রন্থেই হযরত এই ঘটনা, এই দোহা এবং হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সজ্ঞাতের ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর থেকেও বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সুন্নিহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে উমর বলেন : রসুলুল্লাহ (সা) জীবনের শেষ দিকে এক দ্বারে আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন :

أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَاِنْ عَلَىٰ رَأْسِ مَا تَذْكُرُهَا لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ
هُوَ عَلَىٰ ظَهْرٍ أَوْ رُفٍّ أَحَدٍ -

‘তোমরা কি আজকের রাতটি ভুলে যাচ্ছ? এই রাত থেকে একশ বছর অতীত হলে আর যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।’

হযরত ইবনে উমর অতঃপর বলেন : এই রেওয়াজেতে সন্দেহে কোনকই সন্দেহ রহকমু কথাবার্তা বলে। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সা)-র উচ্চারণ ছিল এই যে, এক শ বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

মুসলিমে এ রেওয়াজেতেটি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকেও প্রায় এমনি বর্ণিত আছে। কিন্তু রেওয়াজেতেটি বর্ণনা করার পর আশ্চর্য্য করত্ববী বলেন এর ভাষার তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, যারা খিযির (আ)-এর জীবদ্দশাকে অস্বীকার করে। কেননা, এতে যদিও সমস্ত মানবজাতির জন্য ব্যাপক ভাষা ভাঙ্গিদ সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক আদম সন্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আদম সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসা (আ)-ও একজন। তিনি ওফাত পান নি। এবং নিহতও হননি।

কাজেই হাদীসে ব্যবহৃত عَلَىٰ الرَّفٍّ শব্দের মধ্যে যে অলিঙ্গতাম রয়েছে, বাহ্যত তা ৫৬৩-এর অর্থ দেয়। এবং এর অর্থ আরও ডুবি ইয়াকুজ-মাজুজের দেশ, প্রাচ্যদেশ ও ঘৌপুজ—যেগুলোয় নামও আরবরা কোনদিন শোনেনি। এ গুলোসহ সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ হাদীসে বোঝানো হয়নি! এ হচ্ছে আশ্চর্য্য করত্ববীর বক্তব্য।

কেউ কেউ বিবির (আ)-এর জীবদ্দশা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেকার আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে **لَوْ كُنَّا مَعَهُ**—অর্থাৎ মূসা (আ) জীবিত থাকলে আমরা অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও পড়াভর্য ছিল না। (ইসরাফ আমার আগমনের কালে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, বিবির (আ)-এর জীবন ও নবুয়ত সাধারণ পরমহরদের থেকে ভিন্নরূপ হলে। তাঁকে আত্মহত্যা পক্ষ থেকে সুশিক্ষিত দারিদ্র অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরীফতে মুহাম্মাদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সত্য যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের পর এ শরীফতেরই অনুসরণ করে চলেছেন। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

আবু হাইয়ান রাহুমে বুহীত গ্রহে বিবির (আ)-র সাথে কয়েকজন বৃদ্ধের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, **وَالْمُهْمُورُ عَلَى**—অর্থাৎ সাধারণ জাতিরদের দ্বারা তাঁর ওকালত হয়ে গেছে।—(বট পত্র ১৪৭ পৃঃ)

ভকসীর শাহহাদীতে কারী সানাতুল্লাহ বলেন : হযরত সাইয়দ আহমদ সরফিনী মুজাদ্দিদে আলিকে সানী তাঁর কাশকের মাধ্যমে যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন : আমি নিজে কাশক জমতে হযরত বিবির (আ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন : আমি ও ইয়রাস (আ) উভয়েই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ কথটা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণা করে বিভিন্নভাবে মানুষের সাহায্য করি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত বিবির (আ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সম্বন্ধ আমাদের যেসকল বিবিসম্মত অর্থবা কর্মপন্থা আস-আলা প্রকৃষ্ট নয়। এ কারণেই ফেরজান ও হাদীসে এ সম্পর্কে সন্দেহভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অভিন্নতা অপ্রাপ্যতাও বোঝাযুক্তির প্রয়োজন নেই। কোন এককিরের উপর বিশ্বাস রাখাও আমাদের দ্বন্দ্ব জরুরী নয়। কিন্তু প্রকৃষ্ট অনুসরণের মধ্যে বহল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكْنُؤُهُ فِي الْأَرْضِ وَآثِنُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَسَبَّأٌ قَاتِبٌ سَبِيلٌ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا هُ قُلْنَا يٰۤاَلْقُرَيْنِ اِمَّا اَنْ تَعَذِّبَ وَ اِمَّا
 اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝ قَالَ اِمَّا مِّنْ ظُلْمٍ فَّسَوْفَ نَعَذِّبُهٗ ثُمَّ
 يُّرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نَّكَرًا ۝ وَاِمَّا مِّنْ اَمْنٍ وَّ عَمَلٍ صٰحِحًا
 فَلَهٗ جَزَآءٌ اَلْحَسَنُ ۝ وَ سَنَقُوْلُ لَهٗ مِّنْ اَمْرِ اٰیٰسَرًا ۝

(৬৬) তারা আপনকে দুজকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে। বলুন: আমি তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। (৬৭) আমি তাঁকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিচারের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। (৬৮) অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবগতন করলেন। (৬৯) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অভ্যাসে পৌঁছলেন। তখন তিনি সূর্যকে এক পক্ষিক জাতিতে ভক্ত হতে দেখলেন এবং তিনি তাঁকে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আমি বললাম যে দুজকারনাইন! আপনি তাদেরকে শান্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদরভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৭০) তিনি বললেন: যে কেউ সীমানাখনকারী হবে, আমি তাঁকে শান্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পুত্রস্বত্বের কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাঁকে কঠোর শান্তি দেবেন। (৭১) এবং যে নিরাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আশ্রয় আছে তাঁকে সহজ নির্দোষ দেবে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

দুজকারনাইনের প্রথম সত্তা: তারা আপনকে দুজকারনাইনের অবস্থা জিজ্ঞাস করে। [এক-সম্প্রদায় সিদ্ধি প্রসঙ্গে এই যে: তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ নিম্নোক্ত হতে প্রেরিত। এ সত্তারই এই কাহিনীর অস্তিত্ব, বিবরণ, বা সত্তারজানে উল্লিখিত হইল, সে সম্পর্কে আরও সর্বত্র ইতিহাসে তাঁর গতিবিধিও পড়িলে হইবে। এ সত্তারই কোরাইনরা মদীনার ইহুদীদের পরাকর্ষে কাহিনীটি প্রবর্তন করতঃ প্রেরিত। তাই কোব্বানে বর্ণিত এ ঘটনার বিবরণ রসুলুজাহ (সা)-র নবুত্তের সুস্পষ্ট প্রমাণ।] আপনি বললেন: আমি এখনই তোমাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করব। (অতঃপর আল্লাহ তা'আজার পক্ষ থেকে কাহিনীর বর্ণনা শুরু হইল যে, দুজকারনাইন একজন-কথন প্রতাপবিশিষ্ট বাদশাহ ছিলেন)। আমি তাঁকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেছিলাম এবং আমি তাঁকে সব দুকম সাহসস্বত্বায় দিরাছিলাম, (কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় রক্ষাকরনামসমূহ সত্যবাচক করতে পারেননি)। অতঃপর তিনি (পাশ্চাত্য দেশসমূহে জর করার মানসে) এক পথ অবগতন করলেন (এবং সমস্ত করতে লাগলেন)। অবশেষে তিনি যখন (চক্রে চক্রে মধ্যবর্তী শহরগুলো পদাতি করেন) সূর্যের অভ্যাসে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের সর্বশেষ জনবসতি

পর্বত) পৌছলেন, তখন সূর্যকে তিনি এক পক্ষি জলশায়ীতে অস্ত যেতে দেখলেন। (সম্ভবত
এর অর্থ সমুদ্র। সমুদ্রের পানি অধিকংশে কাল দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রে
অস্ত হয়ে না। কিন্তু সমুদ্র দিলভ হয়ে মনে হয় যেন, সমুদ্রেই অস্ত হয়েছে।) এবং
তখন তিনি এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। (পর্বতটা আরাত **أَمَّا مِنْ ظِلِّمٍ** থেকে
বোঝা যায় যে, তারা কাকির ছিল।) আমি (ইলহামের মাধ্যমে অবশ্য তৎকালীন
পরগণকের মধ্যস্থতার ভাষে) বললাম : যে মূলকারনাইন, (এই সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাকে
দৃষ্টকর্ম ক্রমতা দেওয়া হচ্ছে) হয় (তাদেরকে প্রথমেই হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে) শাস্তি
দেবে, না হয় তাদের ব্যাপারে সদর ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে ইমানের
দাওয়াত দেবে। যদি না মানে তবে হত্যা করবে। তবলীগ ও দাওয়াত ছাড়াই প্রথমে
হত্যা করার ক্রমতা সম্ভবত একান্তপেদেওয়া হয়েছিল যে, পূর্বে কোন উপায়ে তাদের কাছে
ইমানের দাওয়াত পৌছেনি। কিন্তু দ্বিতীয় পথ, আগে দাওয়াত পরে হত্যা—এটা যে
উত্তম, তা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং **النَّكَارَ حَسَنٍ** মক্কা দ্বারা তা বাত করা
হয়েছে।) মূলকারনাইন বললেন : (আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে প্রথমে তাদেরকে
ইমানের দাওয়াত দেব।) কিন্তু (দাওয়াতের পর) যে জালিম হবে, তাকে আমি (হত্যা
ইত্যাদির) শাস্তি দেব (এ শাস্তি হবে পার্থক্য) অতঃপর সে (মৃত্যুর পর) তার পালন-
কর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তাকে (দোহখের) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং যে
(দাওয়াতের পর) বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তার জন্য (পরকালেও)
প্রতিদানে কল্যাণ রয়েছে এবং আমিও (দুনিয়াতে) আমার ব্যবহারে তাকে সহজ (ও
নয়) কথা বলব। (অর্থাৎ কার্যকরে কঠোরতা করার প্ররই উঠে না, কথারও কঠোরতা
করা হবে না।)

আনুবাদিক জাভাব্বা খিদ্দর

وَيَسْتَلُونَك

—অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করবে। দ্বারা প্রশ্ন করেছিল, এ
সম্পর্কে কেওয়ারেত থেকে জামা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায়। মদীনার
ইহুদীরা তাদেরকে রসুলুলাহ (স)-র মনুষ্য ও সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন
বলে দিয়েছিল : রাসূল, আসহাব এবং মূলকারনাইন সম্পর্কে। তৎক্ষণাৎ দু'টি প্রশ্নের
জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আগোচ্য আরাতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে যে,
মূলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল? —(বাহকেরমুহীত)

মূলকারনাইন কে ছিলেন, কোন মুদে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তার নাম
মূলকারনাইন হয় কেন? মূলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও ভীর মতভেদ
পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেন : তাঁর মাথার চুলের দৃষ্টি ওজ্জ্বল ছিল। তাই মূলকারনাইন,
(দুই ওজ্জ্বল) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ তার

কল্পিত কারণে মূলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তাঁর মাথায় বিং এর অনুরূপ দৃষ্টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, তাঁর মাথার দুই দিকে দৃষ্টি কৃত চিহ্ন ছিল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন স্বয়ং তাঁর নাম মূলকারনাইন রাখেনি, বরং ইহদীরা এ নাম বলেছিল। বোধ হয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। মূলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাক যা বর্ণনা করেছে, তা এই :

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশ-সমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনশাকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজসজ্জা দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন—পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালায় পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

রসুলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে প্রায় ঊষাপনকারী ইহদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি যে, তাঁর নাম কেন মূলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলা বাহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় জানা নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা এ জ্বলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেরীগণও এসব বিষয়ের প্রতি যমোনোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্ভব হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়াজে অথবা বর্তমান তত্ত্বাত্ত্ব ও ইজীল। বলা বাহুল্য, উপরূ পরি পরিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে বর্তমান তত্ত্বাত্ত্ব এবং ইজীলও তাদের ঐশী প্রস্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে ইতিহাস প্রস্থের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়াজে এবং ইসরাইলী ক্রিস্টাস-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোন সনদ নেই এবং কোন যমানার সুখীকৃপের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয়নি। তরুণীবিদগণও এ ব্যাপারে মা'কিন্তু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়াজে সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের অধা মতভেদের অঙ্ক নেই। বর্তমানকালে ইজীল-পীররা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের পবেষণায় অগণি-সীম অধ্যবসায় ও পরিপ্রয় নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধর্মসাম্প্রদায়িক ধর্মের সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অত্যন্ত-

পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো ব্যাঙ্গ ঘটনার পাঠ্যোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্য ঐতিহাসিক রেওয়ার্ডেত সমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীন-কালের ঐতিহাসিক রেওয়ার্ডেত সমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এ উল্লেখ্য মর্যাদা কিসসা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক ভূকর্ষীবিদগণও স্ব-স্ব গ্রন্থে এসব রেওয়ার্ডেত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই বস্তুটুকু প্রয়োজন ভিত্তিক লেখা হচ্ছে। যাওয়ানি হিব্রুয়র রহমান সাহেব 'কিসসা-সুল-কোরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতূহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোন কোন রেওয়ার্ডেত রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব শাসনকর্তা প্রতিষ্ঠাকারী চারজন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন সু'মিন এবং দু'জন কাকির। সু'মিন দু'জন হলেন হযরত সোজরমান (আ) ও মুলকাননাইন এবং কাকির দু'জন ময়রান ও বখতে নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুলকাননাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি দু'গুন মুলকাননাইনের সাথে সিফান-সর (আলেকজান্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে।

খৃস্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিফানার নামে একজন সম্রাট গ্রসিক ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিফানার গ্রীক, মকদুনী, রুমী, ইত্যাদি উপাধিতেও সম্বোধন করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিফানার নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী জগতে অধিক গ্রসিক। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লিখিত মুলকাননাইন বলে অভিযত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা তিনি এরিস্টটল মূশরিক ছিলেন। কোরআন পাকে যে মুলকাননাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাকের ইবনে কাসীর 'আজ বেদায়াহ ওয়াহেদায়াহ' গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের বরাতে দিয়ে তার পূর্ণ বংশভালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপরে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন : এই সিফানারই গ্রীক, মিসরী, মকদুনী নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করেন। যোনের ইতিহাস তার আমল থেকেই আরম্ভ হয়। তার আমল প্রথম সিফানার মুলকাননাইন থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিককাল পর। তিনিই দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদেরকে পরাজিত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মূশরিক। তাকে কোরআনে উল্লিখিত মুলকাননাইন বলা নিতাতই জুল। ইবনে কাসীরের ভাষা এতল :

فاما ذوالقرنين اثنا في فهو اسكندر بن فيليبس بن ميريمن
 بن هرمس بن ميظون بن رومي بن لطفى بن يونان بن يافث بن
 يوت بن شرخون بن رومي بن شرف بن توفيل بن رومي بن الاصغر
 بن يقز بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليه الصلوة
 والسلام كذا نسبة العاقظ ابن عساكر في تاريخه المقدوني الهوناني
 المصري بائني اسكندريته الذي يورخ بايسامه السروم وكان
 متاخرا عن الاول بدهر طويل وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلثمائة
 سنة وكان ارطا طالمس الفيلسوف وزيره هو الذي قتل دارا بن
 دارا وانزل ملوك الفرس وارطا ارضهم وانما نبهنا عليه لان كثيرا
 من الناس يعتقدان ان المذكور في القرآن هو الذي
 كان ارطا طالمس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض
 طويل فان الاول كان عبدا مؤمنا صالحا وملك عاد لا وكان وزيره
 الضمير وقد كان نبيا على ما قررنا قبل هذا واما اثنا في فكان
 مشركا كان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانيهما ازيد من الف
 سنة فان هذا لا يستويان ولا يشبهان الا على حبي لا يعرف
 حقائق الامور -

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের এই বক্তব্যে প্রথমত জানা গেল যে, সিকান্দার বাবিলার যিনি ইসা (আ)-র তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারী ও হারসা সম্রাটদের সাথে মার যুদ্ধ হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোন্‌জানে বর্ণিত মূলকারনাইন নন। কতিপয় বড় বড় তকসীরবিদও এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীতে এবং আজামা আলুসী রাহুল মা'আনীতে তাকে কোন্‌জানে বর্ণিত মূলকারনাইন বলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত **اثنا كان** বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে কাসীরের মতে তকস নবী হওয়ার খান্ডাণ্ডি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেরীখণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোকারের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মূলকারনাইন নবী বা কেন্দ্রশতা ছিলেন না, বরং একজন সং কর্মগতরূপ মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলিম কয়েকজন যে, **اثنا** এর সর্বনাম মূলকারনাইনকে নয়—খিবির (আ) কে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোন্‌জানে বর্ণিত মূলকারনাইন কে এবং কেন্দ্র যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলিমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীরের মতে তার আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক মকদুনা থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ)-

এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত খিমির (আ)। ইবনে কাসীর 'আলবেদায়াহ ওয়াআহহারাহ' গ্রন্থে এ রেওয়াজেতেও বর্ণনা করেছেন যে, মুলকানাইন খাদিরাজ হযরত উম্মেদে আগমণ করলে হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কা থেকে বের হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান, তার জন্য দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তৎকালীন ইবনে কাসীরে আব-রকীর বরাতে দিয়ে বর্ণিত আছে যে, মুলকানাইন ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে ভক্তগুরু করেন এবং কুদুবানি করেন।

আবু রায়হান আল-বেরুনী 'কিতাবুল আসরিল বাকীরা আনিজ কুরানিল খালীয়া' গ্রন্থে বলেন : কোরআনে বর্ণিত মুলকানাইন হচ্ছে আবু বকর ইবনে সুয়াই ইবনে উমর ইবনে আফরীকাস হিমযারী। তিনি শিখিগরী ছিলেন। হুকা হিমযারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তার জন্য গর্ভবাক্য করে বলেছেন : আমায় দাদা মুলকানাইন মুলকানাইন ছিলেন। কবিতা এই :

قد كان ذا القرنين جدي مسلما
ملكا على الارض فير مبعدا
بلغ المشاوق والمفارب يهتفي
اسباب ملك من كسريم سيد

আবু হাইয়ান বাফরেমুহীতে এ রেওয়াজেতেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরও 'আল-বেদায়াহ ওয়াআহহারাহ' গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেন : এই মুলকানাইন তিন জন ইরানী সত্রাটের মধ্যে প্রথম সত্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা' কুপের মোকদ্দমায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পক্ষে ন্যায় কর্তৃসালি দিয়েছিলেন। এ সময়ের রেওয়াজেতে মুলকানাইনের ব্যক্তিত্ব, নাম ও বংশ পরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ রয়েছে তার আমল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

মওলানা হিকমুর রহমান ফিসাসুল কোরআনে মুলকানাইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোরআনে বর্ণিত মুলকানাইন হচ্ছেন পারস্যের সে-সত্রাট, যাকে ইহুদীরা খোরাস, গ্রীকরা দায়দাস, পারসিকরা গোরশ এবং আরবরা কারখসর নামে অভিহিত করে। তার আমল ইব্রাহীম (আ)-এর অনেক পরে বনী ইসরাঈলের অন্যতম পরমেশ্বর দানিয়াল (আ)-এর আমল বর্ণনা করা হয়। এ আমল দারুন ইত্যাকারী সিকান্দার মকদুনী আমলের কাছাকাছি হয়ে যায়। কিন্তু মওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করে বলেছেন যে, মুলকানাইম সে সিকান্দার মকদুনী হতে পারে না, যার উজির ছিলেন দার্বাশিক এলিস্টটল। কারণ, তিনি ছিলেন মুশরিক এবং মুলকানাইন ছিলেন মু'মিন, সং কর্মপরায়ণ।

মওলানা সাহেবের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, সূরা বনী ইসরাঈলে বনা ইয়াকুবের দু'বীর দু'কর্ম ও হালামার লিখিত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দুই বছরের শান্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হালামা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

(অর্থাৎ তোমাদের হারামার শাস্তি স্বরূপ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক কঠোর যোদ্ধা বাৎসকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।)

এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তার দলবলকে বোঝানো হয়েছে। তারা বারতুল মোকাদ্দাসে চলিষ হাজার এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করে এবং লক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে গরু-হাগলের মত হাঁকিয়ে বাবেলে নিয়ে-যায়। এরপর কোরআন পাক বলেন : ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

(অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জরী করলাম।) বিজয়ের এই ঘটনাটি সন্নাট কারখসর তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হয়। সে ছিল ইমানদার, সংকর্ম-পরায়ণ। সে বখতে নসরের মুকাযিলা করে বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার থেকে মুক্ত করে পুনরায় ফিরোজীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসস্থাপে পরিণত বারতুল-মোকাদ্দাসকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বারতুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন ও গুরুত্ব-পূর্ণ সাজসজ্জায় বখতে নসর এখান থেকে বাবেলে স্থানান্তরিত করেছিল, সে সেগুলোও উদ্ধার করে বনী ইসরাঈলের অধিকারে সমর্পণ করেন। এভাবে সে বনী ইসরাঈলের কথা ইহুদীদের দ্বাণকর্তারূপে পরিগণিত হয়।

নবরত পরীক্ষা করার জন্য মদীনায় ইহুদীরা কোরআনের জন্য যে প্রার্থনা বাছাই করে, তাতে মুজকরনাইন সম্পর্কিত প্রবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহুদীরা তাকে তাদের দ্বাণকর্তারূপে সম্মান ও জড়িতপ্রজ্ঞা করত।

যওজানা হিকমুর স্বহমান সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের দৃষ্টান্তে বর্তমান তওরাত থেকে, বনী ইসরাঈলের পরগছরগণের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে এবং ঐতিহাসিক রেওয়াজে থেকে প্রকৃত সনীল-প্রমাণ লেন-করেছেন। কেউ আরও বেশি জানতে চাইলে যওজানা সাহেবের পুস্তকটি পাঠ করতে পারেন। এসব রেওয়াজে উল্লেখ করার মাধ্যমে মুজকরনাইনের বাস্তব ও তার স্থপ সম্পর্কে ইতিহাস ও তফসীরবিনদের সবগুলো উক্তি-বর্ণনা করে দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তথ্যে কার উক্তি প্রবল, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কোরআন যেসব বিষয়ের দাবি করেনি এবং হাদীসও যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, সেগুলো নির্ভর ও নির্দিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় না। তথ্যে যে উক্তিই প্রবল ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে, তাতেই কোরআনের অঙ্গ অঙ্গিত হবে : وَاللَّهُ أَعْلَمُ এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :

قُلْ مَا تَلَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ قُلْ مَا تَلَوْ عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ

আমি পাক : ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ এ দুটি শব্দ কোন্ ব্যবহার করণ ?

চিত্তা করলে দেখতে পাবেন, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক মূল-
কারনাইনের আদ্যপ্রান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তাঁর আলোচনার
একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে মূলকারনাইনের নাম ও বংশ পরম্পরা সম্পর্কে
যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে
হাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই মোছল করে দিয়েছে।

وَأَنذَرْتُهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَهُمْ يَكْفُرُونَ—আরবী অভিধানে **أَنذَرْتُ** শব্দের অর্থ এমন
বস্তু সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক উপায়াদি, ভানবুড়ি,
অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।—(কাহ্নে মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সন্ন্যাসী ও স্বাষ্টান্ত্রিকের পক্ষে যেসব বিষয়
অত্যাবশ্যকীয়, **مِنْ كُلِّ شَيْءٍ** বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্
তা'আলা মূলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শান্তিশুশ্রুতা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য স্নেহে যুগে
যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

فَاَتَعَسَىٰ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَكَ أَجْرَ مَا ۖ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ—অর্থাৎ সব যত্নম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছান উপকরণাদি প্রস্তুত
দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছান উপকরণাদি কয়েক
জাগার।

وَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ فَتُنْذِرَ ۚ وَأَنْتَ تَكْفُرُ—অর্থাৎ তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা
পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, আর পরে কোন জনবসতি ছিল না।

فَمَا تَكْفُرُ—অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা।

এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার দিকে কালো রঙের কাদা থাকে। স্থান খানির
৯৩৩ কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, সূর্যক আরও
অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত থাকে। কেননা এরূপ কোন বসতি অথবা মূলভাগ
ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন মরুদানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে
দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে
যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

وَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ فَتُنْذِرَ ۚ وَأَنْتَ تَكْفُرُ—এ কালো জলাশয়ের কথাই মূলকারনাইন
এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আল্লাহের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি
ছিল কাফির। তাই আল্লাহ তা'আলা মূলকারনাইনকে ক্রমশঃ দান করলেন যে,

তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কৃষ্ণের শান্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর, অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ইমান কবুল করতে সন্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শান্তি দাও। প্রত্যেকের মূলকারনাইন বিতীয় পথেই অবলম্বন করে বললেন : আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সন্নত-পথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কৃষ্ণের দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শান্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস হাপন করবে এবং সংকর্ষ করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

ثُمَّ لَئِنْ يَدْرَأُوا الْقُرْآنَ نَحْنُ

আজ্ঞা হু! আজ! নিজেই সংহোধন করে এ কথা বললেন। মূলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রসঙ্গ দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোন পরগল্পের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সংহোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, দেওরারোস্তসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত যিসির (আ) তাঁর সাথে ছিলেন। এহাড়া এটা নবুয়ত্তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন হযরত নুনা (আ)-র অনবীর জন্য কোরআনে وَأَوْحَيْنَا বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসুল ছিলেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহুয়ে কুহীতে বলেন : এখানে মূলকারনাইনকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়ত্তের ওহী বাতীত দেওয়া যায় না—কাশক, ইলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই, হয় মূলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সংহোধন করা হয়েছে। এহাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিত্ত্ব নয়।

ثُمَّ أَتِمُّوا سَبْعًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُمُ عَلَىٰ

قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۚ كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ

خُبْرًا ۝

(৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়রোমে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে একমুখী এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, তাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আশ্রয়কার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তাঁর স্বভাব আমি সম্যক অবগত আছি।

তকনীরের সার-সংক্ষেপ

অবশ্যপূর (পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করার পর প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার ইচ্ছায় প্রাচ্যের দিকে) তিনি এক পথ ধরলেন। অবশেষে যখন সূর্যের উদয়াগমে (অর্থাৎ পূর্ব-দিকে জনবসতিশ্র পের প্রান্তে) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে এমন জাতির উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য আমি সূর্যের তাপ থেকে আত্মরক্ষার কোন আড়াল রাখিনি। (অর্থাৎ সেখানে এমন এক জাতি বাস করত, যারা রৌদ্র-কিরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন গৃহ অথবা তাঁবু নির্মাণে অস্বীকৃত ছিল না, বরং তারা সম্ভবত পোশাক-পরিচ্ছদও পরিধান করত না।) কিন্তু-জানোয়ারের মত উন্মুক্ত মাঠে বসবাস করত।) এ ব্যাপারটি এমনই। মুজক্করনাইনের কাছে যা কিছু (আসবাবগণ) ছিল, আমি তার বৃত্তান্ত সম্যক অবগত আছি। [এতে নবুয়ত পরীক্ষার্থে মুজক্করনাইন সম্পর্কে প্রশংসারীদেয়কে এ বিষয়ে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, আমি যা কিছু রক্ষা তা সঠিক জ্ঞান ও অবগতির ভিত্তিতেই রক্ষা, ব্যাধারণ ঐতিহাসিক পন্থা নয়। এতে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের সত্যতা স্পষ্ট উঠে।]

আনুমানিক ভৌতিক বিষয়

মুজক্করনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, ফেরাজান পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা মোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং মুজক্করনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাকিরই ছিল এবং মুজক্করনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়। (বাহ্বরে মুহীত)

ثُمَّ أَتْبَعْ سَبْبًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا
لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُومَ وَمَا جُومَ
مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۖ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ
أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۖ أَتُؤْتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفِخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ قَالَ أَتُؤْتُونِي

أَفِرُّ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ
نَقْبًا ۖ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ
وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ

(৯২) আবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাটিকে দেখলেন, যারা তার কথা একবারেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল : হে মূলকারনাইন, ইরাজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আগনার জন্য কিছু কর খার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। (৯৫) তিনি বললেন : আমার পালনকর্তা আমাকে যে সাবধা দিয়েছেন, তাই অশেষ। অতএব তোমরা আমাকে ভ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে মোহর পাঠ এসে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যস্থলী কাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : তোমরা হীপরে দূর দিতে থাক। অবশেষে যখন তা জাঙনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন : তোমরা গমিত ভাষা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দিই। (৯৭) অতঃপর ইরাজুজ ও মাজুজ তার উপরে জ্বলন্ত হুগুত পড়ান না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) মূলকারনাইন বললেন : এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।

তফসীরের সাক্ষ্যসংক্ষেপ

অতঃপর (পশ্চিম ও পূর্বদেশ ভ্রম করে) তিনি আনেক দিকে পথ ধরলেন। (কোরআন এ দিকের নাম উল্লেখ করেনি, কিন্তু জনবসতি অধিকতর উত্তরদিকে। তাই তফসীরবিদগণ একে উত্তর দেশসমূহের সফর হিচ কল্পেছেন। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও এরই সমর্থন করে।) অবশেষে তিনি যখন দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন সেখানে এক জাটিকে দেখতে পেলেন, যারা (ভাষা ও অভিধান সম্পর্কে অত্যন্ত মানবোত্তর জীবন-রাপনের কারণে) তাঁর কথা একবারেই বুঝতে পারেনা। (এ থেকে জানা যাবে, তারা শুধু ভাষা সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিল না; কেননা বুদ্ধি-জ্ঞান থাকলে ভিন্নভাষীদের কথাবার্তাও ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝে নেয়া যায়। বরং পালবৎ মানবোত্তর জীবন-রাপন পদ্ধতি তাদেরকে বুদ্ধিমান থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু এরপর বোধ হয় কোন দোড়াধীর সাহায্যে) তারা বলল : হে মূলকারনাইন, ইরাজুজ ও মাজুজ (যারা পর্বতপ্রাচীর অপরপাশে বাস করে, আমাদের এই) দেশে (মাঝে মাঝে এসে প্রচুর) অশান্তি সৃষ্টি করছে। (অর্থাৎ হত্যা ও লুণ্ঠন করছে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। অতএব আমরা কি

আপনার জন্য চীদা করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করার এই মর্মে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন (যাতে তারা এদিকে আসতে না পারে) মুলকাননাইন বললেন : আমার পালনকর্তা আমাকে যে আর্থিক সাহায্য দান করেছেন, তাই যথেষ্ট (কাজেই চীদা করে অর্থ যোগান দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই)। তবে তোমরা আমাকে ক্ষতি-পারের নক্তি (অর্থাৎ ভ্রম ও মজুরি) দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও, (মূল্য আমি দেব। বলা বাহুল্য, এ লৌহ প্রাচীর নির্মাণ করার জন্য হয়তো অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানবেতর জনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু এই মানবেতর জনের দেশে লৌহ-পাতই ছিল সবচেয়েতে দুলভ বস্তু। তাই শুধু এর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। সাজ-সরঞ্জাম সংগৃহীত হওয়ার পর উত্তর পাহাড়ের মধ্যস্থলে লৌহ প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেল।) অবশেষে যখন (প্রাচীরের স্তর সংযুক্ত করতে করতে দুই পাহাড়ের) দুই চূড়ার মধ্যবর্তী (কাঁকা) স্থান (পাহাড়ের) সমান করে দেওয়া হল, তখন তিনি আদেশ করলেন : তোমরা একে দংশন করতে থাক। (দংশন করা শুরু হল) অবশেষে যখন (দংশন করতে করতে) তাকে আঙনের মত লাল অঙ্গার করে দিল, তখন তিনি আদেশ করলেন : এখন আমার কাছে পলিত ভাষা (যা হরুতা পূর্বেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল) নিয়ে এসো, যাতে আমি তা এর উপরে ঢেলে দেই। (সেখানে পলিত ভাষা এসে যন্ত্রের সাহায্যে উপর থেকে ঢেলে দেওয়া হল, যাতে প্রাচীরের সব কাঁকে প্রবেশ করে গোটা প্রাচীর একাকার হয়ে যায়। এই প্রাচীরের সৈধ্য-প্রস্থ আড়াই তাল্লাই জানেন।) অন্তঃপের (উচ্চতা ও মন্থতার কারণ) ইরাজুজ-মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং (চূড়ার নিকট হওয়ার কারণে) তাতে কোন দ্বিষ্ট করতে সক্ষম হল না। মুলকাননাইন (যখন প্রাচীরটিকে প্রস্তুত দেখলেন এবং এর নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া যেহেতু কোন সহজ কাজ ছিল না, তখন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) বললেন : এটা আমার পালনকর্তার একটি অনুগ্রহ (আমার প্রতিও, কারণ আমার হাতে এটা সম্পন্ন হয়েছে এবং এই জাতির প্রতিও, যাদেরকে ইরাজুজ-মাজুজ বিব্রত করত) অন্তঃপের যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, (অর্থাৎ এর ধ্বংসের সময় আসবে) তখন একে বিধ্বস্ত করে মাটির সমান করে দেবো। আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।—(সময় আসলে তা অবশ্যই পূর্ণ হয়।)

আনুবাদিক অভিধা: শিবর

কবী: **الناسد** - যে বস্তু কোন কিছুর জন্য বাধা হয়ে থাকে, তাকে

বলা হয়, তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, ক্রিয় হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে **الناسد** বলতে দুই পাহাড় যোঝানো হয়েছে। এগুলো ইরাজুজ-মাজুজের

পথে কথা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত।
মুলকানাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زَبْرًا لِّتَصِيدَ - শব্দটি زَبْرَة এর ব্যবচন। এর অর্থ পাত। এখানে

জৌহরত বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নিমিত্তক্য প্রাচীর ইট-পাথরের
পত্রিকর্তে জোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

لِّتَصِيدَ - দুই গহ্বরের বিপরীতমুখী দুই দিক :

قَطْرًا - অধিকাংশ তুফসীরবিদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারও

কারও মতে গলিত জোহা অথবা রাত্তা।—(কুরতুবী)

نَكَأ - অর্থাৎ যে বস্তু চূর্ণ-বিতূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

ইরাকুজ-মাজুজ কারা এবং কোথায়? মুলকানাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত :
ইরাকুজ-মাজুজ সম্পর্কে ইসরাইলী রেওয়াজে ও ঐতিহাসিক কিসসা-মাহিনীতে অনেক
ভিত্তিহীন-অলৌকিক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তুফসীরবিদও এগুলো
ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভর-
যোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংশ্লিষ্ট অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসুলুল্লাহ (সা)ও
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উন্মত্তকে অবহিত করেছেন। ইমান ও বিশ্বাস স্থাপনের
বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তুফসীর, হাদীস ও ইতি-
হাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো
বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো
নিছক ইমিত্ত ও অনুমানের উপর ভিত্তিহীন। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তারা কোন
প্রকার কোরআনের বক্তাবের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ
করাছি। এরপরে প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়াজেও বর্ণনা করা হবে।

ইরাকুজ-মাজুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা
থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইরাকুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভূত। অন্যান্য
মানবের মত তারাও নূহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে :

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقُونَ - অর্থাৎ নূহের মহাপ্রাণের পর দুনিয়াতে যত

মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক
রেওয়াজের এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইরাকুজের বাসিন্দা। একটি দুর্বল হাদীস

থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিতর্কিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাআজেলের আবির্ভাব, রীসা (খা)-র অবতরণ, ইরাজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) একদিন ছোঁর বেলা দাআজেলের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যন্ত্রার মতো হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য। (উদাহরণত, সে কান্না হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যন্ত্রার মতো হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণত জাহাত ও দোষের তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রসূলুল্লাহ (সা)-র বর্ণনার কালে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম) যেন দাআজেল খজুর বৃক্ষের ব্যড়ের মতোই রয়েছে। (অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা জ্ঞাত করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বুঝেছ? আমরা আশ্রয় করলাম : আপনি দাআজেলের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে, যেন সে আমাদের নিকটেই খজুর বৃক্ষের ব্যড়ের মতো সুকিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশংকা করি, তদ্বোধে দাআজেলের তুলনার অমান্য কৈতনা অধিক উন্নত যোগ্য। (অর্থাৎ দাআজেলের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার সুকানিলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তাবিভ হওয়ার কোন কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে) সে সুবক, যন কৌকড়ানো চুলওয়াল হবে। তার একটি চকু উপরের দিকে উল্লিত হবে (এবং অপর চকুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওয়হাব ইবনে-কুতনা। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারার 'বনু-খোযাজা' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোন মুসলমান দাআজেলের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। (এতে সে দাআজেলের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাআজেল সিরিরা ও ইরাজের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। যে আছাদ্ব বাপার, তোমরা তার সুকানিলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আশ্রয় করলাম : ইরা রসূলুল্লাহ, সে কতদিন থাকবে? তিনি বললেন : সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছর সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের

এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরম্ভ করলাম, ইরার রসূলজাহ, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াত) নামাইই পড়ব? তিনি বললেন : না, বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামাই পড়তে হবে। আমরা আবার আরম্ভ করলাম : ইরার রসূলজাহ, সে কেমন প্রত্যুত্তরে সফর করবে? তিনি বললেন : সে মেঘখণ্ডের মত প্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাঈজাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে বিশ্বাসধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বহিষ্ঠ হইবে এবং মাটিকে আর্দ্রতা দেবে, ফলে সে শস্যশ্যামলা হইয়া যাবে। (তাদের চতুর্দশ অঙ্ক তাতে চলেবে।) সন্ধ্যার যখন অস্তগত্যে ফিরে আসবে, তখন তাদের কুজ পূর্বের তুলনার উচু হইবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকিবে। এরপর দাঈজাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও ফুরুরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দু'টিকে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থকড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনূর্য ভূমিকে সন্ধান করে বলবে : তোর ভ্রাতৃধন বাইরে নিজে আস। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলবে, যেমন মৌমাছিরো তাদের সরদায়ের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাঈজাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে ভরবারির আঘাতে শিথিলিত করে দেবে। তার উত্তর খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে, যেমন তাঁর নিকটপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাঈজালের কাছে প্রকৃত চিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলাই হযরত ইসা (আ)-কে নানিয়ে দিবেন। তিনি দু'টি রতিন চাদর পরে দামেক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারের কেন্দ্রলভাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির কোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই সোঁসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির কোঁটা পড়বে। তাঁর হাস-প্রহাস যে কাফিরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর হাস-প্রহাস তাঁর দু'টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ইসা (আ) দাঈজালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুলুদে গিরে তাকে ধরে কৈলবেন। (এই জনপদটি এখনও বাবুলুল মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামাই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, মেঘডরে মানুষের চোখাধার হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে আল্লাতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন।

এযভাবেই আল্লাহ তা'আলা মোষণা করবেন : আমি আমার বাঙ্গাদের মধ্য থেকে এমন লোক বেছে করব যাদের মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আগনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে যান। (সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুব-মাক্কের রাজা খুঁজে দেবেন। তাদের প্রুত চলার আশ্রয়ে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের

প্রথম দলটি তবরিস্কা উপসাগরের কাছ দিয়ে বাওন্নার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ইসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তক এক দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ইসা (আ) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাভের জন্য আত্মাহুত করে দোয়া করবেন। (আত্মাহুত দোয়া করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগ-বাধি পাঠাবেন। ফলে অজস্রদের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের সৈন্যী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ইসা (আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্থ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ইসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা আত্মাহুত দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়)। আত্মাহুত আত্মা ও মস্তক কবুল করেন এবং খিল্লাটকর পাখী প্রেরণ করবেন, তাদের খাড়া হয়ে উঠে মস্তক সত। (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আত্মাহুত করা করবেন, সেখানে ফেল দেবে।) কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর স্থিতি বর্ণিত হবে। কোন নগর ও নগর এ স্থিতি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ খোঁজ হয়ে কাঁচের মত পলিকার হয়ে যাবে। অতঃপর আত্মাহুত আত্মা ভূপৃষ্ঠকে আবেশ করবেন। তোমার পেটের সমুদয় কল-কুল উদ্গিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল গোয়কর আহারের জন্য মথেন্ট হবে এবং মানুষ তার ফল খাওয়া ছাড়া তৈরি করে ছাড়া লাভ করেন। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্র দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক ঘোড়ার জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি গরুর জন্য মথেন্ট হবে। (চলিল বহর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শক্তিশালী অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে, তখন) আত্মাহুত আত্মা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুসুখে পতিত হবে, শুধু কাফির ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে অজ্ঞ-জানোয়ারের মত খোঁজাখুঁজি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদে রেওয়াজেতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে : তবরিস্কা উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বাস্তব মৌকাদাস সংলগ্ন পাহাড় আব্বাল-খমরে আত্মাহুত করে মোক্ষা করবে : আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে ভীত নিক্ষেপ করবে।

আজাহর আদেশে সে তাঁর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আজাহরের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।) :

দাআজানের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবু সাইদ খুদরীর রেওয়াজেতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাআজাল মদীনা মুনওরার কাছে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রন্থাগার ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন : আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুমি সে দাআজাল যার সংবাদ রসূলুজাহ্ (সা) আমাদেরকে দিয়ে-
ছিলেন। (একথা শুনে) দাআজাল বলবে : লোক সকল! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা
করব পুনরায় জীবিত করে দেই, তবে আমি যে খোদা এ স্থানগে ভোমরা সন্দেহ করবে
কি? সবাই উত্তর দেবে : না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে
দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাআজালকে বলবেন : এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে
গেছে যে, তুমি-ই সে দাআজাল। দাআজাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ
হবে না।—(মুসলিম)

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে আবু সাইদ খুদরীর ঐতিহাসিক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূ-
লুজাহ্ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আজাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বলবেন,
আগনি আগনার সন্তানদের মধ্য থেকে আহাম্মাদীদেরকে জ্বলে আনুন। তিনি আরও
করবেন, যে পরওয়ারদিগার তারা কর্ণা? আজাহ্ তা'আলা বলবেন : প্রতি হাজারে মর
শত নিরানব্বই জন আহাম্মাদী এবং মাত্র একজন জাহালাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে
কিয়াম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসূলুজাহ্, আমাদের মধ্যে সে একজন
জাহালাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন : চিন্তা করো না। এই মর শত নিরানব্বই জন
আহাম্মাদী ভোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইরাজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের
হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ঐতিহাসিক বর্ণিত
রয়েছে, রসূলুজাহ্ (সা) বলেন : আজাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ
করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইরাজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট এক ভাগে
সমগ্র বিশ্বের মানুষ।—(রাহল মা'আনী)

ইবনে-কাসীর 'আল বোদারী ওয়ালেহারা' গ্রন্থে এসব রেওয়াজেতে উল্লেখ করে
কলেন : এতে বোঝা যায় যে, ইরাজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে
অনেক বেশি হবে।

মসনদ আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে
যে, রসূলুজাহ্ (সা) বলেন : ইসা (আ) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান
করবেন। মুসলিমের এক রেওয়াজেতে সাতবছরের কথা বলা হয়েছে। 'কতহল বারী' গ্রন্থে
হাকিম ইবনে হাজার একে অন্তর্ভুক্ত সাক্ষ্য করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন।
হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য
বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার জেশযার থাকবে না। দু'ব্যক্তির
মধ্যে কোন সমস্যা বগড়া-বিবাদ হবে না।—(মুসলিম ও আহমদ)

যোথারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (স)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইরাকুজ-মাকুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হক ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।—(মায়হারী)

যোথারী ও মুসলিম হযরত যরনব বিনতে জাহশের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) একদিন সূর্য থেকে এমন অবস্থার জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাক্ত এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত-হচ্ছিল :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ قَتَحُ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ
يَا جَوْجُ وَمَا جَوْجُ مِثْلُ هَذِهِ وَحُلِيِّ تَعْنِينَ

“আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিশ্চিতবর্তী। আজ ইরাকুজ-মাকুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি হুজারিল ও তর্জনী মিজিরে হস্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যরনব (রা) বলেন : একথা শুনে আরব কর্তৃগাম : ইয়া রসূলুল্লাহ আশ্বাসের মধ্যে সংকল্পপূর্বকভাবে জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে, যদি অনাচারের আধিক্য হয়।—(আল বেদায়ী ওয়ায়েহায়াহ) ইরাকুজ-মাকুজের প্রাচীরে হস্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে।—(ইবনে কসীর, আবু হাইয়ান)

যসনদ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ইরাকুজ-মাকুজ প্রত্যহ মূলফারমাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে-খুঁড়তে তারা এলৌহ প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে কিন্নে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়বে। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় কিঞ্চিত মেনে। পরের দিন ইরাকুজ-মাকুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করল। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল, যতদিন ইরাকুজ-মাকুজকে বজরাখা আগাহর ইচ্ছা করত। যেদিন আল্লাহ তা‘আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে : আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে উপরে চলে যাব। (আজাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতঃপর পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিযী এই রেওয়াজেতে **أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ** সূত্রে বর্ণনা করে বলেন :

— غريب للفرقة الاقرب هذا الوجه — ইবনে কাসীর তাঁর তকসীয়ে রেওরা-
য়েতটি বর্ণনা করে বলেন

— اما دله جيد قوى ولكن مثله في رفعه كماره — এর সমুদ্র উত্তর ও পশ্চিমাদী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রসুলুল্লাহ (স)-র কিনা, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে-কাসীর ‘আক-বেদারী-ওরাদেহায়ে’ গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন :
হদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসুলুল্লাহ (স)-র নর্য বরং কা'ব
আহবাবের বর্ণনা তবে এটা যে ধর্মত্যা ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি
একে রসুলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে,
ইস্রাহীল-আজুজের প্রাচীর ধ্বংস করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের
সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিন্ন করা যাবে না এটা
তখনকার কবর, যখন যুদ্ধকারনাইন প্রাচীরটি নিরূপ করত্বহীন। কাজেই এতে কোন
বৈপরীত্য নেই। তাহাড়া আরোও বলা যায় যে, কোরআনে ছিন্ন বলে এগার-ওপার ছিন্ন
বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পল্লিকার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিন্ন এগার-ওপার হবে।
(বেদারী, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ)

হাকেম ইবনে হাজার ‘কুতুল বারী’ গ্রন্থে এই হাদীসটি আবিদ ইবনে-হযার্ন
ও ইবনে-হাক্কানের বরাতে দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন : তারা সুবিধি হযরত কা'তাদাহ
থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সম্পদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বোখারীর
ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রসুলুল্লাহ (স)-র উক্তি এ বিষয়ে কোন সম্পদ প্রকাশ
করেননি। তিনি ইবনে আব্বাসীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মুজিবা
রয়েছে : এক, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের চিন্তাধারার দিককে নিশ্চিত হতে দেননি সে, প্রাচীর
ধ্বংসের কাজ অবিরাম দিব্যরূপে অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিনটি রাত্রির কর্মসূচী আলাদা
আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জরুরি পক্ষে যাতেই কঠিন ছিল না।
দুই, আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পল্লিকার দিকে থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে
সম্মিলিত করেছেন। অথচ ওরাদে ইবনে-সুনাবের রেওরায়ের থেকে জানি যায় যে,
তাঁরা কুশিগিরে পারদর্শী ছিল। সব প্রকম যত্নপাতি তাঁদের কাছে ছিল। তাদের
দৃষ্টিে বিভিন্ন প্রকার সূক্ষণ ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায়
হুষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। তিন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে
‘ইনশাআল্লাহ’ বাক্য কখনো জঁপত হয় না। তাদের মনের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই
কিছল তাঁদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আব্বাসী বলেন : এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইস্রাহীল-আজুজের
মাঝে কিছু সংখ্যক লোক এখনও রয়েছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছার বিশ্বাস রাখে।
এটাও সত্য যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত
করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধিলাভ করবে। — (আসারাতুস
সাদা, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্তু বাস্তব বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পর-
গম্বুদের দাওয়াত পৌছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের আহ্বানমেন্ন শক্তি

না হওয়াই উচিত। কোরআন বলে :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نُنْفِثَ رِسَالًا

—এতে বোঝা যায় যে, তারাও ইমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে অঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আত্মাহুত অভিশ্রু ও ইচ্ছার বিরাজী হবে। তবে রিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ইমানের জন্য যথেষ্ট নয়। যেটুকু ইনশাআল্লাহ্ কলম্বা কলম পরও কুফরের অভিহিত থাকতে পারে।

হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অজিত করা যায় : উল্লিখিত হাদীসসমূহে ইরাক-মাক্ক-মাক্ক-মাক্ক (স) থেকে নিম্নলিখিত বিবরণি প্রমাণিত হয়েছে :

১. ইরাক-মাক্ক সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ (আ)-র সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইরাকের ইবনে নূহের বংশধর সনাক্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইরাকের বংশধর নূহ (আ)-র আমল থেকে মুসলমানরাইনের আমল পর্যন্ত মুরূরাভূত বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইরাক-মাক্ক, জরুরী নয় যে, তারা সবাই মুসলমানরাইনের প্রাচীরের উপরে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইরাক-মাক্ক শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর অসভ্য ও স্বভাবগত, জাতি। মোগল তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, ওরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তারা নামের বাইরে।

২. ইরাক-মাক্কের সংখ্যা বিস্তারিত সময় জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি, ক্রমশঃ এক ও দশের বারবান।—(২ নং হাদীস)

৩. ইরাক-মাক্কের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র মুসলমানরাইনের প্রাচীরের কাছে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তাঁরা কিরামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বেলা হওয়ার সময় মেহদী (আ)-র আবির্ভাব, জন্তঃপন্ন দাওয়াতের আগমনের পরে হবে, যখন ইসা (আ) অবতরণ করে দাওয়াতের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন।—(১ নং হাদীস)

৪. ইরাক-মাক্কের মুক্ত হওয়ার সময় মুসলমানরাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমস্তজন্মের সমান হয়ে যাবে।—(কোরআন) তখন ইরাক-মাক্কের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় সুভাগ্যবশত কারণে মনে করে যেন তারা পিছলে পিছলে নিচে পড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জন-বসতি ও সময় পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনকার্যের মুখাবলি করার সাধা কান্ডও থাকবে না। আরাকের রসুল হযরত ইসা (আ) ও আত্মাহুত আদেশে মুসলমানদেরকে রক্ষা নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে যেখানে ফেড়া ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আশ্রয়গণন করে গ্রাণ বৃষ্টি করবেন। যানাহারের রসদ-সামগ্রী বিশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের

মুলা আকশদুদী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে ধ্বংস করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।—(১ নং হাদীস)

৫. হযরত ইসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই সোনার এই পলপালসদৃশ অগ্নিত জৈক সিংগিত হয়ে যাবে। তাদের হৃৎসেহ সমগ্র ভূগর্ভকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্ভিক্ষের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুর্ভয় হয়ে পড়বে।—(১ নং হাদীস)

৬. অস্ত্রাণের ইসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই সোনার তাদের হৃৎসেহ সমুদ্রে নিমজ্জিত অলস কদুশা করে দেবে এবং বিহবানী কুটিল মাধ্যমে সমগ্র ভূগর্ভকে ধ্বংস পাক-সাক করা হবে।—(১ নং হাদীস)

৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তুর্ক তার বরকতসমূহ উপদ্রব করছে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিরূদ্ধ করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।—(৩ নং হাদীস)

৮. শান্তি ও শৃংখলার সময় কলক পৃথের হুজ ও ওয়রার অব্যাহত থাকবে।—(৪ নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ইসা (আ)-র ওফাত হবে এবং তিনি রসুলুল্লাহ (সা)-র সওয়া যোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ তিনি হুজ ও ওয়রার উদ্দেশ্যেই হেজাজ সফর করার সময় ওফাত পাবেন।—(মুসলিম)

৯. রসুলুল্লাহ (সা)-র জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, হুজরারাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সত্য্য করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়ায় কেউ কেউ প্রকৃত অর্থে মিরেহন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বুঝেছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইরাক-বাকুজের বের হওয়ার সময় মিলটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধ্যাপনরূপে প্রকাশিত হবে। وَاللَّهُ اعْلَمُ

১০. হযরত ইসা (আ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন।—(৩ নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহদী (আ)-এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীক বরযজী "আসন্নাতুস সালাহ প্রহের ১৪৫ পৃষ্ঠার লেখন : লাআজলের হত্যা ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসা (আ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠার বলা হয়েছে : হযরত মাহদী (আ) হযরত ইসা (আ)-র বিশেষ উপর কর্তব্য বহর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয় কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূগর্ভে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তুর্ক তার সব বরকত ও গুণত্বন উপদ্রব করে দেবে। কেউ ফকির-মিসকীন থাকবে না। পলপালের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য মাহদী (আ)-র

শেষ আমলে দাঈয়াল এসে মক্কা-মদীনা বারতুল-মাক্কাদাস ও তুর পর্বত বাড়ীতে সর্বত্র দাঈয়া-হাসামা ও কিতনা ছড়িয়ে দেবে। এই কিতনাটি হবে বিশ্বের সর্বত্র কিতনা। দাঈয়ালের অবস্থান ও দাঈয়া-হাসামা আর চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তত্বতো প্রথম দিন এক বছরের দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মতো। এখানে প্রকৃতপক্ষে দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা শেষ যুগে গ্রাহ্য সব ঘটনাই অত্যন্ত বিকৃত হবে। এখনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে কিন্তু হাদীস-শ্রবক জানা যায় যে, দাঈয়াল হবে অসাধারণ মানুষ। কাজেই তার মানুষ প্রভাবে দিব্যারাত্রির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষণিক-ভাবে পড়তে পারে। তারা একে একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিব্যারাত্রি পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিন শ' বাই দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীরের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই করায় হত। মোটকথা দাঈয়ালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে।

এরপর হযরত ইসা (আ) অবতরণ করে দাঈয়ালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার কিতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইরাজুজ-মাজুজ বের হবে। তারা তুপানের সর্বত্র হত্যা ও ছুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ইসা (আ)-র সোনার তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত য়হদীর আমলের শেষ ভাগে এবং ইসা (আ)-র আমলের শুরুতে দাঈয়াল ও ইরাজুজ-মাজুজের দুটি কিতনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তছনছ করবে। এই কয়েক দিনের পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্ব ন্যায় ও সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং রক্ত ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ইসা (আ)-র আমলে ইসরায়ীল বাড়ীতে কোন কলমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। হিংস্র এবং বিমাতৃ জীবজন্তুও একে অপরকে কষ্ট দিবে না।

ইরাজুজ-মাজুজ ও মূলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এ সব তথ্য কোরআন ও হাদীস উন্মত্তকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা না-আম্রম। মূলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইরাজুজ-মাজুজ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এ সব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা-বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আওয়াল-ভাবোল বকাবকির জওয়ার এবং অতিরিক্ত ভান লাভের উদ্দেশ্যে আলিমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার নিরূপণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুন্দীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইরাজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একশটি গোত্রকে মূলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ

কর দেয়া হয়েছে। একটি পের প্রাচীরের এগারে রুয়ে গেছে। আর সে পেরটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেন : রমজুদাহ্ (সা) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইরাজুজ-মাজুজের সাথে খাপ খায়। শেষ যমাদায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা সহীহ মুসলিম বর্ণিত রয়েছে। অন্তঃপর কুরতুবী বলেন : বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিশৃঙ্খলক জোক মুসলমানদের শ্রাবণিকা করার জন্য অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা জানা হ'তামাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। যেন হয় যেন তারা ইরাজুজ-মাজুজের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।— (কুরতুবী, একালম খণ্ড, ৫৮ পৃঃ কুরতুবী সময়কাল বর্ণিত হিজরী। তখন তাতারীদের কিতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী জিজ্ঞাসক তখনই করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই কিতনা সুবিস্তৃত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর, তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইরাজুজ-মাজুজের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের কিতনাকে ইরাজুজ-মাজুজের আবির্ভাব বলেননি, বা কিরামাতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিচয় বলা হয়েছে যে, ইসা (আ)-র অবতরণের পর তাঁর আমলে ইরাজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তরুসীর রাহুল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইরাজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন : এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য ভ্রমের পথপ্রস্তুত এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের কিতনা ইরাজুজ-মাজুজের কিতনার সমতুল্য।—(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উত্তরকেই ইরাজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের কিতনা ইরাজুজ-মাজুজের কিতনার সমতুল্য, তবে তা সত্য হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কিরামাতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইরাজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ইসা (আ)-র অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথপ্রস্তুত এবং হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকার সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইরাজুজ-মাজুজ, মুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানগুলি সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজ্ঞিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাজাক ও তরুস নামে অভিহিত পোরসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইরাজুজ-মাজুজের বসতি অবস্থিত তাদের উত্তরের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের

নবম অংশে প্রবেশ করেছেন এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালায় আঁখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে খরদাযবাহ্ বীর ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়ালিদ-বিজাহ্ এর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বলেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর সুখপাত্র সজ্জা করে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।—(ইবনে খলদুনের ‘মুকাদ্দামা’ ৭৯ পৃঃ)

আব্বাসী খলীফা ওয়ালিদ বিজাহ্ কর্তৃক মূলকান্নাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্য একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে কাসীরও ‘আল-বোদারী ওয়ালেহাযহ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আমরা বর্ণিত করেছি যে, এই প্রাচীর লোহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবার দরজাও আছে এবং এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তব্বাসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, বর্ণিত এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চার, গাইও তাকে এমন লড়াপাতাবিহীন প্রান্তরে পৌছে দেয়, যা সমরক্ষণের বিপরীত দিকে অবস্থিত।—(তব্বাসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

ফরেক উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ ফারুখী (রহ) ‘আব্বাসীদুল ইসলাম ফী হাযাতে ইসা (আ) গ্রন্থে ইরাজুজ-মাজুজ ও মূলকান্নাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়াজের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেন : দুক্কতকারী ও বর্বর মানুষদের জুটন থেকে আশ্রয়কার জন্য পৃথিবীতে এক নর—বহু জাতির প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন স্থানে-নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্ব-প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আরু হাইয়ান আম্বালুসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বলে শত মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিচ্ছায়া হচ্ছে চীন সম্রাট ‘ফুগুয়’। এর নির্মাণের তারিখ আদম (আ)-এর অবতরণের তিন হাজার চার শত মাইল পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা ‘জানকুদাহ’ এবং তুর্কীরা ‘বুরকুনক’ বলে থাকে। তিনি আরও বলেন : এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মাওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ালী (রহ) কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ইরাজুজ-মাজুজের জুটন ও ধ্বংসকারী সাধনের প্রতিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ান পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বত্র তাদের আক্রমণের শিকার। এই ইরাজুজ-মাজুজের জমিষ্ট থেকে আশ্রয়কার জন্য বিভিন্ন

সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর যথা এশিয়ার বুখারা ও তিরমিষের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানইজ্জ নাম দরবন্দ! এই প্রাচীরটি খাতনামা যোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। ইরান সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্মনীও তার প্রায়ে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট ফাষ্টাইলের দূত জ্যাকবুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে গৌছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন : বাবুল হানীসের প্রাচীর মুসলেন এ পথে অবস্থিত, যা সময়কাল ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।—(তরুসীয়ে জওয়াহেরুল-কোব্রআন, তানভাজী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিষ্টানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওলাব নামে খ্যাত। ইরাকুত হমদী 'মুজামুল বুলদানে,' ইন্দরীসী 'জুগরাফিক্স'র এবং বুতানী 'দারেকুল মা'আরিক' এর অবস্থা বিস্তারিত লিখিত করেছেন। এর সঙ্গ-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

দাগিষ্টানে দরবন্দ একটি রাশিয়ান শহর। শহরটি কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দ, নওশেরওরী নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওলাব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওলাব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ হালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দাগিষ্টান নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে ককেশাস অথবা আবালে-কোফা অথবা কাক পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুতানী এ সম্পর্কে লেখেন :

এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল-আবওলাব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছে। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকানদের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওরীর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইরাকুত বলেন : পণ্ডিত ভাষা দ্বারা এটি নিশ্চিত হয়েছে।

—(দারেকুল-মা'আরিক ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নিৰ্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে মূলফরনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক যত্নসহিত দেখা গিয়েছে। কেননা, উত্তরফরনৈর নাম দরবন্দ এবং উত্তরফরনৈ প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লিখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রাচীন চীনের প্রাচীর মূলফরনাইনের প্রাচীর নয়, এ

বিস্ময়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়—দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেছে। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাহারী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ান এলাকা বাবুল-আবওন্নাভের দরবন্দ নামক স্থানে কাম্পিরানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। এক দাগিস্তান ককেশিয়ান এলাকা বাবুল-আবওন্নাভের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই আরও উচ্চ কাফকায অথবা কাক অথবা ককেশাস পর্বতমালার অবস্থিত প্রাচীর; উত্তর স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাস্মীরী (রহ) 'আকীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে উত্তর প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালার অবস্থিত প্রাচীরকে অপ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীর-সমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা এ কথাও স্বীকার করেন না যে, ইরাজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবদি বন্ধ রয়েছে। এরূপে ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও এ কথা বলতে লিপ্ত হতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইরাজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই মের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাহিন্যের বেগে উদ্ভিত ভাষ্যকারদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইরাজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাজ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রাসুল মা'আনীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইরাজুজ-মাজুজ অভিযানকে কিয়ামতের আজামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওরাম ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিচয় বলা হয়েছে যে, ইরাজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাঙ্কালের আবির্ভাব এবং ইসা (আ)-র অবতরণ ও দাঙ্কাল হত্যার পরে। দাঙ্কালের আবির্ভাব এবং ইসা (আ)-র অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইরাজুজ-মাজুজের কোন কোন পোতা এগারো চলে এসেছে—একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়—যদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংসজুগে পরিণত-

৬৪৯

কারী সর্বশেষেও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাখলার
আবির্ভাব এবং ইসা (আ)-র অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত উম্মাদ আল্লাহা কাস্মীরী (রহ)-এর সূচিভিত্তিক বক্তব্য এই :
ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূগুপ্ত ভ্রম ভ্রম করে খুঁজে
দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, হযরত তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা
বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য,
সমুদ্র ও বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জানমাত্র করতে পারেনি। এ ছাড়া! এরূপ সভাবনাও
দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক
সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কিয়ামতের পূর্বে
প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইরাজুজ-মাজুজের কিছু গোত্র এগারে এসে
যাবে—কোরআন ও হাদীসের কোন অকাটা প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়। মুলকার-
নাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষর থাকবে—এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে

পাকের আয়াত **فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ** অর্থাৎ মুলকারনাইনের

এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ ইরাজুজ-মাজুজের
বেগ্নিয়ে আসার সময় হবে,) তখন অ'লাহ তা'আলা এই জোহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ

করে দেবেন। এই আয়াতে **وَعْدُ رَبِّي** (আমার পালনকর্তার ওয়াদা)-এর অর্থ

কিয়ামত নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনের ভাষা-এই অর্থ অকাটা নয়, বরং এর পরিষ্কার
অর্থ এই যে, মুলকারনাইন ইরাজুজ-মাজুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা
সদাসবদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ তা'আলা ইরাজুজ-মাজুজের পথ
মুলে দেওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা
কিয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সে সত্ত্বেও সব তকসীরবিদই

وَعْدُ رَبِّي এর অর্থে উক্ত সভাবনা উল্লেখ করেছেন। তকসীর বাহসে-মুদ্বীতে বলা

হয়েছে :

**وَالْوَعْدُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْ يَرَادَ بِهِ وَقْتُ
خُرُوجِهَا جَوْجَ وَمَا جَوْجُ -**

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং
ইরাজুজ-মাজুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। যত হিজরীর ভাভারী ফিতনাকে এর
সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা
হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সত্য জাতিব আবির্ভাব ও এসের স্পষ্ট ফিতনাকে
কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফিতনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন

ও মানুষের পছন্দ হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই কিতনা এমন অকৃত্রিম হত্যাযজ্ঞ, দুটভরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সার্বমর্ম আশঙ্ক্য এই দাঁড়ান যে, তুচ্ছতকবরী ইরাজুজ-মাজুজেরই কিছু পোহ এগারে এসে সত্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলাহকে দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট কিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইরাজুজ-মাজুজের সৈন্য বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহর বাণীর তফসীর অনুযায়ী এগারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরসিবি ও মসনদ আহমদের এককী হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইরাজুজ-মাজুজ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে **معول** - দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইরাজুজ-মাজুজ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ' বজার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইরাজুজ-মাজুজের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশত্যাে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করে এগারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ এ কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইরাজুজ-মাজুজ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এগারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

মোট কথা, কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাটা প্রমাণ নেই যে, খুলফারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষর থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এগারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও সামুদ্রিক-আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চড়াচ, ভরাবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইরাজুজ-মাজুজের প্রাচীর ভেঙ্গে রক্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাটা ফয়সালা করা যায় না, তেমনি এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কালের থাকে অক্ষর। উক্তরসিকেরই সত্যথনা রয়েছে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ**

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوتُ فِي بَعْضٍ وَتَفَرَّ فِي الْمَصُورِ
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۖ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ
كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۚ

(৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তরসীর আকাশে ছেড়ে দেব এবং নিজার ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। (১০০) সেদিন আমি কাফিরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) তাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আবার স্মরণ থেকে এবং তারা গুনতেও সক্ষম ছিল না।

তরসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি সেদিন (অর্থাৎ যখন প্রাচীর বিধ্বস্ত হওয়ার প্রতিশ্রুতির দিন আসবে এবং ইরাজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হবে, তখন আমি) তাদের এমন অবস্থা করে ছাড়ব যে, একদল অন্য দলের ভেতর ঢুকে পড়বে। (কেননা তারা অগণিত সংখ্যার একযোগে বের হয়ে পড়বে এবং সবাই একে অপরকে ডিসিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।) এবং (এটা ফিরাকতের নিকটবর্তী সময়ে হবে। এক কিছুদিন পর ফিরাকতের প্রতিষ্ঠা শুরু হবে। প্রথমবার শিয়ার ফুৎকার দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব নান্দানাবুদ হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার) শিয়ার ফুৎকার দেওয়া হবে। (ফলে সবাই জীবিত হয়ে যাবে। অতঃপর আমি সবাইকে একজন একজন করে (হাশরের মাঠে) একত্র করব এবং জাহান্নামকে সেদিন কাফিরদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব, যাদের চোখের উপর (দুনিয়াতে) আমার স্মরণ থেকে (অর্থাৎ সত্যধর্মকে দেখার ব্যাপারে) পর্দা পতিত ছিল এবং (তারা যেমন সত্যকে দেখত না, তেমনিভাবে তাকে) গুনতেও পারত না। (অর্থাৎ সত্যকে জানার উপায় দেখা ও শোনা উভয় পথই তারা বন্ধ করে রেখেছিল)।

আমুখরিক ভাষায় বিবরণ

وَجَعَلْنَا سُلَّاتًا لَّهُمْ--بَعَثْنَاهُمْ فِي مِثْلِهِمْ--وَجَعَلْنَا سُلَّاتًا لَّهُمْ--بَعَثْنَاهُمْ فِي مِثْلِهِمْ--وَجَعَلْنَا سُلَّاتًا لَّهُمْ--بَعَثْنَاهُمْ فِي مِثْلِهِمْ--
এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত ইরাজুজ-মাজুজকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরদলের মধ্যে ঢুকে পড়বে—বাহ্যত এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে শূন্যবেসে নিচে অবতরণ করবে। তরসীরবিদগণ অন্যান্য সত্যবিনাও লিখেছেন!

وَجَعَلْنَا سُلَّاتًا لَّهُمْ--بَعَثْنَاهُمْ فِي مِثْلِهِمْ--
এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে জিন ও মানবজাতিকে একত্র করা হবে।

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّنَا
أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ
رَبِّهِمْ أَجَلًا ۝ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝ ذَٰلِكَ
جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

(১০২) কাক্বিররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিকল্পিত আমার বাণীদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাক্বিরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন : আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) তারা ই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পৃথিবীজীবনে বিফল হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (১০৫) তারা ই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাঁদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব দিই করব না। (১০৬) জাহান্নাম—এটাই তাদের প্রতিফল; অবশ্য, তারা কাক্বির করছে এবং জাহান্নামের নিদর্শনাবলী ও রসুলগণকে বিহীন করে নিষ্ফলরূপে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফারদোস কিয়ামাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।

তাক্বীরের সার-সংক্ষেপ

এরপরও কি কাক্বিররা মনে করেন যে, আমার পরিকল্পিত আমার বাণীদেরকে (অর্থাৎ যারা আমার মালিকানাধীন এবং আমারই আদেশের গোলাম, ইচ্ছাকৃতভাবেই অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে) অভিভাবক (অর্থাৎ উপাস্য ও অভাব পূরণকারী) রূপে গ্রহণ করবে? (এটা শিরক ও পরিকার কুফর)। আমি কাক্বিরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (ব্যঙ্গভাবে অভ্যর্থনা বলা হয়েছে। তারা যদি তাদের প্রকল্পিত সৎ কর্মের জন্য গর্ববোধ করে এবং এ কারণে নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত, অস্বাভ থেকে মুক্তি মনে করে, তবে) আপনি (তাদেরকে) বলুন : আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক, পৃথিবীজীবনে যাদের কৃত পরিশ্রম (সৎ কর্ম সম্পাদন যা করেছিল) খুবই বিফল হয়েছে এবং তারা (মুর্খতাবশত) মনে করেছে যে, তারা ভাল কাজই করছে। (অন্তঃপর

তাদের উদাহরণ এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের পরিভ্রম বিফল হওয়ার কারণও জ্ঞান যাত্রা এবং প্রসঙ্গক্রমে কর্ম বিফল হওয়ার বিষয়াদিরও বিবেচন হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ কিয়ামত) অস্বীকার করে। (তাই) তাদের সব (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব, কিয়ামতের দিন আমি তাদের (সৎকর্মের) অন্য সামান্য ওজনও হির করব না। (কুর'ন) তাদের প্রতিফল তাই হবে (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ) জাহান্নাম। কারণ, তারা কুফর করছিল এবং (এই কুফরের একটি শাখা এমনও ছিল যে) আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে উপহাসের বিষয়ক্রমে গ্রহণ করেছিল। (অতঃপর তাদের বিপরীতে ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (তাদেরকে কেউ বের করবে না) এবং সেখানে থেকে অন্যর যেতে চাইবে না।

আমূলিক আভ্য বিষয়

— اَنْكَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مَحْسِنِينَ اُولَٰئِكَ

তুফসীর বাহরে মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে কিছু বাক্য উহা রয়েছে। অর্থাৎ
 — يَتَّخِذُوا بِهِمْ نَفْعًا وَيَتَّقُونَ بِذَلِكَ الْاِتِّخَاذِ
 আমাদের পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, তারা কি মনে করেন যে, ও কখন তাদেরকে উপকৃত করবে এবং ওঁ যারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিতাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

عِبَادِي (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পঙ্গপালগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহর শরীকরূপে হির করা হয়েছে, যেমন হযরত ওয়ালের ও ইসা (আ)। কিছু সংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষান্তরে ইহুদীরা ওয়ালের (আ)-কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ইসা (আ)-কে আল্লাহর

শরীকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে اَلَّذِينَ كَفَرُوا বলে কফরকারদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তুফসীরবিদ এখানে 'আমার বান্দা' অর্থ নিয়েছেন শরতান। সুতরাং اَلَّذِينَ كَفَرُوا -এর অর্থ হবে যারা শরতান ও যাদের উপাসনা করে। কেউ কেউ 'আমার বান্দা' অর্থ ও হজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাক্ষর করে দিয়েছেন। ফলে আত্মন, মূর্তি, তালক্বা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও

এর অন্তর্ভুক্ত করে গেছে। তুফসীরের সঙ্গ-সংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাহ্যিক মুহীত প্রকৃতি গ্রহে প্রথম তুফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَلِيٍّ—এটি—أَوْلِيَاءَ—এর ব্যবহৃত। আত্মবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে

ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অর্থাৎ পূরণকারী, যা সত্য উপাস্যের বিশেষ ভণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

أَلَا خَسْرًا—এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত

করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সহ্য করে করে তাতে পরিত্রাণ করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সে পরিত্রাণ বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এক্ষেত্রে দুটি কারণ সৃষ্টি হয়। এক, দ্বন্দ্ববিবাদ এবং দুই, লোকদেওয়ানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ সব বিশ্বাস ও ইমানে ঠিক নয়, সে বড় ভুল কাজই করছে, যত পরিত্রাণই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকদেওয়ানো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খাদেজী সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তুফসীরবিদ মু'তাযিলা, শাওকাতের ইত্যাদি বিভাগ সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের দৃষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাকিত্বকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ عَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ

রাসুল, মাহফুজী প্রকৃতি গ্রহে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাকিত্ব সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যত তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, তাদের অপবিভাগ তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিত্রাণ নিষ্ফল করে দেয়। হয়রত আলী ও সা'দ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

فَلَا تَقْرَبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثًا—অর্থাৎ তাদের আত্মীয় বাহ্যত বিরাট

বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা কুরক ও শিকারের কারণে তাদের অমিল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর স্বেত্তারোহিত মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘমেয়াদী মূলকার ব্যক্তি আসবে, আল্লাহর কাছে মাহির

জামাত সমাপ্তিমাগও তার ওজম হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন পাও,

তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ কর : **لَا تَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا**

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো হুজতান্ন নিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের সমান হবে, কিন্তু ন্যায়-বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় এগুলোর কোন ওজনই থাকবে না।

فَرَدَّ وَسْ—جَنَاتُ الْفِرْدَوْسِ—এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী শব্দ। না জামাত ও বিয়রে মতভেদ রয়েছে। আর জামাতের বলেন, তারাও ফারসী রোমী, না সুরইল্লনী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

যোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রুসুল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা যখন আজাহর কাছে প্রার্থনা কর, তখন জামাতুল-ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা আজাহরের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আজাহর আরশ এবং এখান থেকেই জামাতের সনদ নহর প্রবাহিত হয়েছে।—(কুরতুবা)

لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حَوْلًا—উদ্দেশ্য এই যে, জামাতের এ স্থানটি তাদের জন্য

অক্ষর ও চিরস্থায়ী নিরাশ্রিত। কেননা, আজাহর তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জামাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জামাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জামাতও একটি প্রমোদস্থানের মত মনে হতে থাকবে। আশোচ্য জামাতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জামাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মূর্খতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জামাতে যাবে, জামাতের নিরাশ্রিত ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশের সময়ে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জামাত থেকে বাইরে যাওয়ার ইচ্ছাও কোন সময় কারও মনে আগবে না।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِدَ كَلِمَتِي لِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَهًا كَمَا إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

(১০৯) বলুন : আমার পালনকর্তার কথা, সেখান জন্মে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। (১১০) বলুন : আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাশা হয় যে, তোমাদের ইলাহুই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সংকল্প সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি লোকদেরকে বলে দিন : যদি আমার পালনকর্তার বাণী (অর্থাৎ যেসব বাক্য আলাহ্ তা'আলার শুণাবলী ও উৎকর্ষ বোঝায় এবং এসব বাক্য দ্বারা কেউ আলাহ্‌র শুণাবলী ও উৎকর্ষ বর্ণনা করে, তবে এসব বাণী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি) কালি হয় (এবং উদ্ভাৱা লেখা শুরু করে) তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে (এবং সব কথা আয়ত্তে আসবে না)। যদিও সমুদ্রের অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র (এর) সাহায্যার্থে আমি এনে দেই (তবুও সে বাণী শেষ হবে না, অথচ দ্বিতীয় সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। এতে বোঝা গেল যে, আলাহ্‌র বাণী অসীম। তাঁর পরিবর্তে কাকিররা হাদেরকে আলাহ্‌র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন নয়। তাই বিশেষ করে তিনিই একমাত্র উপাস্য ও পালনকর্তা। কাজেই তাদেরকে) আপনি (একথাও) বলে দিন : আমি তো তোমাদের সবার মতই একজন মানুষ (খোদায়ীর দাবীদার নই এবং ক্ষেত্রেশতা হওয়ার দাবী করি না। তবে হ্যাঁ) আমার কাছে (আলাহ্‌র পক্ষ থেকে) ওহী আসে (এবং) তোমাদের সত্য মা'বুদই একমাত্র মা'বুদ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে (এবং তার প্রিয়পাত্র হতে চায়), সে যেন আমাকে রসূল স্বীকার করে, আমার শরীয়ত অনুযায়ী সংকল্প সম্পাদন করতে থাকে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

আনুযায়িক ভাটকা বিষয়

হাদীসে বর্ণিত শানে-মুসল থেকে সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য।
 وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ
 সত্যকে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ স্ফীরা শুধা লোক দেখানো মনোভূতি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুত্তাদরূকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আলাহ্‌র পক্ষে জিহাদ করতে এবং মনে মনে কামনা করতে যে, জনসমায়ে পৌরষবীর প্রচলিত হোক। তাঁরই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি

অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে, জিহাদে এরা প. নিয়ত করলে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।)

‘ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদুনিয়া’ ‘কিতাবুল ইখলাসে’ তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জৈনক সাহাবী রসূলুজাহ্ (সা)-র কাছে বললেন : আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্যে, কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে আগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রসূলুজাহ্ (সা) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আবু নঈম ‘তারীখে আসাকির’ গ্রন্থে হযরত ইবনে আক্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন : জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করত দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। একই পরিস্থিতিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে সিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রতাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং কৃতিকর হয়ে পড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : একবার তিনি রসূলুজাহ্‌র কাছে আরম্ভ করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার মনের ভিতরে আত্মনামায়ে (নামাযরত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি সিয়ান হবে? রসূলুজাহ্ (সা) বললেন : আবু হুরায়রা, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা সিয়ান নয়)।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবুযর গিফারী (রা) রসূলুজাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সৎ কর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুজাহ্ (সা) বললেন : **لَبَّى عَا جِلْ بِهَرِي** **الْمُرْمِن** অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন)।

তফসীরে মাযহাবীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের

সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তক্ষে শরীক করে নেওয়া এমনকি, লোকসুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিয়া ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, লোকসুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি প্রাক্লেপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়্যার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রওয়ায়েতের মধ্যে সমঝবয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়্যার অন্তর্গত গরিপতি এবং তজ্জন্যে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরায নিবেদন করলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন : রিয়্যা। --(আহমদ)

বায়হাকী শোয়াবুল-ইমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বাঙ্গাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়্যাকার লোকদেরকে বলবেন : 'তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।'

হযরত আবু হুরায়রার রওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধে। যে ব্যক্তি কোন সৎ কর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক রওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ; সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল।--(মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎ কর্ম করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্চিত হয়ে যায়।--(আহমদ, বায়হাকী, মায়হারী)

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (র)-কে ইখলাস ও রিয়্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : ইখলাসের দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল : হে আল্লাহ, এটা আপনার অনুগ্রহ ও রূপা, আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিরমিয়া হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : هو ذنبكم أخفى من ذنب

الذمل ! অর্থাৎ সিঁগড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ রিয়্যাহ) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ :
وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

সূরা কাহ্‌ফের কতিপয় ক্বযীলত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আবুদাদারদা বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাঈরাতুল ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।—(মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদাদারদার এই রেওয়ায়েতে একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাঈরাতুল ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ সূরা পাঠ করবে তার জন্য মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর হবে।—(ইবনুস-সুন্নী, আহমদ)

হযরত আবু সারীদেহের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন পূর্ণ সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করে, পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তার জন্য নূর হয়ে যায়।—(হাকিম, মায়হারী)

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল : আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি, কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন : তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতগুলো قُلْ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ رَبِّي ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন আগার উদ্দেশ্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।—(ছা'লবী)

মসনদে-দারেমীতে আছে, যিহ্ন ইবনে হবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাতে, সে যে সময় জাগর নিরত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ বলেন : আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা করে দেখেছি, ঠিক তাই হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : ইবনে আব্বাসী বলেন : আমাদের শায়খ তুরতুসী বলতেন : তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা

ও বহু-বাকিবের মেলামেলার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁর পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।

—(কুরতুবী)

শেষ নিবেদন

আজ ১৬৯০ হিজরী সনের ফিলকদ মাসের ৮ তারিখ রোজ রুহ্পতিবার দুপুর বেলা সূরা কাহ্‌ফের এই তফসীর সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ কৃপণ ও রহম্যে, এমন এক সমর-সজ্জিকপে কোরআন করীমের প্রথমার্ধের কিছু বেশী অংশের তরজমা সম্পূর্ণ হল, যখন আমার বয়সসীমা ৭৬তম বর্ষপরিক্রমায় যাত্রা শুরু করেছে। যে সময়ে আমি শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে দীর্ঘ দু'বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের রোগেও আক্রান্ত এবং মানসিক চিন্তার ভীড়ও অপরিসীম। এতদসত্ত্বেও আমি হতাশ নই, বরং অত্যন্ত আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার কৃপণ ও কৃপার কোরআনে করীমের অবশিষ্ট তফসীরও সম্পূর্ণ করার তوفীক দান করবেন।

সূরা মারহূম

سُورَةُ مَرْيَمَ

मूरा मारइयाम

मकाय अवतीर्ण, १८ आयत, ७ श्लोक

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيْعَصَ ① ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيَّا ② إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً
 خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
 بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي
 عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤ يَرْتَفِئُ وَيَرْتُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ⑥ وَاجْعَلْهُ
 رَبِّ رَضِيًّا ⑦ يُذَكِّرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ
 سَمِيًّا ⑧ قَالَ رَبِّ لِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ
 مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ⑨ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ
 مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ⑩ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ إِلَّا
 تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑪ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى
 إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑫ يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ⑬ وَاتَّبِعْهُ
 الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑭ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ⑮ وَكَانَ تَقِيًّا ⑯ وَبَرًّا
 بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ⑰ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ
 يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ⑱

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ায় প্রতি। (৩) যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্বাক্যে মন্তক সুত্ত্ব হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল-মনোরথ হইনি। (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার জী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সম্ভাষণ। (৭) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহুইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার জী যে বন্ধ্যা, আর আমি যে বার্বাক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন : এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন : এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন : তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল : (১২) হে ইয়াহুইয়া, দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহিযগার, (১৪) পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাকরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শান্তি—যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ--(এর মর্ম আল্লাহ তা'আলাই জানেন) এটা (অর্থাৎ বর্ণিত কাহিনী) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বৃত্তান্ত তাঁর (প্রিয়) বান্দা (হযরত) যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি, যখন সে তার পালনকর্তাকে নিভৃতে আহ্বান করেছিল। (তাতে) সে বলল : হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার অস্থি (বার্বাক্যজনিত কারণে) দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথার চুলের ওজ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেছে)। এই অবস্থার দাবি এই যে, আমি সন্তান লাভের অনুরোধ না করি; কিন্তু আপনার কুদরত ও রহমত অসীম) এবং (আমি এই কুদরত ও রহমত লাভে সদাসর্বদাই অভ্যস্ত। সেমতে ইতিপূর্বে কখনও) আপনার কাছে (কোন বস্তু) চাওয়ার ব্যাপারে হে আমার পালনকর্তা বিফল মনোরথ হইনি। (এ কারণে দুফর থেকেও দুফর উদ্দিষ্ট চাওয়ার ব্যাপারেও

কোন দোষ নেই। এই চাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ এই দেখা দিয়েছে যে,) আমি আমার (মৃত্যুর পর) স্বজনদের (পক্ষ থেকে) ভয় করি (যে, তারা আমার ইচ্ছামত শরীয়ত ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করবে না। সন্তান চাওয়ার পক্ষে এটাই বিশেষ একটা কারণ। এতে করে সন্তান ও এমন ধরনের প্রার্থনা করা হলো, যার মাঝে দীনের খিদমত সম্পন্ন করার মত গুণাবলীও থাকে।) এবং (যেহেতু আমার বার্বকোর সাথে সাথে) আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা ; (যার দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও কখনও সন্তান হয়নি, তাই সন্তান হওয়ার প্রাকৃতিক কারণসমূহও অনুপস্থিত।) অতএব (এমতাবস্থায়) আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণাদির মাধ্যম ব্যতিরেকেই) এমন একজন উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ পুত্র) দান করুন, যে (আমার বিশেষ জ্ঞানেগুণে) আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং (আমার পিতামহ) ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের (ঐতিহ্যে তাদের) স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (অর্থাৎ সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানের অধিকারী হবে) এবং (আমলকারী হওয়ার কারণে) তাকে নিজের সন্তোষভাজন (ও প্রিয়) করুন। হে আমার পালনকর্তা (অর্থাৎ সে আলিমও হবে এবং আমেলও হবে। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় বললেন) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহুইয়া। ইতিপূর্বে (বিশেষ গুণাবলীতে) আমি কাউকে তার সমগুণসম্পন্ন করিনি(অর্থাৎ তুমি যে ইলম ও আমলের দোয়া করছ, তা তো এ পুত্রকে অবশ্যই দেব ; তদুপরি বিশেষ গুণও তাকে দান করব। উদাহরণত আল্লাহর ভয়ে বিশেষ পর্যায়ের হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি। এই দোয়া কবুলের মধ্যে সন্তান লাভের বিশেষ কোন অবস্থা হয়নি; তাই তা জানার জন্যে যাকারিয়া (আ) নিবেদন করলেন : হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং (এদিকে) আমি নিজে তো বার্বকোর শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি? (অতএব জানি না আমরা যৌবন লাভ করব, না আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে, না বর্তমান অবস্থাতেই পুত্র হবে।) ইরশাদ হলো (বর্তমান) অবস্থা এমনিই থাকবে, (এরই মধ্যে সন্তান হবে। হে যাকারিয়া,) তোমার পালনকর্তা বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ (ওধু এটি কেন, আমি তো আরও বড় কাজ করেছি। উদাহরণত) আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ (সৃষ্টির পূর্বে) তুমি কিছুই ছিলে না। (এমনিভাবে প্রাকৃতিক কারণাদিও কিছুই ছিল না। যখন অনন্তিত্বকে অস্তিত্বে আনা আমার জন্যে সহজ; তখন এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্ব আনয়ন করা কঠিন হবে কেন? আল্লাহর এসব উক্তির উদ্দেশ্য ছিল হযরত যাকারিয়ার আশাকে জোরদার করা ; সন্দেহ নিরসনের জন্যে নয়। কেননা, যাকারিয়ার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যখন) যাকারিয়া [(আ)-এর আশা জোরদার হয়ে গেল, তখন তিনি] নিবেদন করলেন : হে আমার পালনকর্তা, (আপনার ওয়াদায় আমি পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলাম। এখন এই ওয়াদার বাস্তবায়ন নিকটবর্তী হওয়ার অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারেরও) আমাকে একটি নিদর্শন দিন (যাতে আরও অধিক শোকর করি। স্বয়ং বাস্তবায়ন তো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই)। ইরশাদ হলো : তোমার (সে) নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন রাত (ও তিন দিন) কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না; অথচ তুমি সুস্থ অবস্থায় থাকবে (কোন অসুখ বিসুখ হবে না। এ কারণেই আল্লাহর যিকিরে মুখ খুলতে সক্ষম হবে। সন্মতে আল্লাহর নির্দেশে

যাকারিয়া'র মুখ বন্ধ হয়ে গেল।) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইস্তিতে তাদেরকে বলল : (কারণ সে মুখে কথা বলতে সমর্থ ছিল না) তোমরা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ'র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণা ও পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ হয় নিয়মানুযায়ী ছিল, সর্বদাই তার নবুয়তের কর্তব্য পালনকালে মুখে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলতেন ; কিন্তু আজ ইস্তিতে বলছেন, না হয় নতুন নিয়ামত প্রাপ্তির শোকরানায় নিজেও অধিক পরিমাণে তসবীহ আদায় করেছেন এবং অন্যদেরকেও তদ্রূপ তসবীহ আদায় করতে বলেছেন। মোটকথা, অতঃপর ইয়াহুইয়া (আ) জন্মগ্রহণ করলেন এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলেন। তখন তাকে আদেশ করা হলো হে ইয়াহুইয়া, এ কিতাবকে (অর্থাৎ তওরাতকে, কারণ তখন তওরাতই ছিল শরীয়াত। ইনজীল পরে অবতীর্ণ হয়েছে।) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর (অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা সহকারে আমল কর)। আমি তাঁকে শৈশবেই (ধর্মের) জ্ঞানবুদ্ধির এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা (শুণ) এবং (চারিত্রিক) পবিত্রতা দান করেছিলাম। (وَحَنَانٌ وَحَكْمٌ) বলায় চরিত্রের প্রতি ইস্তিত হয়ে গেছে।) এবং (অতঃপর বাহ্যিক আমলের প্রতি ইস্তিত করা হয়েছে যে,) সে বড়ই পরহিযগার এবং পিতামাতার অনুগত ছিল। (এতে আল্লাহ'র হুক এবং বান্দার হুক উভয়ের প্রতি ইস্তিত হয়েছে সে (মানুষের প্রতি) উদ্ধত (অথবা আল্লাহ তা'আলার) নাফরমান ছিল না। (সে আল্লাহ'র কাছে এমন গৌরবান্বিত ও সম্মানিত ছিল যে, তার পক্ষে আল্লাহ'র তরফ থেকে বলা হচ্ছে : তার প্রতি (আল্লাহ তা'আলার) শাস্তি (বর্ষিত) হোক যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে (কিয়ামতে) পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা কাহুফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাকর্ষ একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহুফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে। —(রহুল মা'আনী)

كَهَيَمِصٍ এগুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও সম্বীচীন নয়।

إِنْ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفَى এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চরিত ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفَى অর্থাৎ অনুচ্চ যিকিরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকিরই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয় না এবং কমও হয় না)। —(কুরতুবী)

إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعْمَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের ঝুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اِسْتَعْمَلَ-এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবশ্রুততা প্রকাশ করা যুক্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ তা-ই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তার তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবশ্রুততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলিমগণ বলেন : দোয়ার পূর্বে আত্মাহু তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবশ্রুততা বর্ণনা করা উচিত।

مَوَالِي এটা مَوَالِي-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই।

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না : يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ অধিক সংখ্যক আলিমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমত হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবাস্তব। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা একমত্য সম্বলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে :

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافز -

নিশ্চিতই আলিমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। “পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।” —(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

এ হাদীসটি কাকী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : صدقة لانورث ما تركناه আমাদের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে يَرِثُنِي-এর পর وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাতে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مَوَالِي তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহুইয়া (আ) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার-আইনের পরিপন্থী।

রহম মী'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে :

روى الكيفى عن ابى البخزى عن ابى عبد الله قال ان
سليمان ورث راؤد وان محمداً ﷺ ورث سليمان -

সোলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হন এবং মুহাম্মদ (সা) সোলায়মান (আ)-এর ওয়ারিস হন।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সা) যে হযরত সোলায়মান (আ)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোন সম্ভবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا سَمِي শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে 'ইয়াহইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহু ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণত, চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া (আ) পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও মুসা কলীমুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত। —(মাযহারী)

عَنْ শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির গুণতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আ)-এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলায় এ অবস্থাটি কোন রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আয়্যাহুর মিকর ও ইবাদতে তার জিহবা তিনদিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল। বরং এ অবস্থা মুজিয়া ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। حَنَانًا-এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়াদ্রুতা। এটা হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল।

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيفًا ۖ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۙ
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۙ
رَبِّكَ ۖ لِيَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۙ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ
يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۙ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى

هَيِّنْ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۱۹

(১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তাঁর পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহকে প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল : আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ-ভীরু হও। (১৯) সে বলল : আমি তো ওধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাই। (২০) মারইয়াম বলল : কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল : এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনের এই বিশেষ অংশে অর্থাৎ সূরায় হযরত) মারইয়াম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করুন, [কারণ, এটা যাকারিয়া (আ)-এর উল্লিখিত কাহিনীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এটা তখন ঘটে,] যখন সে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের একস্থানে (গোসলের জন্য) গেল। অতঃপর তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি (মধ্যস্থলে) পর্দা করে নিলেন, যাতে এর আড়ালে গোসল করতে পারেন।) অতঃপর (এমতাবস্থায়) আমি আমার ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে প্রেরণ করলাম, তিনি তাঁর সামনে (হাত, পা-সহ আকার-আকৃতিতে একজন পূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। (হযরত মারইয়াম তাঁকে মানব মনে করলেন, তাই অস্থির হয়ে) বললেন : আমি তোমা থেকে আমার আল্লাহর আশ্রয় চাই, যদি তুমি (এতটুকুও) আল্লাহভীরু হও (তবে এখান থেকে সরে যাবে)। ফেরেশতা বললেন : আমি মানব নই যে, (তুমি আমাকে ভয় করবে) আমি তো তোমার পালনকর্তা প্রেরিত (ফেরেশতা। আমার আগমনের উদ্দেশ্য—) যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করি। (অর্থাৎ তোমার মুখে অথবা বুকের উন্মুক্ত অংশে ফুঁ মারি, যার প্রভাবে আল্লাহর হুকুমে গর্ভ সঞ্চারণ হয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।) তিনি (বিশ্বয়ভরে) বললেন : (অবীকারের ভঙ্গিতে নয়) আমার পুত্র কিরূপে হবে, অথচ (এর অপরিহার্য শর্তাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষের সাথে সহবাস। এটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কেননা) কোন মানব আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি (অর্থাৎ আমার বিয়ে হয়নি) এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতা বললেন : (ব্যস, কোন মানবের স্পর্শ ব্যতীত) এমনিতেই (পুত্র) হয়ে যাবে। (আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না ; বরং) তোমার পালনকর্তা বলেছেন : এটা (অর্থাৎ অভ্যন্তর কারণাদি ছাড়াই পুত্র সৃষ্টি করা) আমার পক্ষে সহজ এবং (আরও বলেছেন যে, আমি অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়া) বিশেষভাবে এজন্য সৃষ্টি করব, যাতে আমি এই পুত্রকে মানুষের জন্য (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও (এর মাধ্যমে মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৩

মানুষের হিদায়েত পাওয়ার জন্য) তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের উপকরণ করে দেই। এটা নিভাবিহীন (এই পুত্রের জন্যলাভ) একটি স্থিরীকৃত ব্যাপার (যা অবশ্যই ঘটবে)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

التَّيَّابُ শব্দটি تَبَّ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। এর অর্থ হলো জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। مَكَّنَّا شَرْقِيًّا অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সন্ধাননা ও উক্তি বিভিন্নরূপে বর্ণিত আছে। কেউ বলেন : গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন : অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে পমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সন্ধাননাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রিস্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে রুহ বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : স্বয়ং ইসা (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিষ্ঠা তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

فَنَمَّ لَهَا بِشَرِّ سَوِيًّا ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্য সহজ নয়—ভয়-ভীতি প্রবল হয়ে যায় ; যেমন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) হেরা গিরিগুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতরে আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসং বলে আশংকা করলেন। তাই বললেন :

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ আমি তোমা থেকে আল্লাহ রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল একথা শুনে (আল্লাহর কথা শুনে) আল্লাহর নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন জালিমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে : যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহকে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহভীরুও হও, তবুও আমি তোমা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। —(মায়হারী)

لَا مَبْدَأَ এখানে পুত্র সন্তান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে ব্যক্ত করেছেন। কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারার জন্য

প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেয়া পুত্র সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে যাবে-যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ তা'আলারই কাজ।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ (২২) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى
جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۝ (২৩)
فَنَادَىٰ بِهَا مِنْ تَحْتِهَا ۖ أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ
سَرِيًّا ۝ (২৪) وَهَزَمْنِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا
جَنِيًّا ۝ (২৫) فَكَلِمَاتٍ وَأُشْرَبِي وَفَرِّجِي عَيْنَا ۖ فَمَا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝ (২৬)

(২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন : হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর জারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (২৬) এখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (এই কথাবার্তার পর জিবরাঈল তাঁর বৃকের উনুজ স্থানে ফুঁ মারলেন যদ্বকুন) তিনি গর্ভে পুত্র ধারণ করলেন। অতঃপর (যথাসময়ে মারইয়াম যখন গর্ভ ধারণের লক্ষণাদি অনুভব করলেন তখন) তৎসহ (নিজ গৃহ থেকে) কোন দূরবর্তী স্থানে (বন পাহাড়ে) একান্তে চলে গেলেন। এরপর (যখন প্রসব বেদনা শুরু হলো তখন) প্রসব বেদনার কারণে খেজুর গাছের দিকে আশ্রয় নিলেন (যাতে তার উপর ভর দিয়ে ওঠা-বসা করতে পারেন। এ সময় তার কোন সঙ্গী-সহচর ছিল না। তিনি ছিলেন ব্যথায় অস্থির। এমতাবস্থায় আরাম ও প্রয়োজনের যেসব উপকরণাদি থাকা উচিত ছিল, তাও অনুপস্থিত। তদুপরি সন্তান প্রসবের পর দুর্নীমের আশংকা। অবশেষে দিশেহারা হয়ে) বলতে লাগলেনঃ

হায় ! আমি যদি এ অবস্থার পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। অতঃপর সে সময়েই আল্লাহর নির্দেশে (হযরত) জিবরাঈল (পৌছে গেলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সম্মুখে উপস্থিত হলেন না; বরং যে জায়গায়-মারইয়াম ছিলেন, সেখান থেকে নিম্ন ভূমিতে আড়ালে অবস্থান করলেন এবং তিনি) তাকে নিম্নস্থান থেকে আওয়ায দিলেন (মারইয়াম তাকে চিনলেন যে, তিনি ফেরেশতা, যিনি ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন) যে, তুমি উপকরণাদি না থাকার কারণে অথবা (দুর্নামের ডয়ে) দুঃখ করো না, (কেননা উপকরণাদির ব্যবস্থা এক্রপ হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন (যা দেখলে এবং তার পানি পান করলে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা অর্জিত হবে। রুহুল মা'আনীর রেওয়াজেত অনুযায়ী মারইয়াম তখন পিপাসার্তও ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রসবের পূর্বে বা পরে গরম বস্তুর ব্যবহার প্রসব যন্ত্রণা নিরাময় করে, দূষিত রক্ত দূর করে এবং মনকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখে। পানিতে যদি উত্তাপও থাকে—যেমন কোন কোন নহরের পানি এক্রপ হয়ে থাকে, তবে তা মেযাজের আরও অনুকূল হবে। এ ছাড়া খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) থাকে। খেজুর রক্ত উৎপাদন করে দেহে চর্বি সৃষ্টি করে এবং কোমর ও অস্থির জোড়কে শক্তিশালী করে দেয়। এ কারণে এটা প্রসূতির জন্য সব ঔষধ ও খাদ্য থেকেই উত্তম। গরম হওয়ার কারণে কিছুটা ক্ষতির আশংকা থাকলেও পাকা খেজুরে উত্তাপ কম। যেটুকু থাকে, পানি দ্বারা তা সংশোধিত হয়ে যায়। এ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হলেই অনিষ্টকারিতা দেখা দিতে পারে। নতুবা কোন বস্তুই অল্প বিস্তর অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত নয়। এছাড়া অভ্যাসবিরুদ্ধ কারামতের আত্মপ্রকাশ যেহেতু আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত, তাই তা আত্মিক প্রফুল্লতার কারণও বটে। তুমি এই খেজুর গাছের কাণ্ডকে (ধরে) নিজের দিকে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক খেজুর ঝরে পড়বে (এ ফল খাওয়ার মধ্যে আহ্বারের স্বাদ এবং কারামত হিসেবে ফলন্ত হওয়ার কারণে আত্মিক স্বাদ উভয়ই একত্রিত আছে)। এখন (এ ফল) আহ্বার কর, (নহরের পানি) পান কর এবং চক্ষু শীতল কর (অর্থাৎ পুত্রকে দেখার কারণে, পানাহারের কারণে এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আনন্দিত থাক)। এরপর (যখন দুর্নামের আশংকার সময় আসে অর্থাৎ কোন মানুষ যদি এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন এর ব্যবস্থাও এক্রপ হয়েছে যে) যদি কোন মানুষকে (আসতে এবং আপত্তি করতে) দেখ তবে (তুমি নিজে কিছু বলবে না ; বরং ইঙ্গিতে তাকে) বলে দেবে : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে (এমন রোযার মানত করেছি যাতে কথা বলা নিষিদ্ধ। সুতরাং এ কারণে) আজ আমি (সারাদিন) কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (তবে আল্লাহর যিকর ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা। ব্যস তুমি এতটুকু জওয়াব দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই এই সদ্যজাত শিশুকে স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী পন্থায় কথা বলতে সক্ষম করে দেবেন। ফলে পবিত্রতা ও সত্যিভের অলৌকিক প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করবে। মোটকথা সর্বপ্রকার দুঃখের প্রতিকার হয়ে যাবে।)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু-কামনার বিধান : মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওয়র বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বভোভাবে আত্মাহুঁর আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন ; অর্থাৎ মানুষ দুর্নীম রটাবে এবং সম্ভবত এর মুকাবিলায় আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গুনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে : তুমি বলো-দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেন নি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে : ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোযাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালি-গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবু দাউদের রেওয়াজেতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : لا يتم بعدا حثام ولا صمات يوم الى الليل অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতিম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। وَاللَّهُ اعْلَمُ

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয় : পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিয়া। মু'জিয়ার যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই। বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্ষে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আত্মাহুঁ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আত্মাহুঁর কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।—(রুহুল-মা'আনী)

سَرِيٍّ-এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর এ ক্ষেত্রে আত্মাহুঁ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন অথবা জিবরাইলের মাধ্যমে জারি করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়াজেতেই বর্তমান আছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সন্তানের উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও

পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। كَلِمَاتٍ رَبِّیْ কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে ; বিশেষতঃ ঐ খাদ্যের বেলায়, যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।—(রুহুল-মা'আনী)

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا أَيْرِيمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ۝۲۹ يَأْخُذُ
هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۝۳۰ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ
قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝۳۱ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قُتِلْتُ اثْنِي
الْكَتَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝۳۲ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ۝۳۳ وَأَوْصَانِي
بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝۳۴ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي نَزَّلْتُ لَكُمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا
شَقِيًّا ۝۳۵ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝۳۶

(২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল : হে মারইয়াম, তুমি একটি অশ্রুত ঘটনায় বসেছ। (২৮) হে হারুন-ভগিনী, তোমার পিতা অসং ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল : যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব ? (৩০) সন্তান বলল : আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উদ্ভিত হব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মোট কথা, এ কথায় মারইয়াম সাল্বনা লাভ করলেন এবং ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন।] অতঃপর তিনি তাকে কোলে নিয়ে (সেখান থেকে লোকালয়ের দিকে তিনি চললেন এবং) তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা (যখন দেখল যে, অবিবাহিতা মারইয়ামের কোলে সদ্যজাত শিশু, তখন কুখারণা করে) বলল : হে মারইয়াম, তুমি বড় সর্বনাশা কাজ করেছ। (অর্থাৎ নাউযুবিলাহ, অপকর্ম করেছ। এমনিতেও অপকর্ম যে কেউ

করে, তা মন্দ ; কিন্তু তোমার দ্বারা এরূপ হওয়া সর্বনাশের উপর সর্বনাশ। কেননা) হে হারুন-ভগিনী, (তোমার পরিবারে কেউ কোনদিন এরূপ অপকর্ম করেনি। সেমতে) তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না (যে, তার প্রভাবে তুমি এরূপ করবে) এবং তোমার জননী ব্যভিচারিণী ছিল না (যে, তার কারণে তুমি এ কাজে লিপ্ত হবে। এরপর হারুন তোমার জ্ঞাতি ভাই। তার নাম হারুন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছে। সে কত ভাল লোক! মোটকথা, যার গোটা পরিবারই শুদ্ধ-পবিত্র, তার দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাশের কথা!) অতঃপর মারইয়াম (এসব কথাবার্তা শুনে কোন উত্তর দিলেন না। বরং) শিশুর দিকে ইশারা করে দিলেন (যে, যা কিছু বলবার, তাকেই বল। সে উত্তর দেবে।) তারা (মনে করল যে, মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে ; তাই) বলল : সে মাত্র কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কিরূপে কথা বলব? (কেননা, যে ব্যক্তি নিজে কথাবার্তা বলে, তার সাথেই কথা বলা যায়। সে যখন শিশু, তখন তো সে কথাবার্তাই বলতে সক্ষম নয়। তার সাথে কিরূপে কথা বলব? ইতোমধ্যে) সন্তান (নিজেই বলে উঠল : আমি আল্লাহর (বিশেষ) দাস (আল্লাহ নই ; যেমন মূর্খ খ্রিস্টানরা মনে করবে এবং আল্লাহর অগ্রিয় নই ; যেমন ইহুদীরা মনে করবে। দাস হওয়ার এবং বিশেষ দাস হওয়ার লক্ষণ এই যে) তিনি আমাকে কিতাব (অর্থাৎ ইঞ্জিল) দিয়েছেন (যদিও ভবিষ্যতে দেবেন ; কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন দিয়ে ফেলেছেন।) এবং তিনি আমাকে নবী করেছেন (অর্থাৎ করবেন) এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (অর্থাৎ মানবজাতি আমা দ্বারা উপকৃত হবে) আমি যেখানেই থাকি না কেন (আমার বরকত পৌছতে থাকবে। এ উপকার হচ্ছে ধর্ম প্রচার। কেউ কবুল করুক বা না করুক তিনি উপকার পৌছিয়ে দিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি (দুনিয়াতে) জীবিত থাকি। (বলা বাহুল্য, আকাশে যাওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে আদিষ্ট নন। এটা দাস হওয়ার প্রমাণ ; যেমন বিশেষত্বের আরও প্রমাণাদি আছে) এবং আমাকে আমার জননীর অনুগত করেছেন (পিতা ছাড়া জনগ্রহণের কারণে বিশেষ করে জননীর কথা বলেছেন) তিনি আমাকে উদ্ধৃত হতভাগ্য করেন নি (যে, মানুষের হক ও জননীর হক আদায় করতে অবাধ্য হব কিংবা হক ও আমল বর্জন করে দুর্ভাগ্য ক্রয় করব) এবং আমার প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সালাম যে দিন জনগ্রহণ করেছি, যে দিন মৃত্যুবরণ করব (এ সময়টি কিয়ামতের নিকটবর্তী আসমান থেকে অবতরণের পর হবে। এবং যেদিন আমি (কিয়ামতে জীবিত হয়ে উথিত হব। (আল্লাহর সালাম বিশেষ বান্দা হওয়ার প্রমাণ।)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَإِنَّهَا نَفْسٌ مِّنْهُنَّ نَفْسٌ—এ বাক্য থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাসের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আক্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চত্বিশ দিন পর নিকাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন।—(রুহুল মা'আনী)

ثِيَابًا ʔারবী ভাষায় ʔরী শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে ʔরী বলা হয়। আবু হাইয়ান বলেন : প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে ʔরী বলা হয়-ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

أَخْتًا ʔরী হযরত মুসা (আ)-এর ভাই ও সহচর হযরত হারুন (আ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নি বলা হয়েছে। অথচ হারুন (আ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : তুমি বলে দিলেনা কেন যে, বরকতের জন্য পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। এক, হযরত মারইয়াম হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্মান করা হয়েছে--যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে ; যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামিম গোত্রের ব্যক্তিকে اخاتيم এবং আরবের লোককে اخا عرب বলে অভিহিত করে। দুই, এখানে হারুন বলে মুসা (আ)-এর সহচর হারুন নবীকে বোঝানো হয়নি ; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নাম ছিল হারুন এবং এ নাম হারুন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নি বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا ʔরী কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ ও সং কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সম্মান-সম্মতি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের ভুলনায় বেশি গুনাহ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুয়ুগদের সম্মানদের উচিত, সং কাজ ও আল্লাহ্‌ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

أَنَا عَبْدُ اللَّهِ এক রেওয়াজেতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভৎসনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি তাদের ভৎসনা শোনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে এ-কথা বলেন : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহর দাস। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি ; কিন্তু আমি আল্লাহ নই—আল্লাহর দাস। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

أَنَا الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ) তাঁর দুহু পানের যমানার আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর

চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিফায লাভ করেন নি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যখনসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিফায দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী (সা) বলেছেন : আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আ)-এর জন্যই হয়নি—তার খামীর তৈরি হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সা)-এর জন্য অকাটা ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্যে কোন গুনাহের দখল থাকতে পারে না।

أَوْ مَنَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ তা'কীদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেওয়া হলে তাকে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ইসা (আ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসীয়াত করেছেন। তাই এর অর্থ যে, খুব তা'কীদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোযা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসুলের শরীয়তে ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিমাটি বিষয়াদি বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ইসা (আ)-এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসা (আ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ

করেননি এবং অর্থকড়িও সংগ্রহ করেননি। এমনভাবেই তাকে যাকাতের আদেশ দেওয়ার কি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত ফরয—এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ইসা (আ)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাবপরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাঁকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়—(ক্লঙ্ঘল মা'আনী)

مَا تَنْتَظِرُ অর্থাৎ নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন—যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যম্যনা।

بِرَأْيِ الْوَالِدَيْنِ এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٥٥﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

فَيَكُونُ ③٥ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ③٦
 فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ③٧ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۖ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ
 الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ③٨ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
 وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ③٩ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ
 عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ④٠

(৩৪) এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র। সত্যকথা, সে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে।
 (৩৫) আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি
 যখন কোন কাজ করা স্থির করেন, তখন একথাই বলেন : 'হও' এবং তা হয়ে যায়।
 (৩৬) তিনি আরও বললেন : নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা।
 অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে
 দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাকিরদের
 জন্য ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শব্দে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার
 কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ যালিমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৯) আপনি
 তাদেরকে পরিত্রাণের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের সীমাংসা
 হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০)
 আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং
 আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র (যার উক্তি ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়
 যে, সে আল্লাহর দাস ছিল। খ্রিষ্টানরা যে তাকে দাসদের তালিকা থেকে বের করে
 আল্লাহর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, তা সত্য নয়। এমনভাবে ইহুদীরা যে তাঁকে আল্লাহর
 প্রিয় বলে স্বীকার করে না এবং নানাবিধ অপবাদ-আরোপ করে, তাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমি
 (সম্পূর্ণ) সত্যকথা বলছি, সে সম্পর্কে (বাহ্য ও স্বল্পতার আশ্রয় গ্রহণকারী) লোকেরা
 বিতর্ক করছে। সেমতে খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের উক্তি এইমাত্র জানা গেল। (যেহেতু ইহুদীদের
 উক্তি বাহ্যত ও পয়গম্বরের মর্যাদা হানিকর হওয়ার কারণে স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল, তাই
 তা খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। এর বিপরীতে খ্রিষ্টানদের উক্তি বাহ্যত পয়গম্বরের

অতিরিক্ত গুণ প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা নবীভূতের সাথে সাথে আল্লাহর পুত্রত্ব দাবি করে। তাই পরবর্তী আয়াতে তা খণ্ডন করা হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, এ উক্তির কারণে আল্লাহ তা'আলার তওহীদের অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে তা স্বয়ং আল্লাহর মর্যাদা হানি করে। অথচ) আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি (কাউকে) পুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। তিনি (সম্পূর্ণ) পবিত্র। (কারণ) তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তাকে এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা', অমনি তা হয়ে যায়। (এমন পরা কাষ্ঠাশালীর সম্ভান হওয়া যুক্তিগতভাবে ত্রুটি।) এবং (আপনি তওহীদের প্রমাণের জন্য লোকদেরকে বলে দিন, যাতে মুশরিকরাও শুনে নেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব (একমাত্র) তাঁরই ইবাদত কর। এটা (অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহর ইবাদত তথা তওহীদ অবলম্বন করা) সরল পথ। অতঃপর (তওহীদের এসব যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) পরস্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ অস্বীকার করে নানা রকম ধর্ম আবিষ্কার করেছে।) সুতরাং কাকিরদের জন্য মহাদিবসের আগমনকালে খুবই দুর্ভোগ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস। এই দিবস এক হাজার বছর দীর্ঘ ও ভয়াবহ হওয়ার কারণে মহাদিবস হবে।) তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা (হিসাব ও প্রতিদানের জন্য) আমার কাছে আগমন করবে। (কেননা কিয়ামতে এসব সত্যাসত্য দৃষ্টির সামনে এসে যাবে এবং সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।) কিন্তু যালিমরা আজ (দুনিয়াতে কেমন) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছে। আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন যখন (জান্নাত ও দোযখের) চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হবে। [হাদীসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে জান্নাত ও দোযখবাসীদের দেখিয়ে জবাই করে দেওয়া হবে এবং উভয় প্রকার লোকদেরকে অনন্তকাল তদবস্থায় জীবিত থাকার নির্দেশ শুনিতে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) তখন যে অপরিসীম পরিতাপ হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।] তারা (আজ দুনিয়াতে) অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না (কিন্তু অবশেষে একদিন মরবে)। পৃথিবী ও তার উপরে যারা রয়েছে, তাদের ওয়ারিস (অর্থাৎ সর্বশেষ মালিক) আমিই থেকে যাব এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে (এরপর তাদের কুফর ও শিরকের সাজা ভোগ করবে)।

আনুযমিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذَٰلِكَ عَنِّي بَيْنَ مَرِّمٍ —হযরত ইসা (আ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রিষ্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ঝুঁততা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিন্জীর জারজ সম্ভানরূপে আখ্যায়িত করে। (নাউয়বিয়াহ) আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।—(কুরতুবী)

أَقُولُ قَوْلَ الْحَقِّ — নামের ব্যবহারযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপ হলো একরূপ أَقُولُ قَوْلَ الْحَقِّ কোন কোন ক্রিয়াআতে নামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, ইসা (আ) স্বয়ং قَوْلَ الْحَقِّ (সত্য উক্তি) যেমন তাকে اللَّهُ عَلَّمَ (আল্লাহর উক্তি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহর উক্তির মাধ্যমে হয়েছে।—(কুরতুবী)

يَوْمَ الْحَسْرَةِ কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত ; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মুআযের রেওয়ায়েতে তাবারানী ও আবু ইয়াল্লা বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেন : যেসব মুহূর্তে আল্লাহর যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বগতী বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে, সাহাবায়ে কিরাম গ্রন্থ করলেন : এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন : সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরও বেশি সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হতো। পক্ষান্তরে কুর্মাঁরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুর্মা থেকে কেন বিরত হলো না।

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ⑧
قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ⑨
يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ⑩
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَكَّ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ⑪
قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ هِيَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ لَاحِظٌ وَلَا رَجْعٌ وَهُجْرَتِي مِلَّةَ
قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ⑫ وَأَعْتَرَىكُمْ
وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَشْيَ ⑬ أَلَا أَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي

شَقِيًّا ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا اعْتَرَاهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَهَبْنَا لَهُ
 اسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٥٨﴾ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٩﴾

(৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় সে ছিল সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে ; বা তোমার কাছে আসেনি, সূতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শরতানের ইবাদত করো না। নিশ্চয় শরতান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শরতানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (৪৬) পিতা বলল : হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ কিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রতরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন : তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য কমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত বাদের ইবাদত কর, তাদেরকে ; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব ; আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বক্ষিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত বাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমৃদ্ধ সুখ্যাতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ) আপনি এই কিতাবে (কোরআনে) ইবরাহীম (আ)-এর কথা বর্ণনা করুন (যাতে তাদের কাছে তওহীদ ও রিসালতের ব্যাপারটি আরও ফুটে ওঠে।) সে (প্রত্যেক কথায় ও কাজে) খুবই সত্যবাদী (ছিল ও) নবী ছিল। (এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা তখন হয়েছিল) যখন তিনি তাঁর (মুশরিক) পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, তুমি এমন বস্তুর ইবাদত কর কেন, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ প্রতিমা ; অথচ কোন বস্তু দর্শক, শ্রোতা ও উপকারী হওয়ার পরও যদি 'সদাসর্বদা আছে এবং সদাসর্বদা থাকবে' এরূপ না হয়, তবুও সে ইবাদতের যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় যার মধ্যে এসব গুণও নেই, সে উত্তমরূপে ইবাদতের যোগ্য

হতে পারে না।) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি (অর্থাৎ ওহী ; এতে ব্রাহ্মির আশংকা মোটেই নেই। সুতরাং আমি যা কিছু বলছি, তা নিশ্চিতরূপে সত্য। কাজেই) তুমি আমার কথামত চল, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (তা হচ্ছে ডগহীদ)। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদত করো না (অর্থাৎ শয়তানকে এবং তার ইবাদতকে তো তুমিও খারাপ মনে কর। প্রতিমা পূজায় শয়তান পূজা অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে। কারণ শয়তানই এ-কাজ করায়। আল্লাহর বিপরীতেও কারও শিক্ষাকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করাই ইবাদত। কাজেই প্রতিমা পূজার মধ্যে শয়তান পূজা নিহিত রয়েছে।) নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (অতএব সে আনুগত্যের যোগ্য হবে কিরূপে) ? হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি (এবং এই আশংকা নিশ্চিত) যে, তোমাকে দয়াময়ের কোন আঘাত স্পর্শ করবে (দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে)। অতঃপর তুমি (আঘাতে) শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আনুগত্যে যখন তার সঙ্গী হবে ; তখন সাজায়ও তার সঙ্গী হবে, যদিও দুনিয়াতে শয়তানের কোন আঘাত না হয়। শয়তানের এই সঙ্গ ও শাস্তিতে অংশীদার হওয়াকে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি পছন্দ করবে না)।

ইবরাহীম (আ)-এর এসব উপদেশ শুনে পিতা বলল : তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ হচ্ছ, হে ইবরাহীম? (এবং এজন্য আমাকেও নিষেধ করছ? মনে রেখ) যদি তুমি (দেবদেবীর নিন্দা থেকে এবং আমাকে তাদের ইবাদতে নিষেধ করা থেকে) বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব (কাজেই তুমি এ থেকে বিরত হও) এবং চিরতরে আমা থেকে (অর্থাৎ আমাকে বলা-কওয়া থেকে) দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম (আ) বললেন : (উত্তম) আমার সালাম নাও, (এখন তোমাকে বলা-কওয়া নিরর্থক।) এখন আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে মাগফিরাতের (এভাবে) দরখাস্ত করব (যে, তিনি তোমাকে হিদায়েত করুন, যাদ্বারা মাগফিরাত অর্জিত হয়) নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (কাজেই তাঁর কাছেই আবেদন করব, যার কবুল করা না করা উভয়টি বিভিন্ন দিক দিয়ে রহমত ও মেহেরবানী) এবং (তুমি এবং তোমার সহধর্মীরা যখন আমার সত্য কথাও ম্যানভে'চাও না, তখন তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা অনর্থক। তাই) আমি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে (দৈহিকভাবেও) পৃথক হয়ে যাচ্ছি, (যেমন আন্তরিকভাবে পূর্বেই পৃথক রয়েছি। অর্থাৎ এখানে অবস্থানও করব না) এবং সানন্দে পৃথক হয়ে) আমার পালনকর্তার ইবাদত করব (কেননা, এখানে থাকলে এ কাজেও বাধা সৃষ্টি হবে।) আশা (অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস) করি যে, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না (যেমন মূর্তিপূজারীরা তাদের মিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করে বঞ্চিত হয়। মোটকথা, এই কথাবার্তার পর ইবরাহীম তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে গেলেন)। অতঃপর সে যখন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক (পুত্র) ও ইয়াকুব (পৌত্র) দান করলাম (তারা তাঁর সন্তানদের কল্যাণে মূর্তিপূজারী সমাজের চাইতে বহুগুণে উত্তম ছিল।) এবং আমি (উভয়ের মধ্যে) প্রত্যেককে নবী করেছি এবং তাদের সবাইকে আমি (নানা গুণে গুণাবিত করে) আমার অনুগ্রহের অংশ

দিয়েছি এবং (ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে) তাদের সুখ্যাতি আরও সমৃদ্ধ করেছি। (ফলে সবাই সম্মান ও প্রশংসা সহকারে তাদের নাম উচ্চারণ করে। ইসহাকের পূর্বে ইসমাইল এমনি সব গুণসমূহ প্রদত্ত হয়েছিল)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

‘সিন্দীক’ কাকে বলে? **سِدِّيقٌ** শব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিন্দীক। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যে রূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও গুণাবলী এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিন্দীক। রূহুল মা‘আনী, মায়হারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছে। সিন্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিন্দীক নবী ও রাসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জন্য সিন্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিন্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রাসূল হওয়া জরুরী নয় ; বরং নবী নয়—এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রাসূলের অনুসরণ করে সিন্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি-ও সিন্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরআন পাক ‘সিন্দীক’ (السِّدِّيقَةُ) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দেরকে সসিহত করার পছন্দ ও আদব : **إِنِّي آتِيكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ** আরবী অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে আল্লাহ তা‘আলা সর্বগুণে গুণাবিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেঘাজের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিগুই নয়—এর উদ্যোক্তারূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্ব ও ভালবাসা। এ দু’টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ (আ) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

إِنِّي آتِيكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে ‘কাফির’ গোমরাহ্ ইত্যাদি বলেন নি: বরং পয়গম্বরসুলভ হিকমতের সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুঁশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ **إِنِّي آتِيكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ** বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় **يَا بُنَيَّ** (হে

বৎস,) শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে **يَا اِيْرَامِيْنِمْ** বলে সম্বোধন করল। অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও শ্রবণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন :

এখানে **سَلَامٌ** শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। এক. বয়কটের সালাম; অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্ভূতনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে :

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا অর্থাৎ মুর্খরা যখন তাদের সাথে মুর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মুকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোন কাফিরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : لا تَبْدُوْا اِلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফির, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহবিদগণ মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়। কুরতুবী আহকামুল কোরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নখরীরা সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোন কাফির ইহুদী ও খ্রিস্টানের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্শ্বিক প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন কাফিরের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রাসূলে করীম (সা) তাঁর চাচা আবু তালিবকে বলেছিলেন : **وَاللّٰهُ لَا يَسْتَغْفِرُ لَكَ مَا لَمْ يَنْعَمْ** অর্থাৎ আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় **لَا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ اِلٰهٌ** অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তিগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) চাচার জন্য ইস্তিগফার পরিত্যাগ করেন।

খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তিগফার করব—এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বকাল ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়।

সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। **الْأَقُولُ إِبْرَاهِيمَ لَبِيبٌ لَا سْتَفْغَرُ لَكَ** সূরা তওবার **وَالَّذِينَ آمَنُوا** আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, **وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ** এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তিগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আল্লাহর শত্রু প্রমাণিত হওয়ার-পূর্বকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তিগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

وَأَعْتَزَلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَنصُوا رَبِّي পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেন নি। বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।

فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসংগতায় আতংক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহর জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সম্ভানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا ۚ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ **وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ**

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۝
 وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
 نَبِيًّا ۝ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
 النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَاهُ إِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ
 خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكَ ۝

(৫১) এই কিতাবে মুসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি
 ছিলেন রাসূল, নবী। (৫২) আমি তাঁকে আহ্বান করলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে
 এবং গুড়তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে
 তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হারুনকে নবীরূপে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাইলের কথা
 বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপ্রিয় এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী।
 (৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর
 পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইসরাইলের কথা আলোচনা
 করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উদ্ধৃত করেছিলাম। (৫৮)
 এরাই তারা-নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন।
 এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম,
 তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাইলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন
 করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর
 আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনে) মুসা (আ)-এর কথাও আলোচনা করুন (অর্থাৎ
 মানুষকে শোনান, নতুবা কিতাবে আলোচনাকারী তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই)।
 নিশ্চয় তিনি আল্লাহর বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও নবী ছিলেন। আমি
 তাঁকে তুর পর্বতের ডানদিক থেকে আহ্বান করলাম এবং আমি তাঁকে গুড়তত্ত্ব বলার জন্য
 নিকটবর্তী করলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে
 (অর্থাৎ তাঁর অনুরোধে তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁকে নবী করলাম এই কিতাবে ইসমাইলের
 কথাও বর্ণনা করুন, নিশ্চয় তিনি ওয়াদা পালনে খুব সাক্ষা ছিলেন এবং তিনি রাসূল ও

নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের (বিশেষভাবে এবং অন্যান্য বিধিবিধানের সাধারণভাবে) নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। এই কিতাবে ইদরীস (আ)-এর কথা আলোচনা করুন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত সততাপরায়ণ নবী ছিলেন। আমি তাঁকে (গুণগরিমায়) উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিলাম। এরা (সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করা হলো—যাকারিয়া থেকে ইদরীস পর্যন্ত) এমন, যাদের প্রতি আল্লাহ (বিশেষ) নিয়ামত নাযিল করেছেন (অর্থাৎ নবুয়ত দান করেছেন। কেননা, নবুয়তের চাইতে বড় নিয়ামত কিছু আর নেই)। এরা সবাই আমাদের বংশধর (ছিলেন) এবং তাদের কেউ কেউ তাদের বংশধর (ছিলেন), যাদেরকে আমি নূহ (আ)-এর সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম (সম্মতে একমাত্র ইদরীস ছিলেন নূহের শিষ্যপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই নূহ ও তাঁর সঙ্গীদের বংশধর) এবং (তাদের কেউ কেউ) ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর (ছিলেন। সম্মতে হযরত যাকারিয়া, ইয়াহুয়া, ইসা ও মুসা (আ) তাদের উভয়ের বংশধর। ইসহাক, ইসমাইল ও ইয়াকুব (আ) ছিলেন শুধু হযরত ইবরাহীমের বংশধর।) তাদের সবাইকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি। (এহেন প্রিয়গাত্র ও বৈশিষ্ট্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে) যখন তাদের সামনে রহমানের আয়্যাতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন (চূড়ান্ত মুখাপেক্ষিতা, নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে) তারা সিজদারত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় (মাটিতে) লুটিয়ে পড়ত।

আনুযঙ্গিক স্ফাতব্য বিষয়

كَانَ مُخْلِماً—আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে জ্রঞ্জেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে 'مُخْلِمٌ' বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন; যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِفَالْمَنَةِ زَكَّرَ الدَّارَ—অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও এই মর্তবা কতক পরিমাণে লাভও করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে শুনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহর হিফায়তে থাকেন।

—এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

الْأَيْمَن—তুর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মুসা (আ)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তুর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌছার পর তুর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

نَجِيًّا—কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مَنَاجَات এবং ঝার সাথে একত্র কথাবার্তা বলা হয়, তাকে নَجِيٌّ বলা হয়।

وَمِنَّا لَهُ مَن رُّحِمْنَا أَخَاهُ هَارُونَ — শব্দের অর্থ দান। হযরত মুসা (আ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হারুনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وَمِنَّا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মুসাকে 'হারুন' দান করেছি। একারণেই হযরত হারুন (আ)-কে الله (আল্লাহর দান)-ও বলা হয়। (মাযহারী)

وَأَنكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ — বাহ্যত এখানে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি ; বরং মাঝখানে হযরত মুসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ مَسَارِقَ الْوَعْدِ — ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সন্তান ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও রাসূলই ওয়াদা পালনে সাক্ষা ; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই ; বরং এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মুসা (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মুসা (আ) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাইল (আ)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই-এর জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবার করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন : কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর রেওয়াজেতে তিরমিযীতে মহানবী (সা) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মর্যাদা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সংকর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সন্তান লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাগাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : الْمَدِينِ ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মু'মিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফিকাহবিদগণ বলেছেন : ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা শুনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জনা আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জোরে-জবরে আদায় করা যায়। ফিকাহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত ওয়াজিব-বিচারে ওয়াজিব নয়। —(কুরতুবী) পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য :

كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ —হযরত ইসমাইল (আ)-এর আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সংস্কারের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে : **فَوَإِنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাইল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাইল (আ) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রথমে চেষ্টা করত ছিলেন; যেমন মহানবী (সা)-এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, **وَأَنْتُمْ عَشِيرَتِي وَأَقْرَبِينَ** —অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হিদায়েতের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌছান এবং ষোদায়ে নির্দেশের অনুগামী করেন। আযাতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হিদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হিদায়েত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে একটি বিস্তৃত ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَأَنْتُمْ فِي الْكِتَابِ تَرِيضُونَ —হযরত ইদরীস (আ) নূহ (আ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুত্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আ)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সহীকা নাযিল করেন। (মামাখশারী) হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জিয়া হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহরে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাকের

স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওয়ন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন।—(বাহুরে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রুহুল মা'আনী)

رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا—অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ)-কে উচ্চ মর্তব্যে সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন :

هذا من اخبار كعب الاحبار الاسرائيليات وفي بعضه نكارة

অর্থাৎ এটা কা'বে আহুবারের ইসরাইলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি অপরিচিত। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কোরআনের তফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল কোরআন)

রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক : বয়ানুল কোরআন থেকে উদ্ধৃতি : রাসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রাসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রাসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়ত ; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রাসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয় ; যেমন ফেরেশতা রাসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে رُسُلًا বলা হয়েছে অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাইলের অধিকাংশ নবী মূসা (আ)-এর শরীয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রাসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক। এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রাসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رُسُلًا وَنَبِيًّا বলা হয়েছে, যেখানে কোন খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয় ; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ وَنَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন।

এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, **أَوْثَرِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنِ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ** এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, **وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ** এখানে ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, **وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ** এবং **وَإِسْرَءِيلَ** এখানে হযরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহুইয়া ও ইসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে।

— **إِذَا تَنَاطَلُ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا** — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল ; যেমন ইহুদীরা হযরত ওয়ায়রকে এবং খ্রিস্টানরা হযরত ঈসাকে আত্মাহুই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সম্বন্ধির পর তারা যে আত্মাহুর সামনে সিজদাকারী এবং আত্মাহুর ভয়ে ভীত ছিলেন, এ কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়। — (বয়ানুল কোরআন)

কোরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজ্জল হওয়া পয়গম্বরের সুন্নতঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরের সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরাম; তাবেঈন এবং ওলীআত্মাহুদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন : কোরআন পাকে সিজদার যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সিজদায় দোয়া করা আনিমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণত সূরা সিজদায় এই দোয়া করা উচিত :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لَوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِينَ بِحَمْدِكَ وَأَعُوذُكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ أَمْرِكَ -

সূরা বনী ইসরাইলের সিজদায় একুপ দোয়া করা উচিত :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الْبَاكِينَ إِلَيْكَ الْخَاشِعِينَ لَكَ — আলোচ্য আয়াতের সিজদায় নিম্নরূপ দোয়া করা দরকার :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَنَعِمِ عَلَيْهِمْ الْمَهْدِيِّينَ السَّاجِدِينَ لَكَ الْبَاكِينَ عِنْدَ تِلَاوَةِ آيَاتِكَ -

وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ
الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا
إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ۝ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا ۝

(৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুশ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই পঞ্চভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর ওয়াদায় তারা পৌছবে। (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য রুখী থাকবে। (৬৩) এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহিযগারদেরকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিদের) পর (কতক) এমন অপদার্থ জনগোষ্ঠা করল, যারা নামায বরবাদ করে দিল (বিশ্বাসগতভাবে অর্থাৎ অস্বীকার করল অথবা কার্যত অর্থাৎ নামায আদায় করতে অথবা জরুরী হক ও আদবে ত্রুটি করল) এবং (নফসের অবৈধ) ঋহেশের অনুবর্তী হলো (যা জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল করার মত ছিল।) সুতরাং তারা অচিরেই (পরকালে) অনিষ্ট দেখে নেবে (চিরস্থায়ী অনিষ্ট কিংবা অচিরস্থায়ী) কিন্তু যে (কুফর ও গুনাহ থেকে) তওবা করেছে, (কুফর থেকে তওবা করার মতলব এই যে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (গুনাহ থেকে তওবা করার অর্থ এই যে,) সংকর্ম করেছে। সুতরাং তারা (অনিষ্ট না দেখেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (প্রতিদান পাওয়ার সময়) তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ প্রত্যেক সংকর্মের প্রতিদান পাবে অর্থাৎ) চিরকাল বসবাসের জান্নাতে (যাবে), যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদাকৃত বিষয়ে অবশ্যই তারা পৌছবে। সেখানে (জান্নাতে) তারা কোন অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না (কেননা সেখানে অনর্থক কথাবার্তাই হবে না। ফেরেশতাদের এবং একে অপরকে) সালাম (করা) ব্যতীত। (বলা বাহুল্য, সালাম দ্বারা অনেক আনন্দ ও সুখ লাভ হয়। অতএব তা অনর্থক নয়) তারা সকাল-সন্ধ্যা খানা পাবে। (এটা হবে নির্দিষ্টভাবে। এমনিতে অন্য সময়ও ইচ্ছা করলে পাবে।) এই জান্নাত (যার উল্লেখ করা

হলো) এমন যে, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ভীরু, তাদেরকে এর অধিকারী করব।

(আল্লাহ্‌ভীরুতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।)

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

“خُلِفَ” লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরি, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরি এবং উত্তম সন্তান সন্ততি। (মায়হারী) মুজাহিদ বলেন : কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্মপরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ জর্রপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জমা‘আত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় গুনাহ : আয়াতে ‘নামায নষ্ট করা’ বলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, নখরী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদের মতে সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে ‘নামায নষ্ট করা’ বলে জমা‘আত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন :

ان اهم امركم عندي الصلوة فمن ضيعها فهو لمساواها اضيع

আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশি নষ্ট করবে।—(মুয়াত্তা মালিক)

হযরত হযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ ? লোকটি বলল : চল্লিশ বছর ধরে। হযায়ফা বললেন : তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো —মুহাম্মদ (সা)-এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবু মসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সা) বলেন : ঐ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে ‘একামত’ করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি ওষুতে ত্রুটি করে অথবা নামাযের রুকু-সিজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকু পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

মা‘আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬

হযরত হাসান (রা) নামায নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন : লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়াজে উদ্ধৃত করে বলেন : আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু গুঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাযীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, نعوذ بالله من شرور أنفسنا الا ماشاء الله

(কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্বরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা) বলেনঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

আরবী ভাষায় غي শব্দটি رشاد-এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غي বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক নানা রকম আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে যে, যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়।—(কুরতুবী)

وَلَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لِقَاً বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

الُسُلَى—এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে।—(কুরতুবী)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا—জান্নাতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমান থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে, যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে : وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ—এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার

কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যা আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহাৰ্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাস্থ্যবান।

হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন : এ থেকে বোঝা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয়—সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের বাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্বদা উপস্থিত থাকবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ — (কুরতুবী)

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝۶৪ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝۶৫ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ
إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۝۶৬ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ
قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ۝۶৭ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ
حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۶৮ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ عَنْ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى
الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝۶৯ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝۷০ وَإِنْ
مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝۷১ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ
اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝۷২

(৬৪) (জিবরাইল বলল :) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তার বিম্বৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তারই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমনায় কাউকে জানেন? (৬৬) মানুষ বলে : আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? (৬৭) মানুষ কি স্বরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না।

(৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথ্যই পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর আমি পরহিযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং মালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শানে নয়ল : সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার হযরত জিবরাঈলের কাছে আরও বেশি বেশি অবতরণের বাসনা প্রকাশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছে : আমি আপনার অনুরোধের জওয়াব জিবরাঈলের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। জওয়াব এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত (যে কোন সময়) অবতরণ করতে পারি না। তাঁরই মালিকানাধীন যা আমাদের সামনে আছে (স্থান হোক কিংবা কাল, স্থান সম্পর্কিত হোক কিংবা কাল সম্পর্কিত) এবং (এমনিভাবে) যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে আছে। (সামনের স্থান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখমণ্ডলের সামনের স্থান, পশ্চাতের স্থান হচ্ছে তার পিঠের দিকের স্থান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং। সামনের কাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, পশ্চাতের কাল হচ্ছে অতীতকাল এবং মধ্যবর্তীকাল হচ্ছে বর্তমানকাল) এবং আপনার পালনকর্তা বিন্মৃত হওয়ার নন। (সেমতে এসব বিষয় আপনি পূর্ব থেকেই জানেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি সৃষ্টিগতভাবে ও আইনগতভাবে আজ্ঞাধীন। নিজের মতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা যখন ইচ্ছা, তখন কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারি না। প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর ডুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) তিনি নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। সুতরাং (তিনি যখন এমন অধিপতি ও মালিক, তখন হে সন্তোষিত ব্যক্তি,) তুমি তাঁর ইবাদত (ও আনুগত্য) কর এবং (দু'একবার নয় বরং) তাঁর ইবাদতে দৃঢ় থাক। (যদি তাঁর ইবাদত না কর, তবে কি অন্যের ইবাদত করবে?) তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান? (অর্থাৎ তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্যও কেউ নেই। সুতরাং তাঁর ইবাদত করাই জরুরী।) (পরকালে অবিস্থাসী) মানুষ বলে : আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব? (আল্লাহ জওয়াব দেন যে,) মানুষ কি স্বরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে (অনন্তিত্ব থেকে) অস্তিত্বে এনেছি এবং সে (তখন কিছুই ছিল না (এমন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা যখন সহজ, তখন দ্বিতীয়বার জীবিত করা তো আরও বেশি সহজ হবে)। সুতরাং আপনার পালনকর্তার

কসম, আমি তাদেরকে (কিয়ামতে জীবিত করে হাশরের মাঠে) সমবেত করব এবং (তাদের সাথে) শয়তানদেরকেও (যারা দুনিয়াতে তাদের সাথে থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করত; যেমন অন্য আয়াতে আছে, **فَالْقَرِينُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْنَا** (অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের চতুর্দিকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করব যে, তারা (ভয়ের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে। অতঃপর (কাফিরদের) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (যেমন ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী) তাদেরকে পৃথক করব, যারা আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক অবাধ্য (যাতে তাদেরকে অন্যদের পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই)। অতঃপর (এই পৃথক করার কাজে কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। কেননা,) আমি (স্বয়ং) তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত আছি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকার (অর্থাৎ প্রথমে) যোগ্য। (সুতরাং নিজ জ্ঞান দ্বারা তাদেরকে পৃথক করে প্রথমে তাদেরকে অতঃপর অন্যান্য কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এই ক্রম শুধু প্রথমে প্রবেশ করার বেলায়। এরপর সবাই সমান। জাহান্নামের অস্তিত্ব এমন সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে তা প্রত্যক্ষ করানো হবে। তবে প্রত্যক্ষ করার উপায় ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাফিরদেরকে প্রবেশ ও চিরকালীন আযাবের জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে এবং মু'মিনদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে। তারা জাহান্নামকে দেখে যখন জাহান্নামে পৌছবে, তখন আরও বেশি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হবে।) এবং (কোন কোন পাপীকে অতিক্রমকালে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রকরণ। তাদেরকে ব্যাপক প্রত্যক্ষকরণের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তথ্য পৌছবে না (কেউ প্রবেশের জন্য এবং কেউ অতিক্রমের জন্য)। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা, যা (অবশ্যই) পূর্ণ হবেই। অতঃপর (এই জাহান্নাম অতিক্রম করা থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এতে মু'মিন ও কাফির সব সমান, বরং) আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব, যারা আল্লাহকে ভয় (করে বিশ্বাস স্থাপন) করত। (হয় প্রথমেই উদ্ধার করব, যেমন কামিল (মু'মিনদেরকে, না হয় কিছুকাল আযাব ভোগ করার পর উদ্ধার করব, যেমন পাপী মু'মিনদেরকে।) এবং জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) সেখানে (চিরকালের জন্য) এমতাবস্থায় ছেড়ে দেব যে, (দুঃখ ও বিষাদের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

هَلْ نَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাখর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও

নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাদীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহর নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোন সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জু'বায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আক্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এক্ষেত্রে শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَأِئِمَّةِ الْمَلَائِكَةِ أَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَسْمِعْ (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফিরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্তীর্ণ করা হবে। এমনভাবেই এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফিরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফির ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মতলব হবে এই যে, প্রত্যেক কাফির তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না ; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হয়ে যাবে।—(কুরতুবী)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جَنَّتًا—হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফির ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতি-বিহবল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ثُمَّ لَنُنَزِّلَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ—শব্দের আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোন বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধৃত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।—(মায়হারী)

وَأَن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدًا—অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোন মু'মিন ও কাফির থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয়-অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়ায়েতে مرور (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মু'মিন ও পরহিয়ারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবু সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুস্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে ; যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী اَتَّقُوا বাক্যের অর্থ তাই। এই

বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে যে ورود শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে। তাই কোন বৈপরীত্য নেই।

وَإِذْ أُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝ (৭৩) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيًا ۝ (৭৪) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۝ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا ۝ (৭৫) وَأَضْحَفُ جُنْدًا ۝ (৭৬) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ۝ (৭৭)

(৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলে : দুই দলের মধ্যে-কোনটি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম ? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁকজমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন ; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কিয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল। (৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যখন অবিশ্বাসীদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, (যেসব আয়াতে মু'মিনদের সত্যাপন্বী হওয়া এবং কাফিরদের মিথ্যাচারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়,) তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলে : (বল, আমাদের) দুই দলের মধ্যে (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে) মর্যাদা কার শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস কার উত্তম ? (অর্থাৎ এটা সুবিদিত যে, পারিবারিক সাজসরঞ্জাম, পরিজন ও পারিষদজনিত প্রাচুর্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ। এ দাবি বাহ্যিকভাবেই অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় পারিভাষিক দাবি এই যে, দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামত ঐ ব্যক্তি পায়, যে দাতার কাছে প্রিয় ও পছন্দনীয়

হয়। এই দুই দাবি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরাই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় ও প্রিয় এবং তোমরা আল্লাহর ক্রোধে পতিত ও লঙ্ঘিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এর একটি পাল্টা জওয়াব দিচ্ছেন এবং আরও একটি সত্যিকার জওয়াব দিচ্ছেন। প্রথম জওয়াব এই যে, তারা এসব কথা বলে) এবং (দেখে না যে,) আমি তাদের পূর্বে কত দলকে (ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে—যা নিশ্চিত আযাব ছিল) বিনাশ করেছি। তারা সম্পদে ও জাঁকজমকে এদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। [এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় দাবিটি ভ্রান্ত। বরং কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে পার্থিব নিয়ামত অপছন্দনীয় ও অভিশপ্তকেও দেয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি! বলুনঃ যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, (অর্থাৎ তোমরা) আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন (অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামতের রহস্য হচ্ছে শিথিলতা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা, যেমন অন্য আয়াতে আছে **وَلَمْ نَعْمَرْكُمْ** **أَوْ لَمْ يَنْفَعِيهِمْ**—এই আবকাশ ক্ষণস্থায়ী)। অবশেষে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে, তা যখন তারা দেখে নেবে—আযাব হোক (দুনিয়াতে) অথবা কিয়ামত হোক (পরকালে), তখন তারা জানতে পারবে যে, কে মর্তবায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল (অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে পারিষদবর্গকে সাহায্যকারী মনে করে এবং গর্ব করে। সেখানে জানতে পারবে যে, তাদের শক্তি কতটুকু। কেননা, সেখানে কারও কোন শক্তি থাকবেই না। একেই **أَضْفُفُ** বলা হয়েছে।) এবং (মুসলমানদের অবস্থা এই যে,) আল্লাহ তা'আলা পথপ্রাপ্তদের পথপ্রাপ্তি (দুনিয়াতে) বৃদ্ধি করেন (অর্থাৎ এটাই আসল সম্পদ। এর সাথে ধন-দৌলত না থাকলেও ক্ষতি নেই।) এবং (পরকালে প্রকাশ পাবে যে,) স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামেও উত্তম। (অতএব তারা সওয়াব হিসেবে বড় বড় নিয়ামত পাবে। তন্মধ্যে গৃহ, বাগবাগিচা সবই থাকবে। এসব সৎ কর্মের পরিণাম হচ্ছে অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব। সুতরাং মুসলমানদেরই শেষ অবস্থা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উত্তম হবে। বলা বাহুল্য, শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدْبًا—এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফিররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। এক. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং দুই. চাকর—নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের কাছে বেশি ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্তৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শক্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাধী মনে করে না ; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ প্রদত্ত

নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আত্মাহুঁর বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফিল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সূলায়মান (আ), হযরত দাউদ (আ) অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সং কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আত্মাহুঁ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আত্মাহুঁতীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফিরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আত্মাহুঁর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক সিরোঁধ মুর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশি ধন-দৌলত স্তুপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًا

বাকি-এর তফসীল সম্পর্কে নানাজনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহ্‌ফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে **بَاقِيَاتُ** বাকি বস্তু বলে যেসব ইবাদত ও সংকর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বোঝানো হয়েছে। **مُرَدًا** শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সংকর্মই আসল সম্পদ। সংকর্মের সওয়াব বিরাট এবং পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۖ أَطَّلَعَ
الْغَيْبَ أَمْ آتَاهُ مِنَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ
لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ وَنَزِّنُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۖ وَآتَخَذُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۖ

(৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে : আমাকে অর্থসম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি অবশ্যই দেওয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে ? (৭৯) এ তো নয় ঠিক সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (৮১) তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ) আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে (তন্মধ্যে পুনরুত্থানের নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয ছিল) বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং (ঠাট্টার ছলে) বলে : আমাকে পরকালে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি দেওয়া হবে। (উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তির অবস্থাও আশ্চর্যজনক। অতঃপর খণ্ডন করা হচ্ছে :) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা সে কি আল্লাহর কাছ থেকে (এ বিষয়ে) কোন অস্বীকার লাভ করেছে ? (অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে সে কি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের নামান্তর, নাকি পরোক্ষভাবে জানতে পেরেছে ? এ দাবিটি যেহেতু যুক্তিভিত্তিক নয় ; বরং বর্ণনাশ্রয়ী, তাই বর্ণনাশ্রয়ী প্রমাণই অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বর্ণনাই এর প্রমাণ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এরূপ বর্ণনা করেননি। কাজেই দাবিটি সম্পূর্ণ অবাস্তর।) কখনই নয় (সে মিথ্যা বলে), সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং (যথাসময়ে এরূপ শাস্তি দেব যে,) তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব (অর্থাৎ সে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং ধন-দৌলত ও সম্ভান-সমৃদ্ধির উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। আমিই সব কিছুর মালিক হব এবং কিয়ামতে আমি তাকে দেব না ; বরং) সে আমার কাছে (ধন-দৌলত ও সম্ভান-সমৃদ্ধি ছেড়ে) একাকী আসবে। তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের জন্য তারা আল্লাহর কাছে) সম্মান লাভের কারণ হয়। (যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে— يَقُولُونَ مُؤَلَاءَ شُفَعَاءِنَا অতএব এরূপ) কখনই নয় (বরং) তারা তো (কিয়ামতে স্বয়ং) তাদের ইবাদতই অস্বীকার করে বসবে (যেমন সূরা ইউনুসের তৃতীয় ককূতে বর্ণিত হয়েছে, قَالَ شَرِكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ بِنَا تَتَّبِعُونَ) এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (কথায়ও, যেমন বর্ণিত হলো এবং অবস্থায়ও তা'ই হবে। অর্থাৎ সম্মানের পরিবর্তে অপমানের কারণ হয়ে যাবে। এসব উপাস্যের মধ্যে প্রতিমাও থাকবে। সুতরাং তাদের কথা বলা যেমন يَكْفُرُونَ শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বলার অনুরূপ অসম্ভব নয়।)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا تُؤْتِينَ مَالًا وَلَوْلَا—বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাক্বাব ইবনে আরভের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফিরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল : তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাক্বাব জওয়াব দিলেন : এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল : ভাল তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব ? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতি থাকবে। —(কুরতুবী)

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফিরের জওয়াবে বলেছে : সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনর্বীর জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতি থাকবে ? أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ—সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে ? أَطْلَعَ الْغَيْبِ—অথবা সে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে ? বলা বাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে ? وَتَرَىٰ مَا يَفْعَلُ—(অর্থাৎ সে যে ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভতি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

وَيَأْتِيَنَا فَرْدًا—কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সম্ভান-সম্ভতি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا—(অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফিররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

الْم تَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَزَّهُمْ أَزًّا ۝ لَا تَجْعَلُ عَلَيْهِمْ إِثْمًا
نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝ وَنَسُوقُ
الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثَةً ۝ لَا يَسْلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ
اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

(৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাকিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তারা ছাড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহিয়গারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহর কাছে থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি যে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে দুঃখ করেন তখন) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি শয়তানদেরকে কাকিরদের উপর (পরীক্ষার্থে) ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে (কুফর ও পথভ্রষ্টতার) খুব উৎসাহিত করে। (এমতাবস্থায় যারা বেচ্ছায় তাদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য দুঃখ কিসের?) আপনি তাঁদের জন্য তাড়াহুড়া (করে আযাবের দরখাস্ত) করবেন না। আমি স্বয়ং তাদের (শান্তিযোগ্য) বিষয়াদি গণনা করছি। (তাদের এই শাস্তি ঐ দিন হবে) যেদিন আমি পরহিয়গারদেরকে দয়াময় আল্লাহর কাছে অতিথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (তাদের কোন সুপারিশকারীও থাকবে না। কেননা সেখানে) কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না; কিন্তু যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে থেকে অনুমতি লাভ করেছে। (তারা হচ্ছেন পরগমর ও সং কর্মপরায়ণ মনীষীবৃন্দ। আর অনুমতি একমাত্র ঈমানদারদের জন্যই হবে। সুতরাং কাকিররা সুপারিশের পাত্র হবে না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حُزْنَ - فَرْ - اَزْ - فَرْ - আরবী অভিধানে — تَوَزُّمًا — হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। اَزْ শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্য প্রভুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাকিরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

نَعْدُلُهُمْ — (উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্ত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعْدُلُهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বন্ধাধীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের স্বাস-প্রস্বাস, তাদের চলাফেরার

এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আঘাত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মাম্বুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলিম ও ফিকাহবিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরম্ভ করলেন : আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন ভো তা খুবই দ্রুত নিরুশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন :

حياتك انفاس تعد فكلمنا
مضى نفس منك انتقص به جزء

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে। —(কুরতুবী) জনৈক বুয়ুর্গ বলেছেন :

وكيف يفرح بالدنيا ولذتها
فتى يعد عليه اللفظ والنفس

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিচ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে। —(রুহুল মা'আনী)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا যারা বাদশাহ্ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছে : তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেন : তাদের সং কর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। —(রুহুল মা'আনী, কুরতুবী)

إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرْدًا —এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وَرْدًا এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হলো।

مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا —হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : عهد (অঙ্গীকার) বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেন : عهد বলে কোরআনের হিক্ম বোঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ইমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে। —(রুহুল মা'আনী)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ
مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 إِلَّا إِلَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ وَكُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 فَرْدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
 وُدًّا ۖ فَإِنَّمَا يَسْرُنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ
 قَوْمًا لَّدَا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ
 أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۚ

(৮৮) তারা বলে : দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো
 এক অজ্ঞত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে,
 পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময়
 আল্লাহর জন্য সন্তান আহ্বান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য
 শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস
 হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে
 গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায়
 আসবে। (৯৬) ব্যাধি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকল্প সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময়
 আল্লাহ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি,
 যাতে আপনি এর দ্বারা পরহিযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে
 সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি
 তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কাফিররা) বলে : (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা সন্তান (ও) গ্রহণ করে
 রেখেছেন (সেমতে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান অল্পসংখ্যক ইহুদী এবং আরবীয় মুশরিকরা এই
 ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন) তোমরা (এ কথা বলে) গুরুতর কাণ্ড
 করেছ। এর কারণে হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং
 পর্বতমালা ভেঙ্গে পড়বে ; কারণ তারা আল্লাহর সাথে সন্তানকে সহজযুক্ত করে। অথচ
 সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়। (কেবল) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে

যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে গোলাম হয়ে উপস্থিত হয় (এবং) তিনি সবাইকে স্বীয় কুদরত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং (স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। (এ হলো তাদের বর্তমান অবস্থা) এবং কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে। (প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ হবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তান থাকলে আল্লাহ্‌র মতই “সদাসর্বদা বিদ্যমান” গুণে গুণাবিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বব্যাপী কুদরত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্‌র সিফাত এবং মুখাপেক্ষিতা ও আনুগত্য হচ্ছে অন্যের সিফাত। এগুলো একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং এই বিপরীত গুণের একত্র সমাবেশ কিরূপে হতে পারে?)

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সং কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তা'আলা(তাদেরকে উল্লিখিত পারলৌকিক নিয়ামত ছাড়া দুনিয়াতে এই নিয়ামত দেবেন যে,) তাদের জন্য (সৃষ্ট জীবের অন্তরে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সুতরাং আপনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিন। কেননা) আমি এই কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা আল্লাহ্-ভীরুদেরকে সুসংবাদ দেন এবং তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (সতর্কীকরণের বিষয়াদির মধ্যে জাগতিক শান্তির একটি বিষয়বস্তু এও যে) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। (অতএব) আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকে দেখেন, অথবা কারও কোন ক্ষীণতম শব্দও শোনেন? (এখানে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কাকিররা এই জাগতিক শান্তিরও যোগ্য। যদিও কোন উপকারিতার কারণে কোন কাকিরের উপর এই শান্তি পতিত হয়নি; কিন্তু আশংকার যোগ্য তো অবশ্যই।)

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ دُخَانًا এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ নামের তসবীহ পাঠ করে, যেমন কোরআন বলে : وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করে না,—এমন কোন বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষত আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন : জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্ট বস্তু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। —(রুহুল মা'আনী)

وَعَفُفٌ مِّنَّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের স্বাস-প্রস্থাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহর কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশি হতে পারে না।

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا অর্থাৎ ইমান ও সৎকর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ইমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্ট জীবের মনেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে এ কথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন : কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (রুহুল মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেন : যে ব্যক্তি সর্বাস্তকরণে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ইমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।—(কুরতুবী)

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুধপোষ্য সন্তান ইসমাইল (আ)-কে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার শুক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেন : فَاجْعَلْ اَفْنَدَةً مِّنْ النَّاسِ تَهْبِئُ بِالنَّبِيِّ الْاٰلِهِيْمُ হে আল্লাহ্, আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্ষ্ম বাধা-বিপত্তি ডিসিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا—বোধগম্য নয়—এমন ক্রীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয় ; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিদরদেরকে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্রীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

সূরা নূর
২১-৩৪ আয়াত

উপরোক্ত ঘটনাঘয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেয়ানের আয়াত এর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হাজর ও ইমাম নবভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হিলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেয়ান-আয়াত এরই পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়ায়মের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জানা ছিল না। কাজেই এ ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন। তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে **فَنَزَلَ جِبْرِئِيلُ** এবং ওয়ায়মেরের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে **فَنَزَلَ اللَّهُ** এর অর্থ একরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।—(মায়হারী) **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

মাসআলা : বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেয়ান হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায় ; যেমন দুধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **الْمُتَلَامِعَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا** লেয়ানের সাথে-সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায় ; কিন্তু ইন্দতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী একরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।—(মায়হারী)

মাসআলা : লেয়ানের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে না ; তাকে তার মাতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাল ইবনে উমাইয়া ও ওয়ায়মের আজলানী উভয়েরই ঘটনায় এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেয়ানের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাবে ; কিন্তু দুনিয়ার শান্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনিভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যভিচারিণী ও সন্তানকে জারজ সন্তান বলাও কারও জন্য জায়েয হবে না। হিলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন। **وَقَضَىٰ بَانَ لَا تَرْمِي وَلَا وَلَدَهَا**

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ بَلْ كُلُّ امْرَأٍ مِّنْهُمْ تَاكْتَسِبُ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ ﴿٥٩﴾ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ
 شَهَادَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَوْلَا
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦١﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَاحِشُكُمْ مَا لَيْسَ
 لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
 قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا بَيِّنَاتٌ عَظِيمٌ ﴿٦٣﴾
 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِلثَّلَاةِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ آيَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
 فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٧﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ
 فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالنُّكَرِ ۖ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا
 مِنْكُمْ مَنِ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنِ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾
 وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
 لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

لَعَنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٥﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
 أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ يَوْمَ يُؤْقِرُ اللَّهُ دِينَهُم
 الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٧﴾ الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ
 لِلْحَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
 يَقُولُونَ ۖ لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٨﴾

(১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রতিশোধের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে ভুলাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (১২) তোমরা যখন একথা শুনে, তখন ইমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করেনি এবং বলনি যে, এটা তো নির্জনা অপবাদ ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে নি ; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করেছিলে, তখনো তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুলে মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ কথা শুনে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ইমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (১৮) আল্লাহ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৯) যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে। আল্লাহ জ্ঞানেন, তোমরা জ্ঞান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ইমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্জ্ঞতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারত না।

কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-বন্ধনকে, অভাবগন্তকে এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাক্ষী, নিরীহ, ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে শিক্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে চরুতর শাস্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত; (২৫) সেদিন আল্লাহ্ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুশরিত্রা নারীকুল দুশরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুশরিত্র পুরুষকুল দুশরিত্রা নারীকুলের জন্যে। সশরিত্রা নারীকুল সশরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সশরিত্র পুরুষকুল সশরিত্রা নারীকুলের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

পূর্বাগর সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সংরক্ষণের জন্য প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহাবিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এই পরম্পরায় প্রথমে ব্যভিচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে সেয়ানের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চারজন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাক্ষী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বিষয়টি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি এমনি ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের ব্যাপার থেকে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এ স্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করে তাঁর ব্যাপারে যারা কুৎসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের সবাইকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত। 'ইফক' শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তফসীর বুঝার জন্য অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ

হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) বনী মুত্তালিক নামান্তরে মুরাইসী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা প্রথমে পর্দা বিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাতে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হলো যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হোক। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দা বিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হলো এবং বাহকরা মনে করল যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হলো না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাক্সিনী ছিলেন। ফলে আসনটি শূন্য-এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হলো না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা ও এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে গেলেন। তিনি মনে করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাদের জন্য তালাশ করে নেওয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষরাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে চলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তালকে রাসূলুল্লাহ (সা) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত পরিতাপের সাথে তাঁর মুখ থেকে “ইন্না লিদ্ধাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকে রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দূচরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের

মধ্যে হযরত হাসসান, মিস্তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল-এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দূররে মনসুরে ইবনে মরদুওয়াইহর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আক্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে, اعانه اى عبد الله بن ابي حسان ومسطح وجمنه

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাক্লান্ত হলেন। এক মাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আত্মাহ্ তা'আলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আয়াতগুলোর তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদে বর্ণিত কোরআনী বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হলো। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হলো। বাযযার ও ইবনে মরদুওয়াইহ্ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনজন মুসলমান মিস্তাহ্, হামনাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসল অপবাদ রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেন এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কারেম থাকে। —(বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুসলমানগণ, তোমরা যারা হযরত আয়েশা সম্পর্কিত মিথ্যা অপবাদ খ্যাত হওয়ার কারণে দুঃখিত হয়েছ, হযরত আয়েশাও এর অন্তর্ভুক্ত, তোমরা অধিক দুঃখ করো না। কেননা) যারা এই মিথ্যা অপবাদ (হযরত আয়েশা সম্পর্কে) রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি (ক্ষুদ্র) দল। (কেননা অপবাদ আরোপকারী মোট চারজন ছিল; একজন সরাসরি এবং মিথ্যা অপবাদ রচয়িতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং তিনজন পরোক্ষভাবে তার প্রচারণায় প্রভাবান্বিত হয়ে যায় অর্থাৎ, হাসসান, মিস্তাহ্ ও হামনাহ্। এরা ছিল খাঁটি মুসলমান। কোরআন তাদের সবাইকে منك বলে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছে; অথচ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ছিল মুনাফিক। এর কারণ ছিল তার বাহ্যিক মুসলমানিত্বের দাবি। আয়াতের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা দান করা যে, অধিক দুঃখ করো না। প্রথমত, সংবাদই মিথ্যা, এরপর বর্ণনাকারীও মাত্র চারজন। অধিকাংশ লোক তো এর বিপক্ষেই। কাজেই সাধারণভাবেও এটা অধিক চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। অতঃপর অন্য এক পন্থায় সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে:) তোমরা একে (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকে) নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না (যদিও বাহ্যত দুঃখজনক কথা; কিন্তু বাস্তবে এতে তোমাদের ক্ষতি নেই।) বরং এটা (পরিণামের দিক দিয়ে) তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। (কেননা, এই দুঃখের কারণে তোমরা সবরের সওয়াব পেয়েছ। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিদের পবিত্রতা সম্পর্কে অকাটা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; ভবিষ্যতেও মুসলমানদের জন্য এতে মঙ্গল আছে। কারণ, এরূপ

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এই ঘটনা থেকে সাজুনা লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তবে চর্চাকারীদের ক্ষতি হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যে যতটুকু করেছে, তার গুনাহ (উদাহরণত মুখে উচ্চারণকারীদের অধিক গুনাহ হয়েছে। যারা শুনে নিশ্চুপ রয়েছে কিংবা মনে মনে কুধারণা করেছে, তাদের তদনুযায়ী গুনাহ হয়েছে।) এবং তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে (অর্থাৎ অপবাদ রটনায়) যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে (অর্থাৎ একে আবিষ্কার করেছে। এখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে।) তার (সর্বাধিক) কঠোর শাস্তি হবে (অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে। কুফর, কপটতা ও রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণে পূর্ব থেকেই সে এর যোগ্য ছিল। এখন সে আরও অধিক শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত বলা হলো যে, দুঃখিতদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং অপবাদ আরোপকারীদেরই ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা ষাটি মুসলমান ছিল তাদেরকে উপদেশমূলক তিরস্কার করা হচ্ছে : যখন তোমরা এ-কথা শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ (হাসান ও মিসতাহ ও এর অন্তর্ভুক্ত)। এবং মুসলমান নারীগণ (হামনাহ ও এর অন্তর্ভুক্ত) কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে (অর্থাৎ হযরত আয়েশা ও সাফওয়ান সাহাবী সম্পর্কে মনেপ্রাণে) সুধারণা করেনি এবং (মুখে) বলেনি যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা। (দূররে মনসুরে আবু আইউব ও তাঁর স্বীকৃত এরূপ উক্তিই বর্ণিত আছে। এতে অপবাদ আরোপকারীদের সাথে তারাও শামিল রয়েছে, যারা শুনে নিশ্চুপ ছিল কিংবা সন্দেহে পড়েছিল। সাধারণ ঈমানদার পুরুষ ও নারী সবাইকে তিরস্কার করা হয়েছে। অতঃপর এই অপবাদ খণ্ডন এবং সুধারণা রাখা যে ওয়াজিব, তার কারণ ব্যক্ত করা হচ্ছে : তারা (অর্থাৎ অপবাদ আরোপকারীরা) কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি ? (যা ব্যভিচার প্রমাণ করার জন্য শর্ত। অতঃপর যখন তারা (নিয়ম অনুযায়ী) সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন আল্লাহর কাছে (যে আইন আছে, তার দিক দিয়ে) তারাই মিথ্যাবাদী। (অতঃপর অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল, তাদের প্রতিও রহমতের কথা বলা হচ্ছে : যদি (হে হাসান, মিসতাহ ও হামনাহ) তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত ইহকালে (যেমন তওবার সময় দিয়েছেন) এবং পরকালে, (যেমন তওবার তওফীক দিয়ে তা কবুলও করেছেন। এরূপ না হলে) তবে তোমরা যে কাজে লিপ্ত হয়েছিলে, তজ্জন্য তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত যেমন তওবা না করার কারণে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে স্পর্শ করবে, যদিও এখন দুনিয়াতে তাকেও অবকাশ দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু উভয় জাহানে তার প্রতি রহমত নেই। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের তওবা কবুল হবে এবং তাঁরা পাক অবস্থায় পরকালে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হবেন। عَلَيْهِمُ اللَّهُ ঈমানদারগণকে সন্মোদন করা হয়েছে। এর ইঙ্গিত প্রথমত উপরের আয়াতে ظَنُّوا الْمُؤْمِنُونَ দ্বিতীয়ত فِي الْآخِرَةِ বলা। কেননা, মুনাফিক তো পরকালে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। অতএব তারা নিশ্চিতই পরকালে রহমতপ্রাপ্ত হতে পারবে না এবং তৃতীয়ত সম্মুখে لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ আয়াতে তাবারানী ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَحِمَّةٌ وَحَسَنَةٌ অর্থাৎ ঈমানদারগণকে সন্মোদন করা হয়েছে—মিসতাহ, হামনাহ ও হাসান। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মু'মিনদের তওবার তওফীক ও তওবা কবুল করে যদি আল্লাহ তা'আলা

তাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তবে তারা যে কাজ করেছিল, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে গুরুতর আযাবের কারণ ছিল। বলা হয়েছে ১) যখন তোমরা এই মিথ্যা কথাটিকে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন (প্রমাণভিত্তিক) জ্ঞান তোমাদের ছিল না। (এই খবরের বর্ণনাকারী যে মিথ্যাবাদী, তা **فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ مُكَذِّبُونَ** বাক্যে বিবৃত হয়েছে।) তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর (অর্থাৎ মহাপাপের কারণ) ছিল। [প্রথমত কোন সতী নারীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ হয়ং মস্ত শুনাহু। তদুপরি নারীও কে? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্রা স্ত্রী, যার প্রতি অপবাদ আরোপ করা রাসূলে মকবুল (সা)-এর মনোবেদনার কারণ হয়েছে। সুতরাং এতে শুনাহের অনেক কারণ একত্রিত হয়েছে।] তোমরা যখন এ কথা (প্রথমে) শুনে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের জন্য শোভন নয়। আমরা আল্লাহর আশ্রয় চাই; এ তো গুরুতর অপবাদ। (কোন কোন সাহাবী এ কথা বলেও ছিলেন; যেমন সা'দ ইবনে মু'আয, যায়দ ইবনে হারিসা ও আবু আইউব (রা)। আরও অনেকে হয়তো বলে থাকবেন। উদ্দেশ্য এই যে, অপবাদ আরোপকারী এবং নিকূপ ব্যক্তি সবারই এ কথা বলা উচিত ছিল। এ পর্যন্ত অতীত কাজের জন্য তিরস্কার ছিল। এখন, ভবিষ্যতের জন্য উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, যা তিরস্কারের আসল উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে ২) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বিধান বর্ণনা করেন (উপরোক্তস্থিত উপদেশ, অপবাদের হদ, তওবা কবুল ইত্যাদি সব এর অন্তর্ভুক্ত।) আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [তোমাদের অন্তরের অনুশোচনার অবস্থাও তিনি জানেন। ফলে তওবা কবুল করেছেন এবং শাসনের রহস্য সম্পর্কে তিনি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত। তাই শাসনের কারণে তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন। (ইবনে আব্বাস—দূররে মনসুর) এ পর্যন্ত পবিত্রতার আয়াত নাযিলের পূর্বে যারা অপবাদের চর্চা করত, তাদের কথা আলোচনা করা হলো। অতঃপর তাদের কথা বলা হচ্ছে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও কুৎসা রটনায় বিরত হয় না। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বেঈমানই হবে। বলা হচ্ছে ৩) যারা (এসব আয়াত অবতরণের পরেও) পছন্দ করে (অর্থাৎ কার্যত চেষ্টা করে) যে, মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীল কথা প্রচার লাভ করুক (অর্থাৎ মুসলমানগণ নির্লজ্জ কাজ করে—এ সংবাদ প্রসার লাভ করুক। সারকথা এই যে, যারা এই পবিত্র লোকজনের প্রতি ব্যাভিচার আরোপ করে) তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (এ কারণে শাস্তির জন্য বিন্মিত হয়ো না; কেননা) আল্লাহ তা'আলা জানেন (যে, কোন্ শুনাহ কোন্ স্তরের) এবং তোমরা [এর স্বরূপ পুরোপুরি] জান না। (ইবনে আব্বাস—দূররে মনসুর) এরপর যারা তওবা করে পরকালের আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে, তাদেরকে সন্তোষন করা হচ্ছে ৪) এবং (হে তওবাকারিগণ) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, (যে কারণে তোমরা তওবার তওফীক লাভ করেছ) এবং আল্লাহ দয়ালু ও মেহেরবান না হতেন, (যে কারণে তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন) তবে তোমরাও (এই হুমকি থেকে) বাঁচতে পারতে না। (অতঃপর মুসলমানগণকে উল্লিখিত শুনাহসহ সকল প্রকার শুনাহ থেকে বিরত থাকার আদেশ এবং

তওবা দ্বারা আত্মশুদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, যা গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ইরশাদ করা হচ্ছে যে) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (অর্থাৎ তার প্ররোচনায় কাজ করো না) যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ; শয়তান তো (সর্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিকে) নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে (যেমন এই অপবাদের ঘটনায় তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার এবং গুনাহ অর্জন করার পর তার অবধারিত অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে মুক্তি দেওয়াও আমারই অনুগ্রহ ছিল। নতুবা) যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও (তওবা করে) পবিত্র হতে পারত না। (হয় তওবার তওফীকই হতো না ; যেমন মুনাফিকদের হয়নি ; না হয় তওবা কবুল করা হতো না। কেননা আমার উপর কোন বিষয় ওয়াজিব নয়।) কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান, (তওবার তওফীক দিয়ে) পবিত্র করেন। (তওবার পর নিজ কৃপায় তওবা কবুল করার ওয়াদাও করেছেন।) আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন, জানেন। (সুতরাং তোমাদের তওবা শুনেছেন এবং তোমাদের অনুশোচনা জেনেছেন। তাই অনুগ্রহ করেছেন। এরপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকরসহ অন্য কয়েকজন সাহাবী ক্রোধের আতিশয্যে কসম খেয়ে ফেললেন যে, যারা এই অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণ করেছে, এখন থেকে আমরা তাদেরকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করব না। বলা বাহুল্য, তাদের মধ্যে কয়েকজন অভাবগ্রস্তও ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্রটি ক্ষমা করে সাহায্য পুনর্বহাল করার জন্য বলেন :) তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্যশালী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। (অর্থাৎ তারা যেন এই কসমের উপর কায়ম না থাকে এবং কসম ভেঙ্গে দেয়। নতুবা কসম তো হয়েই গিয়েছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলীর কারণে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত ; বিশেষত যার মধ্যে সাহায্যের কোন হেতু বিদ্যমান আছে, যেমন হযরত মিসতাহ্ হযরত আবু বকরের আত্মীয় ছিলেন এবং মিসকীন ও মুহাজিরও ছিলেন। অতঃপর উৎসাহদানের জন্য বলা হয়েছে :) তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ক্রটি ক্ষমা করেন ? (অতএব তোমরাও দোষী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমা করে দাও।) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল পরম করুণাময়। (অতএব তোমাদেরও আল্লাহর গুণে গুণাবিত হওয়া উচিত। অতঃপর মুনাফিকদের প্রতি উচ্চারিত শাস্তিবানী ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা উপরে الَّذِينَ يُحِبُّونَ الدُّنْيَا আয়াতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ) যারা (আয়াত নাযিল হওয়ার পর) সতী-সাহ্মী, নিরীহ ও ঈমানদার নারীদের প্রতি (ব্যক্তিচারের) অপবাদ আরোপ করে, [যাদের পবিত্রতা কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিদের সবাইকে শামিল হওয়ার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। যারা এমন পবিত্রা নারীদেরকে অভিযুক্ত করে ; বলা বাহুল্য, তারা কাফির ও মুনাফিকই হতে পারে।] তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত (অর্থাৎ তারা কুফরের কারণে উভয় জাহানে আল্লাহর বিশেষ রহমত থেকে দূরে থাকবে) এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে এবং তাদের হস্তপদও (সাক্ষ্য দেবে)

যা কিছু তারা করত। (উদাহরণত জিহ্বা বলবে, সে আমার দ্বারা অমুক অমুক কুফরের কথা বলেছে এবং হস্তপদ বলবে, সে কুফরের বিষয়াদি প্রচলিত করার জন্য এমন-এমন চেষ্টা সাধনা করেছে।) সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং (সেদিন ঠিক ঠিক) তারা জানবে যে, আল্লাহ সত্য ফয়সালাকারী এবং স্পষ্ট ব্যক্তকারী (অর্থাৎ এখন তো কুফরের কারণে এ বিষয়ে তাদের যথার্থ বিশ্বাস নেই; কিন্তু কিয়ামতের দিন বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস হওয়ার পর মুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের উপযুক্ত ফয়সালা হবে চিরন্তন আযাব। এই আয়াতগুলো তওবা করেনি এমন লোকদের সম্পর্কে, যারা পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও অপবাদের বিশ্বাস থেকে বিরত হয়নি। তওবাকারীদেরকে **فَضَّلَ اللَّهُ وَرَحِمَهُ** আয়াতে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত বলা হয়েছে এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে **لَعَنُوا** বলে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে **لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي عَذَابٍ عَظِيمٍ** বাক্যে আযাব থেকে নিরাপদ বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি এমন লোকদেরকে **لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** বলে এবং এর আগে **وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا كَيْدًا** বাক্যে লিখিত বলা হয়েছে। তওবাকারীদের জন্য **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** বাক্যে ক্ষমা ও গুনাহ উপেক্ষা করার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদের জন্য **يُوقِنُ** বাক্যে ক্ষমা না করা ও শাস্তি করা হুমকি উচ্চারণ করা হয়েছে। তওবাকারীদেরকে **مَا زَكَّيْنَاكُمْ** বাক্যে পবিত্র বলা হয়েছিল এবং তওবা করেনি, এমন লোকদেরকে পরবর্তী আয়াতে **خَبِيثٌ** তথা দুশ্চরিত্র বলা হয়েছে। একেই পবিত্রতার বিষয়কত্বের প্রমাণ হিসেবে পেশ করে আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সামগ্রিক নীতি যে দুশ্চরিত্র নারীকুল দুশ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং দুশ্চরিত্র পুরুষকুল দুশ্চরিত্র নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সচ্চরিত্র নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য উপযুক্ত এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্র নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। (এ হচ্ছে প্রমাণের এক বাক্য। এর সাথে আরও একটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্য সংযোজিত হবে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রত্যেক বস্তু তাঁর জন্য যোগ্য ও উপযুক্তই দেওয়া হয়েছে এবং তা পবিত্র বৈ নয়। অতএব এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিবিগণও সচ্চরিত্র। তাঁরা সচ্চরিত্র হলে এই বিশেষ অপবাদ থেকে হযরত সাফওয়ানের নিষ্কলুষতাও জরুরী হয়ে পড়ে। তাই পরের আয়াতে বলা হয়েছে :) তাঁদের সম্পর্কে (মুনাফিক) লোকেরা যা বলে বেড়ায়, তা থেকে তাঁরা পবিত্র। তাঁদের জন্য (পরকালে) ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (অর্থাৎ জান্নাত) আছে।

আনুমানিক ভাষ্য বিষয়

হযরত আরেশা সিজীকার বিশেষ প্রেরিত্ব ও গুণাবলী এবং অপবাদ-কাফিরীর অবশিষ্টাংশঃ শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম করেনি। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য যে-যে উপায় তাদের মস্তিষ্কে উদ্ভিত হতে পারত, তা সবগুলোই তারা সন্নিবেশিত করেছে। কাফিরদের তরফ থেকে তিনি যেসব কষ্ট পেয়েছেন, তন্মধ্যে সম্ভবত এটাই ছিল সর্বশেষ কঠোর ও মানসিক কষ্ট। মুনাফিক

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বাধিক বিদূষী, জ্ঞান-গরিমায় সমুন্নত ও পবিত্রতমা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ইবনে মুয়াত্তালের ন্যায় ধর্মপ্রাণ সাহাবীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ রটনা করল। মুনাফিকরা এতে রঙ চরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল। এতে সর্বাধিক দুঃখজনক বিষয় ছিল এই যে, কয়েকজন সরলপ্রাণ মুসলমানও তাদের চক্রান্তে প্রভাবান্বিত হয়ে অপবাদের চর্চা করতে লাগল। এই ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন ও উড়ে আসা অপবাদের স্বরূপ কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-আপনিই খুলে যেত ; কিন্তু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও উম্মুল মু'মিনীনের মানসিক ক্লেশ মোচনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর কোন প্রকার ইঙ্গিতকে যথেষ্ট মনে করেননি; বরং কোরআনের প্রায় দুইটি রুকু তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করার জন্য নাখিল করেন। যারা এই অপবাদ রচনা করে অথবা এর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, তাদের সবার প্রতি এমন কঠোর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তিবাহী উচ্চারণ করা হয়, যা বোধ হয় ইতিপূর্বে অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই অপবাদ-ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার সতীত্ব ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমাকেও ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তোমরা এই দুর্ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না ; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। বলা বাহুল্য, এর চাইতে বড় মঙ্গল আর কি হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা দশটি আয়াতে তাঁর পবিত্রতা ও নিরুলুঘতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই আয়াতগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। স্বয়ং আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : আমার নিজের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আমার সাফাই ও পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন ; কিন্তু আমি নিজেকে এর উপযুক্ত মনে করতাম না যে, কোরআনে চিরকাল পঠিত হবে, এমন আয়াতসমূহ আমার ব্যাপারে নাখিল করা হবে। এ স্থলে ঘটনার আরও কিছু বিবরণ জেনে নেওয়াও আয়াতসমূহের তফসীর হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে সহায়ক হবে। তাই সংক্ষেপে তা বর্ণিত হচ্ছে :

সফর থেকে ফিরে আসার পর হযরত আয়েশা গৃহকর্মে মশগুল হয়ে গেলেন। মুনাফিকরা তাঁর সম্পর্কে কি কি খবর রটনা করছে, সে ব্যাপারে তিনি কিছুই জ্ঞানতেন না। বুখারীর রেওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত আয়েশা বলেন : সফর থেকে ফিরে আসার পর আমি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। এই অসুস্থতার প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমি এ যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছ থেকে যে ভালবাসা ও কৃপা পেয়ে এসেছিলাম, তা অনেকটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তিনি প্রত্যহ গৃহে এসে সালাম করতেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করে ফেরত চলে যেতেন। আমার সম্পর্কে কি খবর রটনা করা হচ্ছে, আমি যেহেতু তা জানতাম না, তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ব্যবহারের হেতু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হতো না। আমি এই আশুনেই দগ্ধ হতে লাগলাম। একদিন দুর্বলতার কারণে মিসতাহ্ সাহাবীর জননী উম্মে মিস্তাহ্কে সাথে নিয়ে আমি বাহ্যের প্রয়োজন মিটানোর

উদ্দেশ্যে গৃহের বাইরে গেলাম। কেননা, তখন পর্যন্ত গৃহে পায়খানা তৈরি করার প্রচলন ছিল না। যখন আমি প্রয়োজন সেরে গৃহে ফিরতে লাগলাম, তখন উম্মে মিস্তাহর পা তার বড় চাদরে জড়িয়ে গেল। সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন তার মুখ থেকে এই বাক্য বেরিয়ে পড়ল **نفس مسطح** (মিস্তাহ্ নিপাত যাক)। আরবে এই বাক্যটি বাদদোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। জননীর মুখে পুত্রের জন্য বাদদোয়ার বাক্য শুনে হযরত আয়েশা বিস্মিতা হলেন। তিনি বললেন : এ তো খুবই খারাপ কথা। তুমি একজন সং লোককে মন্দ বলছ। সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তখন উম্মে মিস্তাহ্ আশ্চর্যান্বিতা হয়ে বলল : মা, তুমি কি জান না আমার পুত্র মিস্তাহ্ কি বলে বেড়ায়? আমি জিজ্ঞেস করলাম : সে কি বলে? তখন তার জননী আমাকে অপবাদকারীদের অপবাদ অভিযানের আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং মিস্তাহর তাদের সাথে জড়িত থাকার কথা বর্ণনা করল। হযরত আয়েশা বলেন : একথা শুনে আমার অসুস্থতা দিগুণ হয়ে গেল। আমার গৃহে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ (সা) যথারীতি গৃহে এলেন, সালাম করলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি তাঁর কাছে পিতামাতার গৃহে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। পিতামাতার কাছে এ ব্যাপারে খৌজখবর নেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি সেখানে পৌঁছে মাতাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : মা, তোমার মত মেয়েদের শত্রু থাকেই এবং তারাই এ ধরনের কথাবার্তা ছড়ায়। তুমি চিন্তা করো না। আপনা-আপনিই ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি বললাম : সুবহানাল্লাহ! সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের চর্চা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে সবর করব? আমি সারারাত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। মুহূর্তের জন্যও আমার অশ্রু থামেনি এবং চক্ষু লাগেনি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কারণে দারুণ মর্মান্বিত ছিলেন। এই কয়দিনে এ ব্যাপারে কোন ওহীও তাঁর কাছে আগমন করেনি। তাই পরিবারেরই লোক হযরত আলী (রা) ও উসামা ইবনে যায়েদের কাছে পরামর্শ চাইলেন যে, এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? হযরত উসামা পরিষ্কার আরম্ভ করলেন : যতদূর আমি জানি, হযরত আয়েশা সম্পর্কে কোনরূপ কুখবরই করা যায় না। তাঁর চরিত্রে এমন কিছু নেই, যদ্বারা কুখবরার পথ সৃষ্টি হতে পারে। আপনি এসব গুজবের পরওয়া করবেন না। হযরত আলী (রা) তাঁকে চিন্তা ও অস্থিরতার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য পরামর্শ দিলেন যে, আদ্বাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা করেননি। গুজবের কারণে হযরত আয়েশার প্রতি মন কিছুটা মলিন হয়ে থাকলে আরও অনেক মহিলা আছে। হযরত আয়েশার বান্দী বরীরাহর কাছ থেকে খৌজখবর নিলেও আপনার মনের এই মলিনতা দূর হতে পারে। সেমতে রাসূলুল্লাহ (সা) বরীরাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বরীরাহ আরম্ভ করল : অন্য কোন দোষ তো তাঁর মধ্যে দেখিনি; তবে এতটুকু জানি যে, তিনি কচি বয়সের মেয়ে। মাঝে মাঝে আটা গুলিয়ে রেখে দেন এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়েন। ছাগল এসে আটা খেয়ে যায়। (এরপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভাষণ দান, মিথ্যে দাঁড়িয়ে অপবাদ ও গুজব রটনাকারীদের অভিযোগ বর্ণনা ইত্যাকার দীর্ঘ কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী সংস্কৃতি

কাহিনী এই যে) হযরত আয়েশা বলেন : আমার সারাদিন ও পরবর্তী সারারাতও অবিরাম কান্নার মধ্যে অতিবাহিত হলো। আমার পিতামাতাও আমার কাছে চলে এসেছিলেন। তারা আশংকা করছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা যদি ফেটে যায়! আমার পিতামাতা আমার কাছেই উপবিষ্ট ছিলেন। এমনভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে এসে আমার কাছে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই ঘটনা চালু হয়েছিল, তারপর থেকে পূর্বে তিনি কখনও আমার কাছে এসে বসেননি। এরপর তিনি সংক্ষেপে শাহাদতের খুতবা পাঠ করে বললেন : হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এই এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি দোষমুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে মুক্ত ঘোষণা করবেন (অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করবেন)। পক্ষান্তরে যদি তুমি ভুল করে থাক, তবে আল্লাহ্র কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। বান্দা তার গুনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর বক্তব্য শেষ করতেই আমার অশ্রু একেবারে শুকিয়ে গেল। আমার চোখে একবিন্দু অশ্রুও আর রইল না। আমি পিতা আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বললাম : আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার উত্তর দিন। পিতা বললেন : আমি এ কথার কি উত্তর দিতে পারি। অতঃপর আমি মাকে বললাম : আপনি উত্তর দিন। তিনিও ওয়র পেশ করে বললেন : আমি কি জওয়াব দেব! তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই মুখ খুলতে হলো। আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা বালিকা। এখন পর্যন্ত কোরআনও বেশি পড়িনি। পাঠকবর্গ চিন্তা করুন, এহেন দুচ্ছিত্তা ও চরম বিষাদময় আবস্থায় শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত ব্যক্তিদের পক্ষেও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা সহজ হয় না। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা নিঃসন্দেহে প্রগাঢ় জ্ঞানী ও বিজ্ঞসুলভ উক্তি। নিম্নে তার বক্তব্য হুবহু তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করা হলো :

وَاللّٰهُ لَقَدْ عَرَفْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقْرَفَى انْفُسَكُمْ
وَصَدَقْتُمْ بِهِ وَلَنْ قُلْتُ لَكُمْ اَنْى بَرِيئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْى بَرِيئَةٌ لَا
تَصْدُقُونِى وَلَنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْى مِنْهُ بَرِيئَةٌ
لَتَصْدُقُونِى وَاللّٰهُ لَا اَجْدَلِى وَلَكُمْ مِثْلًا اِلَّا كَمَا قَالَ اَبُو يُوْسُفَ فَصَبِرْ
جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ -

“আল্লাহ্র কসম, আমার জানা হয়ে গেছে যে, এই অপবাদ বাক্যটি উপর্যুপরি শোনার কারণে আপনার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে এবং আপনি কার্যত তা সমর্থন করেছেন। এখন যদি আমি বলি যে, আমি এই দোষ থেকে মুক্ত ; যেমন আল্লাহ্ তা'আলাও জানেন যে, আমি মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে আমি যদি এমন দোষ স্বীকার করে নেই, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তবে আপনি আমার কথা মেনে নেবেন। আল্লাহ্র কসম, আমি নিজের ও আপনার ব্যাপারে এটা ব্যতীত দৃষ্টান্ত পাই না যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা ইয়াকুব (আ) মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৪৭

পুত্রদের ভ্রাতৃ কথাবার্তা শুনে বলেছিলেন : আমি সবরে জমীল অবলম্বন করছি এবং জৌহরী বা কিছু বর্ণনা করছি, সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।”

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এতটুকু কথা বলে আমি পৃথক নিজের বিছানায় গুয়ে পড়লাম। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, আমি বাস্তবে যেমন দোষমুক্ত আছি আল্লাহ তা'আলা আমার দোষমুক্ততার বিষয় অবশ্যই ওহীর মাধ্যমে প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু এরূপ কল্পমাণ ছিল না যে, আমার ব্যাপারে চিরকাল পঠিত হবে, কোরআনের এমন আয়াত নাখিল হবে। কারণ, আমি আমার মর্তবা এর চাইতে অনেক কম অনুভব করতাম। এরূপ ধারণা ছিল যে, সম্ভবত স্বপ্নাযোগে আমার দোষমুক্ততার বিষয় প্রকাশ করা হবে। হযরত আয়েশা বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) মজলিসেই বসা ছিলেন এবং গৃহের লোকদের মধ্যেও কেউ তখনও উঠেনি, এমনভাবেই তাঁর মধ্যে এমন ভাবান্তর উপস্থিত হলো, যা ওহী অবতরণের সময় উপস্থিত হতো। ফলে, কনকনে শীতের মধ্যেও তাঁর কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এই ভাবান্তর দূর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হাসিমুখে গারোখান করলেন এবং সর্বপ্রথম যে কথা বললেন, তা ছিল এই :

ابشرى يا عائشة اما الله فقد ابراك — অর্থাৎ হে আয়েশা, সুসংবাদ শোন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দোষমুক্ত করেছেন। আমার মা বললেন : দাঁড়াও আয়েশা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যাও। আমি বললাম : না মা, আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কারও ঋণ স্বীকার করি না। আমি দাঁড়াব না। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে মুক্ত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য : ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াতসমূহের তফসীরে বলেছেন : হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন। প্রথম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল একাটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন : এ আপনার স্ত্রী। (তিরমিযী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয়, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। তৃতীয়, তাঁর কোলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিহীন। পঞ্চম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কখনও ওহী অবতীর্ণ হতো, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নিচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোষমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, তাদেরও অন্যতম।

হযরত আয়েশার ককী ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজ্ঞানোচিত বক্তব্য দেখে হযরত মুসা ইবনে তালহা (রা) বলেন : আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক তত্ত্বাবধী ও প্রাজ্ঞতাবধী কাউকে দেখিনি। —(তিরমিযী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আদ্রাহ্ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য বাড়া তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আদ্রাহ্ তা'আলা তাঁর পুত্র ইসা (আ)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিন্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আদ্রাহ্ তা'আলা কোরআনের দশটি আয়াত মাফিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর, তফসীরের সার-সংক্ষেপে আভ্যন্তরীণ হয়ে গেছে। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ বাক্য সম্পর্কে বেসব আলোচনা আছে, সেগুলো দেখা যেতে পারে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ শব্দের আভিধানিক অর্থ পাণ্ডিত্যে দেখা, হাদিসিয়ে দেখা। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে হাদিসিয়ে দেয় এবং ন্যায়পন্থার অন্তিম সত্যকে কাসিক ও ফাসিককে আদ্রাহ্ তা'আলা পরহিযপায় করে দেয়, সেই মিথ্যাকেও إِفْكٌ বলা হয়। عُصْبَةٌ শব্দের অর্থ দল থেকে চম্পিত পর্যন্ত লেভেলের মল। এর কমবেশির জন্যও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। مِّنْكُمْ বলে মু'মিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মু'মিন নয়—মুনাফিক ছিল; কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানী দাবি করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মু'মিনদের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রযোজ্য হতো। তাই مِّنْكُمْ শব্দে তাকেও শামিল করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত মাফিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মু'মিনগণ সবাই তওবা করে এবং আদ্রাহ্ তা'আলা তাদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিস্তাহ তাদেরই অন্যতম ছিলেন। তারা উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধের জন্য আদ্রাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে মাগফিরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশার সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি আপবাদের শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলতেনঃ হাসসান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে কাব্যমধ্যে কাফিরদের চমৎকার মুকাবিলা করেছেন। কাজেই তাকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোন সময় হযরত আয়েশার কাছে আগমন করলে তিনি সদয়সে তাঁকে আদর দিতেন। —(মাযহারী)

تَحْسِبُوهُمْ شُرَكَاءَ—এতে নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা, সাক্ষরগণ ও সকল মু'মিন মুসলমানকে সঙ্গোপন করা হয়েছে। তারা সবাই এই গুজবের কারণে ঘব্বাহূত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা, আদ্রাহ্ তা'আলা কোরআনে তাদের দোষমুক্ততা মাফিল করে তাদের সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী মাফিল করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত পণ্ডিত হয়ে।

وَلِكُلِّ أُمَرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ অর্থাৎ যারা এই অপবাদে স্বতন্ত্র অংশ নিয়েছে, সেই পরিমাণে তার গুনাহ লিখিত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই

খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে। যে খবর শুনে সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ — অর্থ কবির অর্থ বড়। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি এই অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্য গুরুতর আযাব আছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। (বগভী)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ — অর্থ তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ মুসলমান ভাইবোনদের সম্পর্কে সুধারণা করল না কেন এবং এ কথা বলল না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এই আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম بِأَنفُسِهِمْ শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্ছিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্ছিত করে। কারণ ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে; যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে, لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না। অন্যত্র বলা হয়েছে لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ অর্থাৎ নিজেদেরকে হত্যা করো না। এখানেও কোন মুসলমান ভাইকে হত্যা করা বুঝানো হয়েছে। আরও এক জায়গায় আছে وَلَا تُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ مِنْ بَيَارِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ কোন মুসলমান ভাইকে গৃহ ত্যাগে বাধ্য করো না। আরও বলা হয়েছে, وَلَا تَقْتُلُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ নিজেদেরকে অর্থাৎ মুসলমান ভাইকে সালাম কর। কোরআন পাকের এসব আয়াতের প্রাসঙ্গিক নির্দেশ এই যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করে কিংবা তার ক্ষতি সাধন করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে দোষী ও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কেননা, সমগ্র জাতির অপমান ও দুর্নামই এর পরিণতি। সাদী বলেন :

جوا زقومه يكمه دانشی گرد

نه که رامنزلت ماند نه را

কোরআনের এই শিক্ষার প্রভাবেই মুসলমানগণ যখন উন্নতি করেছে, তখন সমগ্র জাতি উন্নতি করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি করেছে। এই শিক্ষা পরিত্যাগের ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র জাতি অধঃপতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে। এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا সন্ধান পদে বলা উচিত ছিল; যেমন গুরুত্রে سَمِعْتُمُوهُ সন্ধান পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এই সংক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করত সন্ধানপদের পরিবর্তে ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ বলেছে। এতে হালকা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের সীমায় মু'মিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে—এটাই ছিল ইমানের দাবি।

এখানে তৃতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য “فَإِنَّكَ مُبِينٌ” এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনা মাত্রই মুসলমানদের ‘এটা প্রকাশ্য মিথ্যা’ বলে দেয়াই ছিল ইমানের দাবি। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান সম্পর্কে কোন গুনাহ অথবা দোষ শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা না জানা পর্যন্ত তার প্রতি সুধারণা রাখা এবং প্রমাণ ছাড়াই তাকে গুনাহ ও দোষে অভিযুক্ত করাকে মিথ্যা মনে করা সাক্ষাৎ ইমানের পরিচয়।

মাসআলা : এতে প্রমাণিত হলো যে, প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি সুধারণা রাখা ওয়াজিব। তবে শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বিপরীত প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি কেউ শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া মুসলমানকে অভিযুক্ত করে, তার কথা প্রত্যাখ্যান করা ও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। কারণ, এটা নিছক গীবত (পরনিন্দা) এবং অহেতুক মুসলমানকে হেয় করা। —(মাযহারী)

—لَوْلَا جَاءُوا عَلَيَّ بِرَبِيعَةِ شَهَدَاءَ فَإِنَّمَا يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ—এই আয়াতের প্রথম বাক্যে শিক্ষা আছে যে, এরূপ খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল তাদের কাছে প্রমাণ দাবি করা। ব্যাভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চারজন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবি করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এক ব্যক্তি স্বচক্ষে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করল এবং সে অন্য সাক্ষী পেল না, এটা অসম্ভব ও অবাস্তব নয়। এখন যদি এই ব্যক্তি নিজের চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে, তবে তাকে মিথ্যাবাদী কিরূপে বলা যায়, বিশেষত আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী বলা তো কোনরূপেই বুঝে আসে না। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা সব ঘটনার স্বরূপ জানেন এবং এই ঘটনাও তিনি জানেন। এমতাবস্থায় সে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে কিরূপে? এই প্রশ্নের দুই জওয়াব আছে। প্রথম, এখানে ‘আল্লাহর কাছে’ বলার অর্থ আল্লাহর বিধান ও আইন। অর্থাৎ এ ব্যক্তি আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে এবং তাকে অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ, আল্লাহর বিধান ছিল এই যে, চারজন সাক্ষী না হলে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তা বর্ণনা না করা। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ব্যতিরেকেই বর্ণনা করে, সে আইনত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, অনর্থক কোন কাজ না করা মুসলমানের কর্তব্য; বিশেষত এমন কাজ, যার ফলে অন্য মুসলমানের প্রতি অভিযোগ আরোপিত হয়। অতএব এক মুসলমান অন্য মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন দোষ অথবা গুনাহের সাক্ষ্য গুনাহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যেই দিতে পারে। কাউকে হেয় করা অথবা কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য দিতে পারে না। যে ব্যক্তি চারজন সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের দাবি করে; সে যেন দাবি করে যে, আমি মানব জাতির সংশোধন, সমাজকে কলুষমুক্তকরণ এবং অপরাধ দমনের উদ্দেশ্যে এ দাবি করছি। কিন্তু সে যখন শরীয়তের আইন জানে যে, চারজন সাক্ষী ছাড়া এরূপ দাবি করলে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাজা পাবে না এবং অপরাধও প্রমাণিত হবে না ; বরং উল্টা মিথ্যা বলার শাস্তি ভোগ করছে হবে। তখন সে আত্মাহূর কাছে উপরোক্ত সদুদ্দেশ্যের দাবিতে বিশ্বাসবাদী। কেননা শরীয়তের দ্বারা মোতাবিক দাবি না হওয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কর্ম সদুদ্দেশ্য হতেই পারে না। —(মাক্কাহী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ হুসিয়াদী : উপরোক্ত উভয় আয়াতে প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে নির্দেশ দান করা হয়েছে এবং এর বিপরীত প্রমাণহীন কথাবার্তা নাকচ করে দেয়াকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বেই সংবাদটিকে জ্ঞাত বলে বিশ্বাস করলেন না কেন এবং এর খবর করলেন না কেন ? তিনি এক মাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেন রইলেন ? এমনকি, তিনি হযরত আরেশাকে একথাও বলেছেন যে, দেখ, যদি তোমা দ্বারা কোন জুল হয়ে থাকে, তবে তওবা করে নাও।

কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা সুধারণার আদেশের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি খবরটির সত্যায়নও করেননি এবং তদনুযায়ী কোন কর্মও করেন নি। তিনি এর চর্চা করাও পছন্দ করেননি। সাহাবায়ে-কিরামের সমাবেশে তিনি এ কথাই বলেছেন যে: مَا عَلِمْتُ عَلَى الْآخِرَةِ أَرْبَابٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَبِأَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَكْفُرُونَ (আমি জানি না। —(তাহাজী) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কর্মপন্থা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আমল এবং সুধারণা পোষণ করার সাক্ষ্য বহন করে। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও দূর হয়ে যায়, এরূপ অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান আঘাত অবতরণের পরে অর্জিত হয়েছে।

ষোটকথা এই যে, অন্তরে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়া এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) করেছেন, মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার পরিপন্থী ছিল না। তিনি তো খবর অনুযায়ী কোন কর্মও করেননি। যেমন মুসলমানদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং উভয় আয়াতে যাদেরকে ভৎসনা করা হয়েছে তারা খবর অনুযায়ী কর্ম করেছিল। তারা এর চর্চা করেছিল এবং ছড়িয়েছিল। তাদের এ কাজ, আয়াত অবতরণের পূর্বেও অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ। যেসব মুসলমান জুলুমের এই অপবাদে কোন না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল, এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণ দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত ; যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হতো। কিন্তু মু'মিনদের সাথে আল্লাহ তা'আলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক দিয়েছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংসর্গ দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত

ওনাহর জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আরাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফিরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

إِذْ تَقُولُ بِالنَّاسِ عَلَى — অর্থঃ শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তা সত্যাসত্য, যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বুঝানো হয়েছে।

وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَمَوْعِدَهُ عَظِيمٌ — অর্থঃ তোমরা একে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা তুলে তাই অন্যের কাছে মহাপাপ ছিল। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলে, যদ্বারা অন্য মুসলমান দারুণ মর্মান্বিত হয়, লাজিত হয় এবং জার জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنِمْنَا أِنْ تَكْفُرْ أَتَكْتُمُ بِهَذَا سُبْحَانَكَ مَآ يَهْتَنَانُ عَظِيمٌ — অর্থঃ তোমরা যখন এই শুভব শুনেছিলে, তখন এ কথা কেন বলে দিলে না যে, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। আরাহ পবিত্র। এ তো গুরুতর অপবাদ। এই আয়াতে পুনরায় সেই আদেশই ব্যক্ত হয়েছে, যা পূর্বকার এক আয়াতে ব্যক্ত হয়েছিল। এতে আরাহ প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ ধরনের সংবাদ শুনে মুসলমানদের কি করা উচিত। অর্থঃ তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের জন্যে বৈধ নয়। এটা গুরুতর অপরাধ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, কোন ঘটনার সত্যতা যেমন প্রমাণ ছাড়া জানা যায় না, কলে তার চর্চা করা ও মুখে উচ্চারণ করা অবৈধ হয়েছে, তেমনি কোন কথার অসত্যতাও তো প্রমাণ ছাড়া বুঝা যায় না। কাজেই এরূপ কথাকে গুরুতর অপবাদ কিরূপে বলা যেতে পারে? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মুসলমানকে ওনাহ থেকে পাক-পবিত্র মনে করা শরীয়তের মূলনীতি। এই মূলনীতির বিরুদ্ধে বিমোদনীলে যে কথা বলা হবে, তাকে মিথ্যা মনে করার জন্যে অন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। এতটুকুই যথেষ্ট যে, একজন মু'মিন-মুসলমানের প্রতি শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। কাজেই এটা মিথ্যা আপবাদ।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي النَّارِ وَالْآخِرَةِ — যারা এই অপবাদে কোন-না কোনরূপে অংশগ্রহণ করেছিল, এই আয়াতে পুনরায় তাদের নিন্দা এবং ইহকাল ও পরকালের শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যারা এরূপ খবর রটনা করে, তারা যেন মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার প্রসারই কামনা করে।

নির্লজ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা ও একটি জরুরী উপায়, যার উপেক্ষা কলে আজ নির্লজ্জতার প্রসার ঘটেছে : কোরআন পাক নির্লজ্জতা দমনের জন্যে এই বিশেষ কর্মসূচী তৈরি করেছে যে, প্রথমত এ ধরনের সংবাদ কোথাও রচিত হতে পারবে না। রচিত হলেও শরীয়তসম্মত প্রমাণ সহকারে রচিত হতে হবে, যাতে রটনার সাথে সাথে সাধারণ সমাবেশে ব্যভিচারের হদ প্রারোপ করে রটনাকেই ক্রমবর্ধমান উপায় করে দেয়া

যায়। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত প্রমাণ নেই, সেখানে এ ধরনের নির্লজ্জতার শাস্তিবিহীন সংবাদ চালু করা ও ব্যাপক প্রচার করা সাধারণ ভাবে মানুষের মন থেকে নির্লজ্জতার ও ব্যাভিচারের প্রতি ঘৃণা হ্রাস করে দিতে এবং অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। আজকাল পত্র-পত্রিকায় প্রত্যহ দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের সংবাদ প্রত্যহ প্রত্যেক পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রচার করা হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা সেগুলো পাঠ করে। এর অনিবার্য ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় এই যে, আস্তে আস্তে এই দুর্কর্ম তাদের কাছে হালকা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং উদ্বেজনা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক এ ধরনের সংবাদ প্রদানের অনুমতি তখনই দেয়, যখন এর সাথে শরীয়তসম্মত প্রমাণ থাকে। ফলে এর সাথে সাথে এই নির্লজ্জতার ভয়াবহ শাস্তিও দর্শক ও শ্রোতাদের সামনে এসে যাবে। প্রমাণ ও শাস্তি ছাড়া এ ধরনের সংবাদ প্রচারকে কোরআন মুসলমানদের মধ্যে নির্লজ্জতা ছড়ানোর উপায়রূপে আখ্যা দিয়েছে। আফসোস, মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করত। এই আয়াতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নির্লজ্জতার সংবাদ প্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। পরলোকের শাস্তি তো কিয়ামতের পরেই হবে, যা এখানে প্রত্যক্ষ করা যাবে না; কিন্তু ইহলোকের শাস্তি তো প্রত্যক্ষভাবে আসা উচিত। যাদের প্রতি অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, তাদের ইহলোকের শাস্তি তো হয়েই গেছে। যদি কোন ব্যক্তি শর্তাবলীর অনুপস্থিতির কারণে অপবাদের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, তবে দুনিয়াতেও সে কিছু না কিছু শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আয়াতের সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

وَلَا يَأْتِلُ الْفُضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - وَلْيَغْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا
تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

সাহাবায়ে-কিরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে : وَلَا يَأْتِلُ... শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ ও হাসসান জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তারা খাটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। তিনি তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হলো, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলা বাহুল্য, কোন

বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারও আর্থিক সাহায্য করার পর যদি তা বন্ধ করে দেয়, তবে শুনাহর কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিদ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক দুঃখের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিল, তাদেরকে আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে তার কাকফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চ মর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবু বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব ছিল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কথাটি এভাবে বলেছেন : যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্ তা'আলা ধর্মীয় উৎকর্ষ দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আর্থিক সম্মতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়া উচিত নয়। আয়াতে **أُولَئِكَ الْفَضْلُ وَالسَّعْيُ** -এ অর্থেই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হইয়েছে : **أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ** : অর্থাৎ তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শুনাহ্ মাফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন : **وَاللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي** : অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন। আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন : এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না। —(বুখারী, মুসলিম)

এহেন উচ্চত্বের চরিত্রগুণ দ্বারাই সাহাবায়ে কিরাম লালিত হন। বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **ليس الواصل بالمكا في ولكن لواصل** : অর্থাৎ যারা আত্মীয়দের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়, তারাই আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয় ; বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক আদায়কারী সেই ব্যক্তি যে আত্মীয়গণ কর্তৃক সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখে।

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخَضَّنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي النَّبَاِ وَالْآخِرَةِ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ এই আয়াতে বাহ্যত : ইতিপূর্বে অপবাদে আয়াতে বর্ণিত সেই বিষয়বস্তু পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ **وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخَضَّنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلَدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** : **إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, শেষোক্ত আয়াতের শেষে তওবাকারীদের ব্যতিক্রম এবং তাদের জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরূপ নেই ; বরং ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহকালের ও পরকালের অভিলাপ

এবং গুরুতর শাস্তি উল্লিখিত আছে। এতে বুঝা যায় যে, এই আয়াত তাদের সাথে সম্পর্কশীল, যারা হযরত আয়েশার চরিত্রে অপবাদ আরোপ করার পর তওবা করেনি। এমনকি কোরআনে তাঁর দোষমুক্ততা নাযিল হওয়ার পরও তারা এই দূরভিসন্ধিতে অটল ও অপবাদ চর্চায় মশগুল থাকে। বলা বাহুল্য, এ কাজ কোন মুসলমান দ্বারা সম্ভবপর নয়। কোন মুসলমানও কোরআনের এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। তাই এই বিষয়বস্তু মুনাফিকদের সম্পর্কে, যারা দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও এই অপবাদবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা যে কাফির মুনাফিক, এ ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ নেই। তওবাকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা **فَخَلَّ اللَّهُ عَنْهُمْ دِيَارَهُمْ** বলে উভয় জাহানে রহমতপ্রাপ্ত আখ্যায়িত করেছেন। যারা তওবা করেনি, তাদেরকে এই আয়াতে উভয় জাহানে অভিশপ্ত বলেছেন। তওবাকারীদেরকে আযাব থেকে মুক্তির সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করেনি, তাদের জন্য গুরুতর আযাবের হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তওবাকারীদেরকে **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** বলে মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যারা তওবা করে নি তাদেরকে পরবর্তী **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ** আয়াতে ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার এবং শাস্তিপ্ৰাপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। —(বয়ানুল-কোরআন)

একটি জরুরী হুঁশিয়ারী : হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদের ব্যাপারে কতক মুসলমানও অংশগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু এটা তখনকার ব্যাপার ছিল, যখন কোরআনে দোষমুক্ততার আয়াত নাযিল হয়নি। আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহে কাফির, কোরআনে অবিশ্বাসী। যেমন শিয়াদের কোন কোন দল ও ব্যক্তিকে এতে লিপ্ত দেখা যায়। তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহেরও অবকাশ নেই। তারা সর্বসম্মতিক্রমে কাফির।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ যেদিন তাদের বিবৃদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা, হস্ত ও পদ কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন যে গুনাহ্‌গার তার গুনাহ্‌ স্বীকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গুনাহ্‌ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি, পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামায় লিখে দিয়েছে, তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। **الْيَوْمَ نَخْتِمُ** আয়াতে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে। যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে। বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় ও

জিস্হাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর জিস্হাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

অর্থাৎ দূশরিত্রা নারীকুল দূশরিত্রা পুরুষকুলের জন্য এবং দূশরিত্রা পুরুষকুল দূশরিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। সন্ধ্যারিত্রা নারীকুল সন্ধ্যারিত্রা পুরুষকুলের জন্য এবং সন্ধ্যারিত্রা পুরুষকুল সন্ধ্যারিত্রা নারীকুলের জন্য উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমত সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দূশরিত্রা ও ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষদের প্রতি এবং দূশরিত্রা ও ব্যভিচারী পুরুষ দূশরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সন্ধ্যারিত্রা নারীদের আগ্রহ সন্ধ্যারিত্রা পুরুষদের প্রতি এবং সন্ধ্যারিত্রা পুরুষদের আগ্রহ সন্ধ্যারিত্রা নারীদের প্রতি হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী বোঝ করে দেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরগপই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা পত্নী ও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রাসূলে করীম (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত ভাষ্যকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি যার ইমান নেই, সেই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লুত (আ)-এর বিবিগণ কাফির ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফির হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : مَا بَغَتْ امْرَأَةٌ نَبِيًّا ۖ অর্থাৎ কোন পয়গম্বরের বিবি কোনদিন ব্যভিচার করেনি।—(দুররে মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফির হবে—এটা তো সম্ভবপর ; কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে—এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর স্বাভাবিকভাবে ঘৃণার কারণে হয় না।—(বয়ানুল কোরআন)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا

عَلَىٰ أَهْلِهَا مَذِّبٌ لَّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٩﴾ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٣١﴾

(২৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে, এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পঞ্চম বিধান অনুমতি গ্রহণ এবং দেখা-সাক্ষাতের শিষ্টাচার কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা : সূরা নূরের শুরু থেকেই অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা দমন করার জন্য এতদসম্পর্কিত অপরাধসমূহের শাস্তির বর্ণনা এবং বিনা প্রমাণে কারও প্রতি অপবাদ আরোপের নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এসব অশ্লীলতা দমন এবং সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য এমন বিধানাবলী দেওয়া হয়েছে, যাতে নির্লজ্জতা সুগম হবে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী এসবের অন্যতম। অর্থাৎ কারও গৃহে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা এবং উঁকি দিয়ে দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাহরাম নয় এমন নারীদের উপর দৃষ্টি না পড়া এর অন্যতম রহস্য। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিভিন্ন প্রকার গৃহের বিভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।

গৃহ চার প্রকার : ১. নিজস্ব বাসগৃহ, যাতে অন্য কারও আসার সন্ধান নেই ; ২. যে গৃহে অন্য লোকও থাকে, যদিও সে মাহরাম হয় অথবা যাতে অন্যের আসার সন্ধান আছে ; ৩. যে গৃহে কারও কার্যত থাকা অথবা না থাকা উভয়েরই সন্ধান আছে ; ৪. যে গৃহ কোন বিশেষ ব্যক্তির বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট নয় ; যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি সাধারণের আসা-যাওয়ার স্থান। প্রথম প্রকার গৃহের বিধান তো সুপরিজ্ঞাত যে, এতে প্রবেশের জন্য কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাই আয়াতে পরিষ্কারভাবে এই বিধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্ট তিন প্রকার গৃহের বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে

বর্ণিত হচ্ছে : হে মু'মিনগণ, তোমরা নিজের (বিশেষ বসবাসের) গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে (যাতে অন্য লোক বসবাস করে, সেসব গৃহ তাদের মালিকানাধীন হোক কিংবা বসবাসের জন্য ধার করা হোক কিংবা ভাড়া করা হোক) প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি লাভ না কর এবং (অনুমতি লাভ করার পূর্বে) গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। (অর্থাৎ প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করে জিজ্ঞেস কর যে, ভেতরে প্রবেশের অনুমতি আছে কি ? বিনানুমতিতে এমনিতেই ঢুকে পড়ো না। যদিও কতক লোক অনুমতি নেয়াকে মর্যাদাহানিকর মনে করে ; কিন্তু বাস্তবে) এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। (বিষয়টি তোমাদের এ জন্য বলা হলো,) যাতে তোমরা স্মরণ রাখ (এবং তদনুযায়ী আমল কর। এতে অনেক রহস্য আছে। এ হলো দ্বিতীয় প্রকার গৃহের বিধান)। যদি গৃহে কোন মানুষ নেই বলে মনে হয় (বাস্তবে থাকুক বা না থাকুক), তবে সেখানে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত অনুমতি না দেয়া হয়। (কেননা, প্রথমত সেখানে কেউ থাকার সম্ভাবনা আছে ; যদিও ভূমি জান না। বাস্তবে কেউ না থাকলেও অপরের খালি গৃহে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়া তার মালিকানায় অবৈধ হস্তক্ষেপের শামিল, যা জায়েয নয়। এ হলো তৃতীয় প্রকার গৃহের বিধান।) যদি (অনুমতি চাওয়ার সময়) তোমাদেরকে বলা হয় (এখন) ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে আস। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, (সেখানে এই মনে করে অটল হয়ে থাকা যে, একবার তো বাইরে আসবে ; তা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, এতে নিজের অবমাননা এবং অপরকে অহেতুক চাপ প্রয়োগ করে কষ্ট দেওয়া হয়। কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সব কাজ কর্মের খবর রাখেন। (বিরুদ্ধাচরণ করলে শাস্তি পাবে। এ বিধান তখনও যখন গৃহের লোকেরা ফিরে যেতে বলে না ; কিন্তু হ্যাঁ, না-ও কিছুই বলে না। এমনতাবস্থায় হয়তো শোনেনি এই সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে তিনবার অনুমতি চাওয়া যেতে পারে। এরপরও কোন জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে আসা উচিত ; যেমন হাদীসে স্পষ্টত একথা বলা হয়েছে) এমন গৃহে (বিশেষ অনুমতি ব্যতীত) প্রবেশ করাও গুনাহ হবে না যাতে (বাসগৃহ হিসেবে) কেউ বাস করে না, এবং যাতে তোমাদের উপকার আছে। (অর্থাৎ এসব গৃহ ভোগ করার ও ব্যবহার করার অধিকার তোমাদের আছে। এ হলো চতুর্থ প্রকার গৃহের বিধান, যা জনহিতকর কাজের জন্য নির্মিত হয়। ফলে সেখানে প্রত্যেকেরই প্রবেশাধিকার থাকে)। তোমরা যা প্রকাশ্যে কর অথবা গোপনে কর, আল্লাহ তা'আলা তার সব জানেন। (কাজেই সর্ববিস্তারিত তাকওয়া ও আল্লাহুভীতি অপরিহার্য।)

আনুশঙ্গিক স্ফুটব্য বিষয়

কোরআনী সামাজিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রথমে তার অনুমতি নাও, অনুমতি ছাড়া কারও গৃহে প্রবেশ করো না : পরিতাপের বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখাপড়া জানা সৎ লোকেরাও একে গুনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়ন করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে ;

কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানেই অলসতা শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও ইয়রত ইবনে আব্বাস (রা) কোরআনের আদ্যাত্ত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইন্না লিয়ার্হ।

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আয়াহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তার গৃহই তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কোরআন পাক অবুলা নিয়ামতরাজির উল্লেখ এসঙ্গে এ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে : جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا অর্থাৎ আয়াহ্ তা'আলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেওয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেওয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও কষ্ট দান করা থেকে আত্মরক্ষা করা, যা প্রত্যেকটি সম্মানিত মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও। দ্বিতীয় উপকারিতা বয়ঃ সাক্ষাৎ প্রার্থী। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনোচিতভাবে সাক্ষাৎ করবে, তখন প্রতিপক্ষও তার যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে ভদ্রজনোচিত পন্থায় কোন ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে অকস্মাৎ বিপদ মনে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা থাকলেও তা নিষেধ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাপে পানী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এ দিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোরআন পাক ব্যক্তিচার, অপবাদ ইত্যাদির শান্তির বিধি-বিধানে সংলগ্ন বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারও গোপন কথা অবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও ওনাহ্ এবং অপরের জন্য কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাস'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ মাস'আলা পরে বর্ণিত হবে।

মাস'আলা : আয়াতে الَّذِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيْتٌ বলে সন্ধান করা হয়েছে, যা পুরুষের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত; যেমন কোরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সন্ধান করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ

মাসআলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কিরামের দ্বীনের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারও গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রা) বলেন : আমরা চারজন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম। —(ইবনে কাসীর)

মাসআলা : এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে নারী, পুরুষ মাহরাম ও গায়র-মাহরাম সবাই शामिल রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহরাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যিক। ইমাম মালেক মুয়াত্তা এহুে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : আমি কি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব ? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন : তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন : তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর ? সে বলল : না। তিনি বললেন : তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যিক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশ্যযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে। —(মায়হারী)

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে—পিতামাতা, ভাইবোন প্রমুখ থাকে না।

মাসআলা : যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে, তাতে প্রবেশ করার জন্য যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়। বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা কেড়ে হুঁশিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুঁশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। —(ইবনে কাসীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলেন : নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী ? তিনি বললেন : না। ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েত করে বলেন : এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু মোস্তাহাবও উত্তম এ ক্ষেত্রেও।

অনুমতি গ্রহণের সূরাত তরীকা : আয়াতে **حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا** বলা হয়েছে ; অর্থাৎ দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত কারও গৃহে প্রবেশ করো না। প্রথম **استئناس** শাব্দিক অর্থ প্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে **استئناس** শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি

লাভ করা দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিতি ও আপন হয়—সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ এরূপ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরতুবী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্রপচাৎ নেই। তিনি আবু আইউব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারদি বলেন, যদি অনুমতি নেওয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে চায়।

ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, কাকে অনুমতি দিও না। কারণ সে সুন্নাত তরীকা ত্যাগ করেছে। —(রুহুল মা'আনী) আবু দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে বাইরে থেকে বলল : **السلام** আমি কি ঢুকে পড়ব ? তিনি খাদেমকে বললেন : লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলল : **السلام عليكم الدخول** অর্থাৎ সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি ? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শুনে **السلام عليكم الدخول** বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। —(ইবনে কাসীর) বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন : **لا تأنزلوا لمن لا يبدأ بالسلام** অর্থাৎ যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। —(মায়হারী) এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সা) দু'টি সংশোধন করেছেন—প্রথমে সালাম করা উচিত এবং **الدخول** এর স্থলে **السلام** শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, **الدخول** শব্দটি **وَلَوْ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। মার্জিত ভাষার পরিপন্থী। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্য বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এ দিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাসআলা : উপরের হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত উমর ফারুক (রা) তাই করতেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দ্বারে এসে বললেন, **السلام على رسول الله السلام عليكم ايدخل عمر** অর্থাৎ সালামের পর বললেন, উমর প্রবেশ করতে পারে কি ? —(ইবনে কাসীর) সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত আবু মুসা হযরত উমরের কাছে গেলেন এবং অনুমতি চাওয়ার জন্য বললেন, **السلام عليكم هذا** **ابو موسى السلام عليكم هذا الاشعري** এতেও তিনি প্রথমে নিজের নাম আবু মুসা বলেছেন,

এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্দেশে জওয়াব দেয়া যায় না।

মাসআলা : এ ব্যাপারে কোন কোন লোকের পছন্দ মন্দ। তারা বাইরে থেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চায় ; কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ করে না। ভেতর থেকে গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করে, কে ? উত্তরে বলা হয়, আমি। বলা বাহুল্য, এটা জিজ্ঞাসার জওয়াব নয়। যে প্রথম শব্দে চেনেনি, সে 'আমি' শব্দ দ্বারা কিরূপে চিনবে ?

খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আলী ইবনে আসেম বসরার হযরত মুগীরা ইবনে শো'বার সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। দরজার কড়া নাড়লেন। হযরত মুগীরা ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে ? উত্তর হলো, আনা অর্থাৎ আমি। হযরত মুগীরা বললেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে তো কারও নাম 'আনা' নেই। এরপর তিনি বাইরে এসে তাকে হাদীস তলালেন যে, একদিন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতির জন্য দরজায় কড়া নাড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ভেতর থেকে প্রশ্ন করলেন, কে, উত্তরে জাবের 'আনা' বলে দিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে শাসিরে বললেন : 'আনা' 'আনা' অর্থাৎ 'আনা' 'আনা' বললে কাউকে চেনা যায় নাকি ?

মাসআলা : এর চাইতেও আরও মন্দ পছন্দ আজকাল অনেক লেখাপড়া জানা লোকেরাও অবলম্বন করে থাকে। দরজায় কড়া নাড়ার পর যখন ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করা হয়, কে ? তখন তারা নিচুপ দাঁড়িয়ে থাকে—কোন জওয়াবই দেয় না। এটা প্রতিপক্ষকে উত্তপ্ত করার নিকটতম পছন্দ। এতে অনুমতি চাওয়ার উদ্দেশ্যই পণ হয়ে যায়।

মাসআলা : উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, দরজার কড়া নেড়ে নিজের নাম প্রকাশ করে বলে দেওয়া যে, অযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামনা করে—অনুমতি চাওয়ার এ পছন্দ জায়েয।

মাসআলা : কিন্তু এত জোরে কড়া নাড়া উচিত নয়, যাতে প্রোভা চমকে ওঠে, কং মাঝারি ধরনের আওয়াজ দেবে, যাতে যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছে যায় এবং কোনরূপ কর্কশতা প্রকাশ না পায়। যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরজায় কড়া নাড়তেন তারা নখ দিয়ে দরজার কড়া নাড়তেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কষ্ট না হয়।—(কুরতুবী) অনুমতি চাওয়ার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিপক্ষকে আপন করে অনুমতি লাভ করা। যারা এই উদ্দেশ্য বুঝে তারা আপনা-আপনি সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরী মনে করবে। প্রতিপক্ষ কষ্ট পায়, এমন বিষয়াদি থেকে তারা বেঁচে থাকবে।

জরুরী হুশিয়ারী : আজকাল অধিকাংশ লোক অনুমতি চাওয়ার প্রতি ক্রক্ষেপই করে না, যা প্রকাশ্য ওয়াজিব তরক করার গুনাহ। যারা সুন্নাহ তরীকায় অনুমতি নিতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান যুগে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। সাধারণত যার কাছ থেকে অনুমতি নিতে চায়, সে দরজা থেকে দূরে থাকে। সেখানে সালামের আওয়াজ ও অনুমতি চাওয়ার কথা পৌঁছা মুশকিল হয়। তাই বুদ্ধি নেওয়া উচিত যে, অনুমতি ব্যক্তিদেরকে গৃহে প্রবেশ না করাই আসল ওয়াজিব। অনুমতি লাভ করার পছন্দ প্রতি যুগে ও প্রতি দেশে বিভিন্নরূপ হতে পারে। দরজায় কড়া নাড়ার এক পছন্দ তো হাদীস থেকেই জানা গেল। এমনভাবে মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৪৯

যারা দরজায় ঘন্টা লাগায়, তাদের এই ঘন্টা বাজিয়ে দেওয়াও অনুমতি চাওয়ার জন্য যথেষ্ট শর্ত এই যে, ঘন্টা বাজানোর পর নিজের নামও এমন জোরে প্রকাশ করবে, যা প্রতিপক্ষের কানে পৌঁছে। এছাড়া অন্য কোন পছা কোন স্থানে প্রচলিত থাকলে তা অবলম্বন করাও জায়েয। আজকাল ইউরোপ থেকে পরিচয়পত্রের প্রথা চালু হয়েছে। এই প্রথা যদিও ইউরোপীয়রা চালু করেছে; কিন্তু অনুমতি চাওয়ার লক্ষ্য এতে সুন্দরভাবে অর্জিত হয়। অনুমতিদাতা অনুমতিপ্রার্থীর সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা জায়গায় বসে অনায়াসে জেনে নিতে পারে। তাই এই পছা অবলম্বন করাও দোষের কথা নয়।

মাসআলা : যদি কেউ কারও কাছে অনুমতি চায় এবং উত্তরে বলা হয়, এখন সাক্ষাৎ হতে পারবে না-ফিরে যান, তবে একে খারাপ মনে না করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সে বাইরে না আসতে বাধ্য হয় এবং আপনাকেও ভেতরে ডেকে নিতে পারে না। এমনতাবস্থায় তার ওয়র মেনে নেওয়া উচিত। উল্লিখিত আয়াতেরও নির্দেশ তাই। বলা হয়েছে : **وَابْتَئِزْ لَكُمْ اَرْجِعُوا فَارْجِعُوا** **مَوْ** অর্থাৎ যখন আপনাকে আপাতত ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হুটটিতে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পরবর্তীকালের অনেক ব্যুর্গ বলেন : আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারও কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কোরআনের এই আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নিয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে ছুটল না।

মাসআলা : ইসলামী শরীয়ত সুন্দর সামাজিকতা শিক্ষা দিয়েছে এবং সবাইকে কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য বিমুখী সুখম ব্যবস্থা কায়ম করেছে। এই আয়াতে যেমন আগন্তুককে অনুমতি না দিলে এবং ফিরে যেতে বললে হুটটিতে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে এক স্বাদীসে এর অপর ঠিঠা একভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, **ان لَزَوْكَ عَلَيْكَ حَقًّا** অর্থাৎ সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিরও আপনার উপর হক আছে। তাকে কাছে ডাকুন; বাইরে তার সাথে মোলাকাত করুন; তার সম্মান করুন, কথা শুনুন এবং গুরুতর অসুবিধা ও ওয়র ছাড়া সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করবেন না। এটাই তার হক।

মাসআলা : কারও দরজায় অনুমতি চাইলে যদি ভেতর থেকে জওয়াব না আসে, তবে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার অনুমতি চাওয়া সুন্নাত। যদি তৃতীয়বারও জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসারই নির্দেশ আছে। কারণ তৃতীয়বার বলতে এটা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, আওয়াজ শুনেনি; কিন্তু নামাযরত থাকা অথবা গোসলরত থাকা অথবা পায়খানায় থাকার কারণে সে জওয়াব দিতে পারছে না। কিংবা এক্ষণে তার সাক্ষাতের ইচ্ছা নেই। উভয় অবস্থায় সেখানে অটল হয়ে থাকা এবং অবিরাম কড়া নাড়াও কষ্টের কারণ, যা থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। অনুমতি চাওয়ার আসল লক্ষ্যই কষ্ট দান থেকে বেঁচে থাকা।

হযরত আবু মুসা আশআরী বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে করীম (সা) বললেন : **اِذَا اسْتَأْذَنْتُمْ لِحَدِّكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ فَلْيَرْجِعْ** অর্থাৎ তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও

যদি জওয়াব না আসে, তবে ফিরে আসা উচিত। —(ইবনে কাসীর) মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার গৃহে গমন করলেন এবং বাইরে থেকে অনুমতি চাওয়ার জন্য সালাম করলেন। হযরত সা'দ সালামের জওয়াব দিলেন ; কিন্তু খুবই আন্তে, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) না শোনেন। তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার সালাম করলেন। হযরত সা'দ প্রত্যেকবার শুনেতেন এবং আন্তে জওয়াব দিতেন। তিনবার এরূপ করার পর তিনি ফিরে আসলেন। সা'দ যখন দেখলেন যে, আওয়াজ আসছে না, তখন গৃহ থেকে বের হয়ে পিছনে দৌড় দিলেন এবং ওয়র পেশ করে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রত্যেকবার আপনার আওয়াজ শুনেছি এবং জওয়াবও দিয়েছি, কিন্তু আন্তে দিয়েছি। যাতে আপনার পবিত্র মুখ থেকে আমার সম্পর্কে আরও বেশি সালামের শব্দ উচ্চারিত হয়। এটা আমার জন্যে বরকতময়। অতঃপর তিনি তাকে সুন্নত বলে দিলেন যে, তিনবার জওয়াব পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়া উচিত। এরপর হযরত সা'দ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গৃহে নিয়ে যান এবং কিছু খাবার পেশ করেন। তিনি তা কবুল করেন।

হযরত সা'দের এই কার্য ছিল অধিক ইশক ও মহব্বতের প্রতিক্রিয়া। তখন তিনি এদিকে চিন্তাও করেননি যে, দু'জাহানের সরদার হযর পাক (সা) দরজায় উপস্থিত আছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর পদচুম্বন করা উচিত। বরং তাঁর চিন্তাধারা এদিকে নিবন্ধ ছিল যে, রাসূলে পাক (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে আমার উদ্দেশ্যে যত বেশি 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দ উচ্চারিত হবে, আমার জন্য তা ততবেশি কল্যাণকর হবে। স্নোটকথা, এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর জওয়াব না আসলে ফিরে যাওয়া সুন্নাত। সেখানেই অটল হয়ে বসে যাওয়া সুন্নাত বিরোধী এবং প্রতিপক্ষের জন্য কষ্টদায়ক।

মাসআলা : এই বিধান তখনকার জন্য, যখন সালাম, কড়া নাড়া ইত্যাদির মাধ্যমে অনুমতি লাভ করার জন্য তিন বার চেষ্টা করা হয়। তখন সেখানে অনড় হয়ে বসে যাওয়া কষ্টদায়ক। কিন্তু যদি কোন আলিম অথবা বুয়ূর্গের দরজায় অনুমতি চাওয়া ব্যতীত ও খবর দেওয়া ব্যতীত এই অপেক্ষায় বসে থাকে যে, অবসর সময়ে বাইরে আগমন করলে সাক্ষাৎ করবে, তবে তা উপরোক্ত বিধানের মধ্যে দাখিল নয় ; এবং এটাই আদব ও শিষ্টাচার। স্বয়ং কোরআন নির্দেশ দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন গৃহাভ্যন্তরে থাকেন, তখন তাকে আওয়াজ দিয়ে আহবান করা আদবের খেলাপ ; বরং এমতাবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত। যখন তিনি প্রয়োজন যুতাবিক বাইরে আগমন করেন, তখন সাক্ষাৎ করা উচিত। আয়াত এই : **وَأَنَّهُمْ مَّبْرُؤُونَ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ** (রা) বলেন : মাঝে মাঝে আমি কোন আনসারী সাহাবীর দরজায় পূর্ণ বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করি, যাতে তিনি বাইরে আগমন করলে তাঁর কাছে কোন হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি। আমি যদি তাঁর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইতাম, তবে অবশ্যই তিনি আমাকে অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি একে আদবের খেলাফ মনে করি। তাই অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে নেই। —(বুখারী)

مَنْعَ — نَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أَنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَمِنْ مَسْكُوَةٍ فِيهَا مَنْعَ لَكُمْ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তদ্বারা উপকৃত হওয়া। যা দ্বারা উপকৃত

হওয়া যায়, তাকেও **عُتِّعَ** বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অনুবাদ করা হয়েছে ভোগ অর্থাৎ ভোগ করার অধিকার। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লিখিত আয়াত নাযিল হয়, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আরয় করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবী লোকেরা কি করবে ? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পশ্চিমদ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়া কি উপায় ? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে ? এর পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় -(মাযহারী)। শানে নুযুলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে **يَوْمَئِذٍ غَيْرَ مُسْكُوذٍ** বলে এমন গৃহ বুঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয় ; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানাসমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিন্তাবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

মাসআলা : জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের যে স্থানে প্রবেশের জন্য মালিক অথবা মৃত্যুওয়ায়ীদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার শর্ত ও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত আছে, সেগুলো পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। উদাহরণত রেলওয়ে স্টেশনের প্রাটফর্ম টিকিট ব্যতীত যাওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই প্রাটফর্ম-টিকিট নেওয়া জরুরী ; এর বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ। বিমান বন্দরের যে অংশে যাওয়া কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নিষিদ্ধ, সেখানে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া শরীয়তে নাজায়েয।

মাসআলা : এমনভাবে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, হাসপাতাল ইত্যাদিতে যেসব কক্ষ ব্যবস্থাপক অথবা অন্য লোকদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট ; যেমন এসব প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কক্ষ, অফিস গৃহ ও কর্মচারীদের বাসস্থান ইত্যাদিতে অনুমতি ব্যতীত যাওয়া নিষিদ্ধ ও গুনাহ।

অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরও কতিপয় মাসআলা

পূর্বেই জানা গেছে যে, অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর আসল উদ্দেশ্য অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করা এবং সুখ সমাজিকতা শিক্ষা দেওয়া। এই একই কারণের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত মাসআলাসমূহও জানা যায়।

টেলিফোন সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলা : কোন ব্যক্তিকে স্বাভাবিক নিদ্রা, অন্য কোন দরকারী কাজ অথবা নামাযে মশগুল থাকার সময় গুরুতর প্রয়োজন ব্যতীত টেলিফোনে সন্ধান করা জায়েয নয়। কেননা এতেও বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করে তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার অনুরূপ কষ্ট প্রদান করা হবে।

মাসআলা : যে ব্যক্তির সাথে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতে হয়, তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া এবং তা মেনে চলা উচিত।

টেলিফোনে দীর্ঘ কথাবার্তা বলতে হলে প্রথমে প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আপনার ফুরসত থাকলে আমি আমার কথা আরম্ভ করব। কারণ, প্রায়ই টেলিফোনের শব্দ শুনে মানুষ স্বভাবতই রিসিভার হাতে নিতে বাধ্য হয়। এ কারণে সে দরকারী কাজে মশগুল থাকলেও তা ছেড়ে টেলিফোনের কাছে আসে। কোন নির্দয় ব্যক্তি তখন লম্বা কথা বলতে শুরু করলে ভীষণ কষ্ট অনুভূত হয়।

কেউ কেউ টেলিফোনের শব্দ শুনেও কোনরূপ পরওয়া করে না এবং জিজ্ঞেস করে না যে, কে ও কি বলতে চায়? এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী এবং যে কথা বলতে চায় তার হক নষ্ট করার শামিল। হাদীসে বলা হয়েছে : **ان لزورك عليك حقا** অর্থাৎ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আগন্তুক ব্যক্তির তোমার উপর হক আছে। তার সাথে কথা বল এবং বিনা প্রয়োজনে দেখা করতে অস্বীকার করো না। এমনভাবে যে ব্যক্তি টেলিফোনে কথা বলতে চায়, তার হক এই যে, আপনি তার জওয়াব দিন।

কারও গৃহে পৌঁছে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকার সময় গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখা নিষিদ্ধ। কেননা অনুমতি চাওয়ার উপকারিতা এই যে, প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে আপনার কাছে প্রকাশ করতে চায় না, সে সম্পর্কে আপনি অবগত না হউন। প্রথমে গৃহের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা হলে এই উপকারিতা পণ্ড হয়ে যায়। হাদীসে এ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।—(বুখারী, মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সা) যখন অনুমতি লাভ করার জন্য অপেক্ষা করতেন, তখন দরজার বিপরীত দিকে না দাঁড়িয়ে ডানে কিংবা বামে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। দরজার বিপরীতে না দাঁড়ানোর কারণ ছিল এই যে, প্রথমত তখনকার যুগে দরজায় পর্দা খুব কম থাকত; থাকলেও তা খুলে যাওয়ার আশংকা থাকত।—(মায়হারী)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে যে অনুমতি ব্যতীত গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা সাধারণ অবস্থায়। যদি দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, অগ্নিকাণ্ড হয় কিংবা গৃহ ধসে পড়ে, তবে অনুমতি ব্যতিরেকেই তাতে প্রবেশ করা এবং সাহায্যের জন্য যাওয়া উচিত।—(মায়হারী)

যাকে কেউ দূত মারফত ডেকে পাঠায়, সে যদি দূতের সাথেই এসে যায়, তবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই; দূতের আগমনই অনুমতি। তবে যদি কিছুক্ষণ পরে আসে, তবে অনুমতি নেওয়া জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **اذا دعى احدكم فجاء مع الرسول فان ذلك له ان** অর্থাৎ যাকে ডেকে পাঠানো হয়, সে যদি দূতের সাথেই আগমন করে, তবে এটাই তার ভেতরে আসার অনুমতি।—(আবু দাউদ, মায়হারী)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَوْرَاجَهُمْ ذٰلِكَ اَرْكَى لِهَٰمْ
اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ۙ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
 عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
 أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى
 الرَّبِّبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

جميعاً إلى الله السميع العليم ۝

(৩০) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাস্রের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (৩১) ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বন্ধদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, স্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বান্দী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, বাবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(নারীদের পর্দা সম্পর্কিত ষষ্ঠ নির্দেশ) আপনি মুসলমান পুরুষদেরকে বলে দিন : তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয, সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামতাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামতাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাস্রের হিফাযত করে (অর্থাৎ অবৈধ পাত্রের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ না করে। ব্যভিচার ও পুংমথুন সব এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার কারণ। (এর খেলাফ করলে, হয় ব্যভিচার, না হয় ব্যভিচারের ভূমিকায় লিপ্ত হবে) নিশ্চয় আল্লাহ অবহিত আছেন যা কিছু তারা করে। (সুতরাং বিরুদ্ধাচরণকারীরা শাস্তিযোগ্য হবে) আর

(এমনিভাবে) মুসলমান নারীদেরকে বলে দিন : তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে। (অর্থাৎ যে অঙ্গের প্রতি সর্বাবস্থায় দৃষ্টিপাত করা নাজায়েয সেই অঙ্গের প্রতি যেন মোটেই দৃষ্টিপাত না করে এবং যে অঙ্গ এমনিতে দেখা জায়েয, কিন্তু কামভাব সহকারে দেখা নাজায়েয, সেই অঙ্গ যেন কামভাব সহকারে না দেখে) এবং তাদের যৌনাজঙ্গের হিফায়ত করে। (ব্যভিচার, পারম্পরিক কোলাকুলি সব এর অন্তর্ভুক্ত) এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সৌন্দর্যের স্থানসমূহ) প্রদর্শন না করে। ('সৌন্দর্য' বলে গহনা ; যেমন কংকন, চুরি, পায়ের অলংকার, বাজুবন্দ, বেড়ী, ঝুমুর, পটি, বালি ইত্যাদি এবং 'সৌন্দর্যের স্থান' বলে হাত, পায়ের গোছা, বাহু, গ্রীবা, মাথা, বক্ষ, কান বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এসব স্থান সবার কাছ থেকে গোপন রাখবে, সেই ব্যতিক্রমধর্মের প্রতি লক্ষ্য করে, যা পরে বর্ণিত হবে। এসব স্থানকে বেগানাদের কাছ থেকে গোপন রাখা ওয়াজিব এবং মাহরাম ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। পরে এ কথা বর্ণিত হবে। অতএব দেহের অন্যান্য অঙ্গ—যেমন পিঠ, পেট ইত্যাদি আবৃত রাখাও আয়াতদৃষ্টে ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, এগুলো মাহরামের সামনেও খোলা জায়েয নয়। সারকথা এই যে, নারীরা যেন তাদের আপাদমস্তক আবৃত রাখে। উপরোক্ত দু'টি ব্যতিক্রমের প্রথমটি প্রয়োজনের খাতিরে ব্যক্ত হয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে যেসব অঙ্গ খোলার প্রয়োজন হয়, সেগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর বিবরণ একরূপ : ১) কিন্তু যা (অর্থাৎ যে সৌন্দর্যের স্থান সাধারণত) খোলা (ই—) থাকে (যা আবৃত করার মধ্যে সার্বক্ষণিক অসুবিধা রয়েছে। একরূপ সৌন্দর্যের স্থান বলে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এবং বিতর্কতম উক্তি অনুযায়ী পদযুগলও বুঝানো হয়েছে। কেননা মুখমণ্ডল তো প্রকৃতিগতভাবেই সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন কোন সাজসজ্জা এতে করা হয় ; যেমন সুরমা ইত্যাদি। হাতের তালু, অঙ্গুলি মেহেন্দী ও আংটির স্থান। পদযুগল, আংটি ও মেহেন্দীর স্থান। এসব স্থান না খুলে কাজকর্ম সম্ভবপর নয় বলেই এগুলোকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হাদীসে **ما لم يخلق الله**—এর তফসীরে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালু উল্লেখ করা হয়েছে। ফিকহবিদগণ কারিগরে ভিত্তিতে অনুমান করে পদযুগলকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন) এবং (বিশেষ করে তারা যেন খুব যত্ন সহকারে মাথা ও বক্ষ আবৃত করে এবং) তাদের গুণ্ডনা (যা মাথা, আবৃত সর্বাঙ্গকে আবৃত করা হয়) বক্ষদেশে ফেলে রাখে (যদিও বক্ষদেশে জামা দ্বারা আবৃত হবে, যার ; কিন্তু প্রায়ই জামার বোতাম ফেলা থাকে এবং বক্ষের আকৃতি জামা সাবুত প্রকাশ পাবে)। তাই বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন আছে। সূরতঃপর বিবর্তিত ব্যতিক্রম বর্ণিত হচ্ছে। এতে মাহরাম পুরুষদেরকে পর্দার উল্লিখিত বিধান থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে। এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে (অর্থাৎ সৌন্দর্যের উল্লিখিত স্থানসমূহকে—কর ও কাছ) প্রকাশ না করে ; কিন্তু স্বামী, পিতা, স্বামীর পুত্র, স্বামীর পুত্র, (সহোদর, বৈশ্যসহোদর ও বৈশ্যসহোদর) ভ্রাতা, (চাচাত, মামাত ইত্যাদি স্বাক্ষর) ভ্রাতৃপুত্র, (সহোদর, বৈশ্যসহোদর ও বৈশ্যসহোদর) ভগ্নিপুত্র, (চাচাত, খালাত-বোন্দেহের পুত্র-নয়) নিজেদের (খর্চ-স্বামীক) স্ত্রীলোক (অর্থাৎ মুসলমান স্ত্রীলোক। কাকির স্ত্রীলোক, বেগানা পুরুষের স্ত্রী) স্ত্রী (কাকির স্ত্রী) ; কেননা পুরুষ স্ত্রীতদাসের বিধান ইমাম আবু হানীফার মতে বেগানা পুরুষের স্ত্রী। তার কাছেরও পর্দা ওয়াজিব), এমন পুরুষ যারা (যে পালানোর জন্য) সেবক হিসাবে থাকে

এবং ইম্রিয় সঠিক না হওয়ার কারণে) মহিলাদের প্রতি উৎসাহী নয়। [বিশেষভাবে এদের কথা বলার কারণ এই যে, তখন এ ধরনের লোকই বিদ্যমান ছিল। (দুররে-মনসুর) প্রত্যেক নির্বোধ ব্যক্তির বিধান তাই। কাজেই এই বিধানটি নির্বোধ হওয়ার উপর ভিত্তিশীল, সেবক হওয়ার উপর নয়। কিন্তু তখন যারা সেবক ছিল, তারা এমনি ছিল। তাই তা'বে' তথা সেবক উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বোধশক্তির অধিকারী, তারা বৃদ্ধ খোজা অথবা শিশুকর্তিত হলেও বেগানা পুরুষ। তাদের কাছে পর্দা ওয়াজিব।] অথবা এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে এখনও অজ্ঞ (অর্থাৎ যেসব বালক এখনও পর্যন্ত সাবালকদের নিকটবর্তী হয়নি এবং কামতাব সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপরোক্ত সবার সামনে সুখমডল, হস্তধরের ডালু ও পদযুগল ছাড়াও সাজসজ্জার উদ্ভিষিত স্থানসমূহ প্রকাশ করাও জায়েয; অর্থাৎ মাথা ও বক। স্বামীর সামনে কোন অঙ্গ আবৃত রাখা ওয়াজিব নয়। তবে বিশেষ অঙ্গকে দেখা অনুত্তম।

قالت سيدتنا ام المؤمنين عائشة ما محصلة لم ارمته ولم يرمني
ذلك الموضع اورده في المشكوة وروى بقى بن مخلد وابن عدى عن
ابن عباس مرفوعا اذا جامع احدكم زوجته او جاريتها فلا ينظر الى
فرجها فان ذلك يورث العمى قال ابن صلاح جيد الاسناد كذا في
الجامع الصغير -

এবং (পর্দার প্রতি এতটুকু যত্নবান হতে পারে যে, চলার সময়) সজোরে পদক্ষেপ করবে না, যাতে তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে (অর্থাৎ অলংকারাদির আওরাজ বেগানা পুরুষদের কানে পৌঁছে যায়)। হে মুসলমানগণ, (এসব বিধানের ক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা যে ক্রটি হয়ে গেছে, তজন্য) তোমরা সবাই আত্মাহু তা'আলার সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সকলকামি হও (নতুবা ওনাহ পূর্ণ সকলতার পরিপন্থী হয়ে যাবে)।

অনুভবিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১) পর্দা প্রথা-বিবাহের সময় ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহযাবে উল্লুহ মু'মিনীন হযরত যয়নব বিনতে আযা'বের সাথে রাসূলুহাঃ (সঃ)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর উদ্দেশ্য কারণও মতে উভয় হিজরী এবং আরো যাতে পক্ষম হিজরী। তকসীরে ইবনে কাসীর ও নারুলুল আউতর এতে পক্ষম হিজরীকে অপ্রশংসিতা দান করা হয়েছে। ইহল মা'আনীতে হযরত আনাস বিনে মালিক এখানে বলেছেন যে, পক্ষম হিজরীর বিলকম মাসে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিবাহের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আয়েতি (আয়াতসমূহ) বদী সুতালিক যুদ্ধ অথবা সুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অনবদ্য ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ বর্ষ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এই আয়েতিনা থেকে জানা যায় যে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহযাবে পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের

আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রযুক্তি হইয়াছে। তাই সূরা আহযাবেই ইনশাআল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তফসীর লিখিত হচ্ছে।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى

—لَهُمْ أَنْ اللَّهَ خَيْرٌ كَمَا يَصْنَعُونَ—

নত করা।—(রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেওয়া, যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে কাসীর ও ইবনে হাইয়ান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং নিয়ত ছাড়াই দেখা মাকরুহ—এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল(চিকিৎসা ইত্যাদি কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত)। এ ছাড়া কারও গোপন তথ্য জ্ঞানার জন্য তার গৃহে উঁকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত।

وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ—যোনাস সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার যত পছন্দ আছে, সবগুলো থেকে যোনাসকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমৈথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ—যাতে কামভাব পূর্ণ হয়, হস্তমৈথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পছন্দ্য কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কামপ্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দুটিকে স্পষ্ট ও উল্লেখ করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর (র) হযরত ওবায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, كل ما عصى الله به فهو كبييرة وقد نكر الطرفين অর্থাৎ যদ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত—সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

النظر سهم من سهام ابليس مسموم من تركها مخافتى ابدلته ايمانا يجد حلاوة في قلبه

—দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ইমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।—(ইবনে কাসীর) হযরত আলী (রা)-এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাক এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে শুনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমাহ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমাহ নয়।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫০

শাশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করারও বিধান অনুরূপ : ইবনে কাসীর লিখেছেন : পূর্ববর্তী অনেক ঘনীষী শাশ্রুবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেড়ে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং অনেক আলিমের মতে এটা হারাম। সম্ভবত এটা তখনকার ব্যাপারে যখন বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ : وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ — এই দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু জোর দেওয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলিমের মতে নারীদের জন্য মাহরাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম ; কামভাবসহকারে বদ-নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তাদের প্রমাণ হযরত উম্মে সালমার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে : একদিন হযরত উম্মে সালমা ও মায়মূনা (রা) উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ এক সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে সালমা আরম্ভ করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে তো অন্ধ। সে আমাদেরকে দেখতে পারে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা তো অন্ধ নও, তৈমরা তাকে দেখছ।—(আবু দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফিকাহবিদ বলেন : কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দৃশ্যীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে : একবার ঈদের দিন মসজিদে নব্বীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুমত। আয়াতে ভাষা দৃষ্টে আরও বুঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত থাকিলে নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয। কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন অঙ্গ এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী। কেননা আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

অভিধানে زينت এমন বস্তুকে বলা হয়, যদ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তুও হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্য হালাল ; যেমন বাজারে বিক্রির জন্য মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زينت-এর অর্থ নিয়েছেন সাজসজ্জার স্থান; অর্থাৎ যেসব অঙ্গে সাজসজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজসজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব।—(রুহুল মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে ; একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসাবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসাবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَا ظَهَرَ مِنْهَا অর্থাৎ নারীর কোন সাজসজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য যেসব অঙ্গ ব্যতীত যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়েই পড়ে ; অর্থাৎ কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় যেসব অঙ্গ স্বভাবত খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গুনাহ নেই।—(ইবনে কাসীর) এতে কোন কোন অঙ্গ বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন : مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজসজ্জার পোশাকে আবৃত রাখার জন্য পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশত বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজসজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। কেননা কোন নারী প্রয়োজনবশত বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চলাফেরা ও লেনদেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুরূহ হয়। অতএব হযরত ইবনে মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্য বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাও জায়েয নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশত খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফিকাহবিদগণের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয নয়। এমনভাবে এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ ও দূরন্ত হবে।

কাথী বায়যাজী ও 'খায়েন' এই আয়াতের তফসীরে বলেন : নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজসজ্জার কোনকিছু প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাহিরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার—গুনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্য জায়েয; বরং পুরুষদের জন্য দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওয়র ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্য অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লিখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে হাজার মক্কী শাফেঈ (র) ইমাম শাফেঈ (র)-ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায়; কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্য এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েয নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফিকাহবিদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয। বলা বাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষদের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্য নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে বাহ্যিক সাজসজ্জার ব্যতিক্রম বর্ণনা করার পর ইরশাদ হচ্ছে : **وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** অর্থ তারা যেন বক্ষদেশে ওড়না ফেলে রাখে। **خمر** শব্দটি **خمار**-এর বহুবচন। অর্থ এ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্বারা গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। **جُيُوب** শব্দটি **جيب**-এর বহুবচন। এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বক্ষদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বক্ষদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজসজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং এর একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ মূর্খতায়ুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। মূর্খতায়ুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন একপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পরে উল্টিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। —(রুহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা করা হয়েছে, যাদের কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। এক. যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা

মাহরাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে : স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। দুই সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরে সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্বত্বব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম—গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামায়ে খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যও জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহযাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লিখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইশিয়্যারী : স্বরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহবিদদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বারজন ব্যতিক্রমভুক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ : প্রথমত স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : *مارأى منى ولا رأيت منه* অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমিও তাঁর দেখিনি।

দ্বিতীয়ত, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়ত, স্বস্তর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থত, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চমত, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা। সহোদর, বৈমায়েয় ও বৈপিদ্য়েয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়র-মাহরাম। সপ্তম, ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও শুধু সহোদর, বৈমায়েয় ও বৈপিদ্য়েয় ভ্রাতার পুত্র বুঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমায়েয়া ও বৈপিদ্য়েয়া বোন বুঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহরাম। নবম, *أُولَئِكَ* অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক ; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে—গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

وَالْمُسْلِمَانِ মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফির মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন : এ থেকে জানা গেল যে, কাফির নারীর সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিদের সামনে কাফির রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজাহিদ ইমামদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে কাফির নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফির উভয়

প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন ; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী বলেনঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফির সব নারীই نِسَائِهِنَّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণ কাফির নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রুহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন :

অর্থাৎ এই اَمَّا الْقَوْلُ اَوْفُقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَانَّهُ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ احْتِجَابُ الْمُسْلِمَاتِ عَنْ الذَّمِّاتِ উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশি খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফির নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দশম প্রকার اَمَّا مَلَكَتْ اِيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে এখানে শুধু দাসী বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহরামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন : لَا يَفْرَنْكُم اية النور فانه في الاماء نون الزكاة অর্থাৎ তোমরা সূরা নূরের আয়াতদুটো বিভ্রান্ত হয়ে না যে, مَلَكَتْ اِيْمَانُهُنَّ শব্দের মধ্যে দাসরাও शामिल রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন বলেন : পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ দেখা জায়েয নয়।—(রুহুল মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু নারী দাসীদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তখন তারা তো পূর্ববর্তী اَوْنِسَائِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসাস এর জওয়াবে বলেন : نِسَائِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফিরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার اَوَّلِيَّ الْاَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্ড্রিয়বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে, যাদের নারীজাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই।—(ইবনে কাসীর) ইবনে জারীর এই বিষয়বস্তুই আবু আবদুল্লাহ, ইবনে জুবায়র ইবনে আতিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমন সব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপগুণের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত اَوَّلِيَّ الْاَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসুলুল্লাহ (সা) তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এই কারণেই ইবনে হাজর মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন : পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে اَوَّلِيَّ الْاَرْثَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার

কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহৃত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভূক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহৃত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর অনাহৃত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

ষাদশ প্রকার الطُّفْلُ الذِّنِّ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাসিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।—(ইবনে কাসীর) ইমাম জাসাস বলেন : এখানে طفل বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভূক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হলো।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ — অর্থাৎ নারীরা যেন সজ্জারে পর্দাক্ষেপ না করে, যদ্বন্ধন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজসজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অলঙ্কারাদির আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো বৈধ নয় : আয়াতের শুরুতে বেগানা পুরুষদের কাছে সাজসজ্জা প্রকাশ করতে নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। উপসংহারে এর প্রতি আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাজসজ্জার স্থান মস্তক, বক্ষদেশ ইত্যাদি আবৃত করা তো ওয়াজিব ছিলই— গোপন সাজসজ্জার যে কোনভাবেই প্রকাশ করা হোক, তাও জায়েয নয়। অলঙ্কারের ভেতরে এমন জিনিস রাখা, যদ্বন্ধন অলঙ্কার ঝড়ত হতে থাকে কিংবা অলঙ্কারাদির পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে বাজা কিংবা মাটিতে সজ্জারে শা রাখা, যার ফলে অলঙ্কারের শব্দ হয় ও বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে, এসব বিষয় আলোচ্য আয়াতদুটো নাজায়েয। এ কারণেই অনেক ফিকাহবিদ বলেন : যখন অলঙ্কারের আওয়াজ বেগানা পুরুষকে শোনানো এই আয়াত দ্বারা অবৈধ প্রমাণিত হলো; তখন বয়ং নারীর আওয়াজ শোনানো আরও কঠোর এবং প্রণাতিভূতরূপে অবৈধ হবে। তাই তারা নারীর আওয়াজকেও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নাওয়ায়েল গ্রন্থে বলা হয়েছে, যতদূর সম্ভব নারীগণকে কোরআনের শিক্ষাও নারীদের কাছ থেকেই গ্রহণ করা উচিত। তবে নিরুপায় অবস্থায় পুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নামাযে যদি কেউ সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে, তবে পুরুষের উচিত 'সুবহানাল্লাহ' বলে তাকে সতর্ক করা। কিন্তু নারী আওয়াজ করলে পারবেন না ; বরং এক হাতের পিঠে অন্য হাত মেরে তাকে সতর্ক করে দেবে।

নারীর আওয়াজের বিধান : নারীর আওয়াজ গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত কি না এবং বেগানা পুরুষকে আওয়াজ শোনানো জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ

বর্তমান। ইমাম শাফেঈর গ্রন্থসমূহে নারীর আওয়াজকে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। হানাফীদের উক্তিও বিভিন্ন রূপ। ইবনে হুমাম নাওয়াযেলের বর্ণনার ভিত্তিতে গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হানাফীদের মতে নারীর আযান মাকরুহ। কিন্তু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিবিগণ পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরেও পর্দার অন্তরাল থেকে বেগানা পুরুষদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিতর্ক ও অধিক সত্য কথা এই যে, যে স্থানে নারীর আওয়াজের কারণে অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে নিষিদ্ধ এবং যেখানে আশংকা নেই, সেখানে জায়েয।—(জাসসাস) কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকেও কথাবার্তা না বলার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া : নারী যদি প্রয়োজনবশত বাইরে যায়, তবে সুগন্ধি লাগিয়ে না যাওয়াও উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সুগন্ধিও গোপন সাজসজ্জা। বেগানা পুরুষের কাছে এই সুগন্ধি পৌছা নাজায়েয। তিরমিযীতে হযরত আবু মুসা আশআরীর হাদীসে সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে গমনকারিণী নারীর নিন্দা করা হয়েছে।

সুশোভিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়াও নাজায়েয : ইমাম জাসসাস বলেন : কোরআন পাক অলঙ্কারের আওয়াজকেও যখন নিষিদ্ধ করেছে, তখন সুশোভিত রঙিন কারুকার্যখচিত বোরকা পরিধান করে বের হওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, নারীর মুখমণ্ডল যদিও গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কিন্তু তা সৌন্দর্যের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হওয়ার কারণে একেও আবৃত রাখা ওয়াজিব। তবে প্রয়োজনের কথা স্বতন্ত্র।—(জাসসাস)

وَتَوَيَّأُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ অর্থাৎ মু'মিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেনীপ্যমান। তাই উল্লিখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারও দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা মেহায়েত জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প হবে।

وَاتَّكِعُوا أَلْيَاكُمِ مِّنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ
لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সংকর্ষপরাগণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আত্মাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সঞ্চল করে দেবেন। আত্মাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আত্মাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মুক্তদের মধ্যে) যারা বিবাহহীন (পুরুষ হোক কিংবা নারী বিবাহহীন হওয়াও ব্যাপক অর্থে—এখন পর্যন্ত বিবাহই হয়নি কিংবা হওয়ার পর স্ত্রীর মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে বিবাহহীন হয়ে গেছে) তোমরা তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং (এমনিভাবে) তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা এর (অর্থাৎ) বিবাহের) খোঁষা, (অর্থাৎ বিবাহেয় হক আদায় করতে সক্ষম) তাদেরও (বিবাহ সম্পাদন করে দাও। শুধু নিজেদের স্বার্থে তাদের বিবাহের স্বার্থকে বিনষ্ট করো না এবং মুক্তদের মধ্যে যারা বিবাহের পয়গাম দেয়, তাদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার প্রতি লক্ষ্য করে অস্বীকার করো না যদি তাদের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের যোগ্যতা থাকে, কেননা) তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আত্মাহ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে বিত্তশালী করে দেবেন। (মোটকথা এই যে, বিত্তশালী না হওয়ার কারণে বিবাহ অস্বীকার করো না এবং এরূপও মনে করো না যে, বিবাহ হলে খরচ বৃদ্ধি পাবে। ফলে এখন যে বিত্তশালী সেও বিত্তহীন ও কাকাল হয়ে যাবে। কারণ, আসলে আত্মাহুর ইচ্ছার উপরই জীবিকা নির্ভরশীল। তিনি কোন বিত্তশালীকে বিবাহ ছাড়াও নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত করতে পারেন এবং কোন দারিদ্র্য বিবাহওয়ালাকে বিবাহ সত্ত্বেও দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।) আত্মাহ তা'আলা প্রাচুর্যময় (যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং সবার অবস্থা সম্পর্কে) জ্ঞানময়। (যাকে বিত্তশালী করা রহস্যের উপযোগী হবে তাকে বিত্তশালী করে দেন এবং যাকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত রাখাই উপযুক্ত, তাকে দরিদ্র রাখেন।) আর (যদি কেউ দারিদ্র্যের কারণে বিবাহের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী না হয়, তবে) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন প্রবৃত্তিকে বশে রাখে, যে পর্যন্ত না আত্মাহ তা'আলা (ইচ্ছা করলে) নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন। অভাবমুক্ত করা হলে বিবাহ করবে)।

বিবাহের কতিপয় বিধান : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা নূরে বেশির ভাগ সতীত্ব ও পবিত্রতার হিফায়ত এবং নির্লজ্জতা অশ্লীলতা দমন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এই পরশ্পরায় ব্যভিচার ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির কঠোর শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর অনুমতি চাওয়া ও পর্দার বিধান বিধৃত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত একটি সুষম শরীয়ত। এর যাবতীয় বিধি-বিধান সমতা নিহিত আছে। এক দিকে মানুষের স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং অপরদিকে এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই একদিকে যখন মানুষকে অবৈধ পন্থায় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, তখন স্বভাবগত প্রেরণা ও কামনা-বাসনার প্রতি লক্ষ্য রেখে এর কোন বৈধ ও বিত্তজ্ঞ পন্থাও মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫১

বলে দেয়া জরুরী ছিল। এছাড়া মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে কতিপয় সীমার ভেতরে থেকে নর ও নারীর মেলামেশার কোন পন্থা প্রবর্তন করাও যুক্তি ও শরীয়তের দাবি। কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এই পন্থার নাম বিবাহ। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে স্বাধীন নারীদের অভিভাবক এবং দাস-দাসীদের মালিকদেরকে তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ করা হয়েছে।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ — এই বহুবচন। অর্থ প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই, আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালাকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্য তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি থেকে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে; নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্য কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেওয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করাই বিবাহের মসনুন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্শ্বিক উপকারিতা আছে। বিশেষত মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেসই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যমে ছাড়া নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেওয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে এই বিধানটি একটি বিশেষ সুন্নত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত 'কুফু' তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিলক্ষিত হয় এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেঈ ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্ক বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয় পক্ষের প্রমাণাদি বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত এ ব্যাপারে নিরূপণ; বিশেষত এ কারণেও যে, الْيَتَامَى (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ— কেউ একে বাতিল বলে না। এমনভাবে বাহ্যত বুঝা যায় যে; প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুন্নতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নাহ, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ? : মুজতাহিদ ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে

শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, শুনাহে লিগ্গ হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ফরয অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ করবে না, ততদিন শুনাহ্‌গার থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে ; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সংগৃহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্যধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে। রোযার ফলে কামোত্তেজনা ভিত্তিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওকাফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমার স্ত্রী আছে কি ? তিনি বললেন : না! আবার জিজ্ঞেস করলেন : কোন শরীয়তসম্মত বাদী আছে কি ? উত্তর হলো : না। প্রশ্ন হলো : তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল ? উত্তর হলো : হ্যাঁ। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের সামর্থ্য রাখ? তিনি উত্তরে হ্যাঁ বললে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাই। তিনি আরও বললেন : বিবাহ আমাদের সুন্নত। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।—(মাযহারী)

যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে শুনাহ্‌র আশংকা প্রবল, ফিকাহবিদদের মতে এই হাদীসটিও সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওকাকের অবস্থা সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জানা ছিল যে, সে সবর করতে পারে না। এমনভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।—(মাযহারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে ক্ষেত্রে বিবাহ না করলে শুনাহে লিগ্গ হওয়ার আশংকা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফিকাহবিদ একমত যে কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে শুনাহে লিগ্গ হয়ে যাবে, উদাহরণত সে দাম্পত্য জীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন শুনাহ্‌ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা হারাম অথবা মাকরুহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মাধ্যবর্তী অর্থাৎ বিবাহ না করলেও যার শুনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন শুনাহের আশংকা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফিকাহবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে নফল ইবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেঈ বলেন, নফল ইবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সম্ভাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি সুবাহ্‌ তথা শরীয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে শুনাহ্‌ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা ইবাদতেও পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ

যদি একরূপ সদুদ্দেশ্যে যে কোন মুবাহ্ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্য ইবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও একরূপ নিয়তের ফলে ইবাদত হয়ে যায়। ইবাদতে মশগুল হওয়া আপন সন্তায় একটি ইবাদত। তাই ইমাম শাফেঈ ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে ইবাদতের দিক অন্যান্য মুবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সহীহ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গম্বরদেরও স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মুবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মুবাহ্ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গম্বরগণের সুন্নত। এতে ইবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও নিদ্রাও পয়গম্বরগণের সুন্নত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গম্বরগণের সুন্নত। বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গম্বরগণের কর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ একরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গম্বরগণের সুন্নত এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজের সুন্নত বলা হয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে এ প্রসঙ্গে একটি সুখম কথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মধ্যাবস্থায় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত কামভাবের হাতে পরাভূতও নয় এবং বিবাহ করলে কোন শুনাহতে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও নেই, একরূপ ব্যক্তি যদি অনুভব করে যে, বিবাহ করা সত্ত্বেও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব তার যিকর ও ইবাদতের অন্তরায় হবে না, তবে তার জন্য বিবাহ করা উত্তম। সকল পয়গম্বর ও সাধু ব্যক্তির অবস্থা তদ্রূপই ছিল। পক্ষান্তরে যদি তার একরূপ প্রত্যয় থাকে যে, বিবাহ ও পরিবার পরিজনের দায়িত্ব পালন তাকে ধর্মীয় উন্নতি ও অধিক যিকর ইত্যাদি থেকে বিরত রাখবে, তবে তার জন্য ইবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাস এবং বিবাহ বর্জন উত্তম। কোরআন পাকের অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একটি আয়াত এই : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا** এতে নির্দেশ আছে যে, অর্থকড়ি ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করে দেওয়ার কারণ না হওয়া সমীচীন।

وَالْمَسَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْثَلِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ক্রীতদাস ও বাদীদের মধ্যে যারা যোগ্য, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এখানে মালিক ও প্রভুদেরকে সন্মোদন করা হয়েছে। **مَالِحِينَ** শব্দটি এ স্থলে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা বিবাহের যোগ্যতা ও সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। সামর্থ্যের অর্থ ক্রীত বৈবাহিক অধিকার, ভরণ-পোষণ ও তাত্ক্ষণিক পরিশোধযোগ্য মোহর আদায় করার যোগ্যতা। যদি **مَالِحِينَ** শব্দের সুবিদিত অর্থ সংকর্মপরায়ণ নেওয়া হয়, তবে বিশেষভাবে তাদের কথা বলার কারণ এই যে, বিবাহের আসল লক্ষ্য হারাম থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সংকর্মপরায়ণদের মধ্যেই হতে পারে।

মোটকথা, ক্রীতদাস ও বাদীদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করার আদেশ প্রভুদেরকে প্রদত্ত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তারা বিবাহের প্রয়োজন প্রকাশ করে এবং বিবাহের خواهশ করে, তবে কোন কোন ফিকাহবিদের মতে তাদের বিবাহ সম্পাদন করা প্রভুদের উপর ওয়াজিব হবে। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে তাদের বিবাহে বাধা সৃষ্টি না করা। বরং অনুমতি দেওয়া প্রভুদের জন্য অপরিহার্য হবে। কারণ, ক্রীতদাস ও বাদীদের বিবাহ মালিকের অনুমতি ছাড়া হতে পারে না। এমতাবস্থায় এ আদেশটি কোরআন পাকের এ আয়াতের অনুরূপ হবে لَا تَنْخَلُوهُمْ أَنْ يُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ — অর্থাৎ নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেওয়া অভিভাবকদের জন্য অপরিহার্য। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে।—(তিরমিযী)

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্তত না করে সেইজন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিহ্মায় ওয়াজিব—এটা জরুরী নয়। وَاللَّهُ أَعْلَمُ

—انْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَخْلِهِ—যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্মকর্মের হিফায়তের জন্য বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হিফায়ত ও সুন্নাতে রাসূল (সা) পালন করার সদুদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায়, আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি কণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সব মুসলমানকে বিবাহ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং বিবাহের কারণে তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ওয়াদা করেছেন।—ইবনে কাসীর। ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একবার মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন: তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালন কর। তিনি যে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন :

—انْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ—হযরত ইবনে মাসউদ বলেন : তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وَاللَّهُ أَعْلَمُ —(ইবনে কাসীর)

হুশিয়ারী : তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, স্বতর্বা যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নাত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াত :

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَخْلِهِ

অর্থাৎ যারা অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশংকা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে গুনাহ্‌গার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ধৈর্যের জন্য হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বেশি পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ সম্পদ দান করবেন।

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرِهُوا ۚ فَتَبِيتَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْسِبًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ آكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٥

(৩৩-এর বাকী অংশ)

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থকড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্শ্ব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে (দাস হোক কিংবা দাসী) যারা মোকাতাব হতে ইচ্ছুক (উত্তম এই যে,) তাদেরকে মোকাতাব করে দাও যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণের চিহ্ন) দেখতে পাও। আর আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত অর্থসম্পদ থেকে তাদেরকেও দান কর (যাতে দ্রুত মুক্ত হতে পারে)। তোমাদের (অধিকারভুক্ত) দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না (বিশেষত) যদি তারা সন্তী থাকতে চায় (এবং তোমাদের এই হীন কর্ম) শুধু এ কারণে যে, তোমরা পার্শ্ব জীবনের কিছু উপকার (অর্থাৎ ধনসম্পদ) লাভ করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে বাধ্য করবে (এবং তারা বাঁচতে চাইবে,) আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর জবরদস্তি করার পর (তাদের প্রতি) ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাঁদীদের বিবাহের প্রয়োজন দেখা দিলে মালিকদেরকে বিবাহের অনুমতি দেওয়ার আদেশ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে,

তারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরে গোলাম ও বাদীদের স্বভাবজাত স্বার্থকে উপেক্ষা না করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। এই আদেশের সার-সংক্ষেপ হচ্ছে অধিকারভুক্ত গোলাম ও বাদীদের সাথে সম্ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো। এর সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচ্য আয়াতে মালিকদেরকে দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে, গোলাম ও বাদীরা যদি মালিকদের সাথে মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তবে তাদের এই বাসনা পূর্ণ করাও মালিকদের জন্য উত্তম ও সওয়াবের কাজ। হিদায়ার গ্রন্থকার এবং অধিকাংশ ফিকাহবিদ এই নির্দেশকে মুত্তাহাবই স্থির করেছেন। অর্থাৎ অধিকারভুক্তদের সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া মালিকদের জন্য ওয়াজিব নয় ; কিন্তু মুত্তাহাব ও উত্তম। এই চুক্তির রূপরেখা এরূপ : কোন গোলাম অথবা বাদী তার মালিককে বলবে, আপনি আমার উপর টাকার একটি অঙ্ক নির্ধারণ করে দিন। আমি পরিশ্রম ও উপার্জনের মাধ্যমে এই টাকা আপনাকে পরিশোধ করে দিলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। এরপর মালিক এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল। অথবা মালিক স্বৈচ্ছায় গোলামকে প্রস্তাব দেবে যে, এই পরিমাণ টাকা আমাকে দিতে পারলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। গোলাম এই প্রস্তাব মেনে নিলে চুক্তি হয়ে যাবে। যদি প্রভু ও গোলামের মধ্যে প্রস্তাব ও পেশ গ্রহণের মাধ্যমে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অপরিহার্য হয়ে যায়। মালিকের তা ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে না। যখনই গোলাম নির্ধারিত অঙ্ক পরিশোধ করে দেবে, তখনই আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে।

টাকার এই অঙ্ককে ‘বদলে-কিতাবত’ বা চুক্তির বিনিময় বলা হয়। শরীয়ত এর কোন সীমা নির্ধারণ করেনি। গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হোক কিংবা কম বেশি, উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণই স্থিরীকৃত হবে, তাই চুক্তির বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইসলামী শরীয়তের যেসব বিধান দ্বারা অধিক পরিমাণে গোলাম ও বাদী মুক্ত করার পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, গোলাম ও বাদীর সাথে লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ ও তাকে মুত্তাহাব সাব্যস্ত করার বিধানও সেইসব বিধানের অন্যতম। যারা শরীয়তসম্মত গোলাম ও বাদী, ইসলাম অধিক পরিমাণে তাদের মুক্তির পথ খুলতে আগ্রহী। যাবতীয় কাফকারার মধ্যে গোলাম অথবা বাদী মুক্ত করার বিধান আছে। এমনিতেও গোলাম মুক্ত করার মধ্যে বিরাট সওয়াবের ওয়াদা রয়েছে। লিখিত চুক্তির ব্যাপারটিও তারই একটি পথ। তাই এর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তবে এর সাথে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, **ان علمتم فيهم خيرا** অর্থাৎ লিখিত চুক্তি করা তখনই দুরস্ত হবে, যখন তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণের চিহ্ন দেখতে পাও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং অধিকাংশ ইমাম এই কল্যাণের অর্থ বলেছেন উপার্জন ক্ষমতা। অর্থাৎ যার মধ্যে এরূপ ক্ষমতা দেখা যায় যে, তার সাথে চুক্তি করলে উপার্জনের মাধ্যমে নির্ধারিত টাকা সঞ্চয় করতে পারবে, তবে তার সাথে চুক্তি করা যায়। নতুবা অযোগ্য লোকের সাথে চুক্তি করলে তার পরিশ্রমও পণ হবে এবং মালিকেরও ক্ষতি হবে। হিদায়ার গ্রন্থকার বলেন : এখানে কল্যাণের অর্থ এই যে, সে মুক্ত হলে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতির আশংকা নেই ; উদাহরণত সে কাফির হলে এবং তার

কাফির ভাইদের সাহায্য করলে বুঝতে হবে যে, এখানে উভয় বিষয়ই কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। গোলামের মধ্যে উপার্জনশক্তিও থাকতে হবে এবং তার মুক্তির কারণে মুসলমানদের কোন রূপ ক্ষতির আশংকাও না থাকা চাই।—(মায়হারী)

وَأَتَوْنَهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ — অর্থঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সন্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত নয়। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময় কিছু ভ্রাস করে দেয়। সাহাবায়ে কিরাম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময় সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থীংশ অথবা আরও কম ভ্রাস করে দিতেন।—(মায়হারী)

অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা এবং সে সম্পর্কে কোরআনের কয়সালা : আজকাল দুনিয়াতে বহুবাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র বিশ্ব পরকাল বিস্মৃত হয়ে কেবল অর্থোপার্জনের জালে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের জ্ঞানগত গবেষণা ও চিন্তাভাবনার পরিধি শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এতে আলোচনা ও গবেষণার তোড়জোড় এত বেশি যে, এক একটি সাধারণ বিষয় বিরাট বিরাট শাস্ত্রের আকার ধারণ করে ফেলেছে। তন্মধ্যে অর্থশাস্ত্রই সর্ববৃহৎ।

এ ব্যাপারে আজকাল বিশ্বের মনীষীদের দু'টি মতবাদ অধিক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত এবং উভয় মতবাদই বিপরীতমুখী। মতবাদের এই সংঘর্ষ বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ধাক্কাধাক্কি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের এমন দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্ববাসীর কাছে শান্তি একটি অচেনা বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যাকে পরিভাষায় ক্যাপিটালিজম বলা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যাকে কমিউনিজম অথবা সোশ্যালিজম বলা হয়। একথা চান্ধুষ এবং সর্ববাদীসম্মত যে, এই বিশ্বচরাচরে মানুষ তার শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা যা কিছু উপার্জন ও সৃষ্টি করে, সেসবের আসল ভিত্তি প্রাকৃতিক সম্পদ, মৃত্তিকার ফসল, পানি ও খনিতে উৎপন্ন প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের উপর স্থাপিত। মানুষ চিন্তাভাবনা ও শ্রমের মাধ্যমে এসব সম্পদের মধ্যে জোড়াতালি ও সংমিশ্রণ দ্বারা প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য তৈরি করে। বিবেকের দাবি ছিল এই যে, উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার প্রবক্তারা প্রথমে চিন্তা করত যে, এসব প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এগুলোর কোন একজন স্রষ্টা আছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, এগুলোর আসল মালিকও তিনিই হবেন, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। আমরা এসব সম্পদ কুক্ষিগত করা, এগুলোর মালিক হওয়া অথবা ব্যবহার করার ব্যাপারে স্বাধীন নই। বরং প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টা যদি কিছু নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তবে সেগুলো মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু বহুপূজার উন্মাদনা তাদের সবাইকে প্রকৃত মালিক ও স্রষ্টার ধারণা থেকেই গাফেল করে দিয়েছে। তাদের মতে এখন আলোচনার বিষয়বস্তু এডটুই যে, যে ব্যক্তি এসব সম্পদ অধিকারভুক্ত করে এগুলো দ্বারা জীবন

ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করে, সে আপনা-আপনি এগুলোর স্বাধীন মালিক হয়ে যায়, না এগুলো সাধারণ ওয়াকফ ও যৌথ মালিকানাধীন যে, প্রত্যেকেই এগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে :

প্রথম মতবাদ পূঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষকে এসব বস্তুর উপর স্বাধীন মালিকানা অধিকার দান করে। মানুষ যেভাবে ইচ্ছা এগুলো অর্জন করতে পারে এবং যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধা-নিষেধ অসহনীয়। এই মতবাদই প্রাচীনকালে মুশরিক ও কাফিরদের ছিল। তারা হযরত শোয়ায়ব (আ)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল : এসব ধন-সম্পত্তি আমাদের। আমরা এগুলোর মালিক। আমাদের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করার এবং জায়েয-নাজায়েযের কথা বলার অধিকার আপনি কোথায় পেলেন? কোরআনের **أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا شَيْئًا** আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। দ্বিতীয় মতবাদ সোশ্যালিজম মানুষকে কোন বস্তুর উপর কোনরূপ মালিকানার অধিকার দেয় না ; বরং প্রত্যেক বস্তুকে সব মানুষের যৌথ মালিকানাধীন সাব্যস্ত করে এবং সবাইকে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সমান অধিকার দান করে। এটাই সমাজতন্ত্রের আসল ভিত্তি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এ ধারণার বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং এর ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা পরিচালনা করা যায় না, তখন কিছু বস্তুকে মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমভুক্তও করে দেওয়া হলো।

কোরআন পাক এই উভয় বাজে মতবাদ খণ্ডন করে মূলনীতি এই দিয়েছে যে, বিশ্বের সকল বস্তুর প্রকৃত মালিক আল্লাহ, যিনি এগুলোর স্রষ্টা। এরপর তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় মানুষকে বিশেষ আইনের অধীনে মালিকানা দান করেছেন। এই আইনের দৃষ্টিতে যাকে যেমন জিনিসের মালিক করা হয়েছে, সেগুলোতে তাঁর অনুমতি ব্যতীত অপরের হস্তক্ষেপ করা হারাম করা হয়েছে। কিন্তু মালিক হওয়ার পরও তাকে স্বাধীন মালিকানা দেওয়া হয়নি যে, যেভাবে ইচ্ছা উপার্জন করবে ও যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করবে ; বরং উভয় দিকের একটি ন্যায্যানুগ ও প্রজ্ঞাভিত্তিক আইন রাখা হয়েছে যে, উপার্জনের অমুক পথ হালাল, অমুক পথ হারাম এবং অমুক জায়গায় ব্যয় করা হালাল ও অমুক জায়গায় হারাম। এছাড়া যেসব বস্তুর মালিকানা দান করা হয়েছে, সেগুলোতে অপরের অধিকারও জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদায় করা তার দায়িত্ব।

আলোচ্য আয়াতে যদিও ভিন্ন বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ের কতিপয় মূলনীতিও এতে ব্যক্ত হয়েছে। আয়াতের ভাষায় প্রতি লক্ষ্য করুন। **وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ** অর্থাৎ এই অভাবহীন লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার সেই ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতে তিনটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এক. ধন-সম্পদ তথা প্রত্যেক বস্তুর আসল মালিক আল্লাহ। দুই. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে এর এক অংশের মালিক করেছেন। তিন. তিনি যে বস্তুর মালিক বানিয়েছেন, তার জন্য কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা অপরিসীম, ওয়াজিব মুস্তাহাব, উত্তম করেছেন। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** এবং মূর্খতা যুগের কুপ্রথা উৎপাটন, ব্যভিচার ও নির্লজ্জতা দমন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, **وَلَا تُكْرِمُوا**

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫২

أَرْبَابٌ تَوَكَّلُوا عَلَى الْبَغَاةِ অর্থাৎ তোমাদের বাঁদীদেরকে এ কাজে বাধ্য করো না যে, তারা ব্যভিচারের মাধ্যমে অর্থকড়ি উপার্জন করে তোমাদেরকে দেবে। মূর্খতা যুগের অনেক মানুষ বাঁদীদেরকে এ কাজে ব্যবহার করত। ইসলাম যখন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি জারি করল এবং মুক্ত ও গোলাম নির্বিশেষে সবাইকে এর আওতাভুক্ত করে দিল, তখন এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিধান প্রদান করাও জরুরী ছিল।

انْزِلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ — অর্থাৎ যদি বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার ও সতীত্ব রক্ষা করার ইচ্ছা করে, তবে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করা খুবই নির্লজ্জ কাজ। বাক্যটি যদিও শর্তের আকারে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সর্বসম্মত মতানুসারে প্রকৃতপক্ষে এ শর্ত উদ্দেশ্য নয় যে, বাঁদীরা ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চাইলে তাদের উপর জবরদস্তি করা জায়েয নয় এবং বাঁচতে না চাইলে জায়েয। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ চাল-চলন ও অভ্যাসের দিক দিয়ে বাঁদীদের মধ্যে লজ্জাশরম ও সতীত্ববোধ মূর্খতায়ুগে বিদ্যমান ছিল না। ইসলামী বিধানাবলী আগমনের পর তারা যখন তওবা করল, তখনও তাদের প্রভুরা অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক জবরদস্তি করতে চাইল। এই পরিস্থিতিতে আলোচ্য বিধান অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, তারা যখন ব্যভিচার থেকে বাঁচতে চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধ্য করো না। এতে করে তাদের প্রভুদেরকে শাসানো উদ্দেশ্য যে, বাঁদীরা তো সতীসাক্ষী থাকতে ইচ্ছুক, আর তোমরাই তাদেরকে ব্যভিচার করতে বাধ্য কর—এটা নিরতিশয় বেহায়াপনার কাজ।

فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَامِهِمْ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ — এই বাক্যের সারমর্ম এই যে, বাঁদীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হারাম। কেউ এরূপ করলে এবং প্রভুর জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে কোন বাঁদী ব্যভিচার করলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং সমস্ত গুনাহ জবরকারীর উপর বর্তাবে।—(মায়হারী)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الدِّينِ خُلُوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ
كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فِي بَيِّنَاتٍ أَذِنَ

اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا سَمَهُ ۖ لَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ ﴿٣٩﴾ رِجَالٌ لَا
 تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ
 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۖ ﴿٤٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا
 عَمِلُوا وَيَزِيدَ لَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
 لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوقَهُ حِسَابَهُ ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ۖ ﴿٤٢﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ
 فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظَلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ
 يَرَاهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۚ ﴿٤٣﴾

(৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের
 কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ-ভীরুদের জন্য দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ নভোমণ্ডল ও
 ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ,
 প্রদীপটি একটি কাচপাত্রে স্থাপিত, কাচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পূতঃপবিত্র
 যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না
 করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ
 যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা
 করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৬) আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার
 এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায়
 তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; (৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য
 ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং বাকাত প্রদান করা
 থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে
 যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর
 কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা
 অপরিমিত রুখী দান করেন। (৩৯) যারা কাফির, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ,
 যাকে শিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই

পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্ভেলিত করে ভরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কাল মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি (তোমাদের হিদায়াতের জন্যে এই সূরায় অথবা কোরআনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট (শিক্ষাগত ও কর্মগত) বিধানাবলী অবতীর্ণ করেছি এবং তোমাদের পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের (অথবা তাদের মত লোকদের) কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহুভীরুদের জন্যে উপদেশ (অবতীর্ণ করেছি)। আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডলের (বাসিন্দাদের) এবং ভূমণ্ডলের (বাসিন্দাদের) জ্যোতি (অর্থাৎ হিদায়াত) দাতা। (অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাসিন্দাদের মধ্যে যারা হিদায়াত পেয়েছে, তাদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলাই হিদায়াত দিয়েছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল বলে সমগ্র বিশ্ব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং যেসব সৃষ্ট জীব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাইরে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত আছে, যেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদল।) তাঁর জ্যোতির (হিদায়াতের) আশ্চর্য অবস্থা এমন, যেমন (মনে কর) একটি তাক, তাতে একটি প্রদীপ (স্থাপিত)। প্রদীপটি (স্বয়ং তাকে স্থাপিত নয়; বরং) একটি কাঁচপাত্রের স্থাপিত (এবং কাচপাত্রটি তাকে রাখা আছে।) কাচপাত্রটি (এমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ) যেন একটি উজ্জ্বল তারকা।

প্রদীপটি একটি উপকারী বৃক্ষ (অর্থাৎ বৃক্ষের তৈল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়, যা যয়তুন (বৃক্ষ)। বৃক্ষটি (কোন আড়ালের) পূর্বমুখী নয় এবং (কোন আড়ালের) পশ্চিমমুখীও নয়। (অর্থাৎ এর পূর্বদিকে কোন বৃক্ষ অথবা পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনের শুরুতে তার উপর রৌদ্র পতিত হবে না এবং তার পশ্চিম দিকেও কোন পাহাড়ের আড়াল নেই যে, দিনশেষে তার উপর রৌদ্র পড়বে না; বরং বৃক্ষটি উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত, যেখানে সারাদিন রৌদ্র থাকে। এমন বৃক্ষের তৈল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এবং) এর তৈল (এতটুকু পরিষ্কার ও প্রজ্জ্বলনশীল যে) অগ্নি স্পর্শ না করলেও মনে হয় যেন আপনা-আপনি জ্বলে উঠবে। (আর যখন অগ্নি স্পর্শ করে, তখন তো) জ্যোতির উপর জ্যোতি। (অর্থাৎ একে তো তার মধ্যে জ্যোতির যোগ্যতা উৎকৃষ্ট স্তরের ছিল, এরপর আগুনের সাথেও মিলিত হয়েছে। মিলনও এমনভাবে যে, প্রদীপটি কাচপাত্রের রাখা আছে, যদ্বারা চাকচিক্য দৃশ্যত আরও বেড়ে যায়। এরপর কাচপাত্রটি তাকে স্থাপিত আছে, যা একদিক থেকে বন্ধ। এমনভাবেই কিরণ এক স্থানে সংকুচিত হয়ে আলো অনেক তীব্র হয়ে যায়। তৈলও যয়তুনের, যা পরিষ্কার আলো ও কম ধোঁয়া হওয়ার জন্যে প্রশিদ্ধ। ফলে অনেকগুলো আলোর একত্র সমাবেশের ন্যায় প্রখর আলো হবে। একেই "জ্যোতির উপর জ্যোতি" বলা হয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত সমাপ্ত হলো। এমনভাবে মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা যখন হিদায়াতের নূর সৃষ্টি করেন, তখন তার অন্তর দিন দিন সত্য গ্রহণের জন্যে উন্মুক্ত হতে থাকে এবং সর্বদাই আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত থাকে; যদিও কার্যত কোন কোন আদেশের জ্ঞান থাকে না। কেননা, জ্ঞান ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যয়তুনের

তৈল যেমন অগ্নি সংযোগের পূর্বেই আলো বিকীরণের জন্যে প্রস্তুত ছিল, তেমনি মু'মিনও নির্দেশাবলীর জ্ঞান লাভ করার পূর্বেই সেগুলো পালন করার জন্যে প্রস্তুত থাকে। এরপর যখন জ্ঞান হাসিল হয়, তখন কর্মের নূর অর্থাৎ পালন করার দৃঢ় সংকল্পের সাথে জ্ঞানের নূরও মিলিত হয়। ফলে, সে তৎক্ষণাৎ তা কবুল করে নেয়। সুতরাং কর্ম ও জ্ঞান একত্রিত হয়ে নূরের উপর নূর হয়ে যায়। নির্দেশাবলীর জ্ঞান অর্জিত হওয়ার পর মু'মিন সত্য গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধা করে না। এই উন্মুক্ততা ও নূর অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : **أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۗ** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক নূরের উপর থাকে। অন্যত্র বলা হয়েছে : **فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَنَّ فَرْدًا فَهُوَ يُعْطِ الْوَسِيلَ ۚ** মোটকথা, এ হচ্ছে নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত।) আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (এবং পৌঁছিয়ে দেন। হিদায়াতের এই দৃষ্টান্তের ন্যায় কোরআনে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারাও মানুষের হিদায়াত উদ্দেশ্য। তাই) আল্লাহ তা'আলা মানুষের (হিদায়াতের) জন্য (এসব) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন (যাতে জ্ঞানগত বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় বোধগম্য হয়ে যায়)। আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে জ্ঞাত। (তাই যে দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য পূরণে যথেষ্ট, সেই দৃষ্টান্তই অবলম্বন করেন। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ খুবই যথোপযুক্ত হয়ে থাকে। এরপর হিদায়াতপ্রাপ্তদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) তারা এমন গৃহে (গিয়ে ইবাদত করে), (যেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন ; (অর্থাৎ মসজিদসমূহ। মসজিদের সম্মান এই যে, তাতে নাপাক ও হায়েযওয়ালী প্রবেশ করবে না, কোন অপবিত্র বস্তু সেখানে নেয়া যাবে না, গুণ্ণগাল করা যাবে না, পার্শ্ব কাছ ও কথাবার্তা বলার জন্যে সেখানে বসা যাবে না, দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খেয়ে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইত্যাদি। মোটকথা) সেগুলোতে (অর্থাৎ মসজিদসমূহে) এমন লোকেরা সকাল ও সন্ধ্যায় (নামায়ে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদেরকে আল্লাহর মরণ (অর্থাৎ নির্দেশাবলী পালন) থেকে এবং (বিশেষভাবে) নামায পড়া থেকে এবং যাকাত প্রদান থেকে (শাখাগত নির্দেশাবলীর মধ্যে এগুলো প্রধান) ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় বিরত রাখে না। (আনুগত্য ও ইবাদত সত্ত্বেও তাদের ভয়বীতি এরূপ যে) তারা সেই দিনকে (অর্থাৎ সেই দিনের ধরপাকড়কে) ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (যেমন অন্য আয়াতে আছে **يَوْمَ لَا تُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ** অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে খরচ করে এবং এতদসত্ত্বেও তাদের অন্তর কিয়ামতের ধরপাকড়কে ভয় করে। এখানে হিদায়াত ও নূর ওয়ালাদের গুণাবলী ও কর্ম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।) পরিণাম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজ-কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেবেন (অর্থাৎ জান্নাত দেবেন।) এবং (প্রতিদান ছাড়াও) নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেবেন। (প্রতিদান তো এটা—যার ওয়াদা বিস্তারিত উল্লিখিত আছে, অধিক হলো—যার ওয়াদা বিস্তারিত নেই, যদিও সংক্ষিপ্ত আছে।) আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা, অগণিত (অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে) রুখী দান করেন। (সুতরাং তাদেরকে জান্নাতে এমনভাবে অপরিসীম দেবেন। এ পর্যন্ত হিদায়াত ও হিদায়াতওয়ালাদের বর্ণনা ছিল। অতঃপর পথভ্রষ্টতা ও

পথভ্রষ্টদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ যারা কাফির (পথভ্রষ্ট এবং নুরে-হিদায়াত থেকে দূরে) তাদের কর্ম (কাফিরদের দুই প্রকার হওয়ার কারণে দু'টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ। কেননা, এক প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামত বিশ্বাসী এবং তাদের যেসব কর্ম তাদের ধারণা অনুযায়ী সওয়াবের কাজ, পরকালে সেগুলোর প্রতিদান আশা করে। দ্বিতীয় প্রকার কাফির পরকাল ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী। প্রথম প্রকার কাফিরদের কর্ম তো) মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে (দূর থেকে) পানি মনে করে (এবং তার দিকে দৌড় দেয়) ; এমনকি, সে যখন তার কাছে পৌঁছে, তখন তাকে (যা মনে করেছিল) কিছুই পায় না এবং) চরম পিপাসা তদুপরি নিদারুণ নৈরাশ্যের কারণে শারীরিক ও আত্মিক আঘাত পেয়ে সে ছটফট করতে করতে মারা যায়। এমতাবস্থায় বলা উচিত যে, পানির পরিবর্তে) আল্লাহর ফয়সালা অর্থাৎ মৃত্যুকে পায়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা তার (জীবনের) হিসাব চুকিয়ে দেন (অর্থাৎ জীবন সাক্ষ করে দেন)। আল্লাহ তা'আলা (যার মেয়াদ এসে যায়, তার) দ্রুত হিসাব (নিষ্পত্তি) করে দেন। (তাকে মোটেই ঝামেলা পোহাতে হয় না যে, দেবী লাগবে। সুতরাং এই বিষয়টি এমন, যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে : **أَنْ جُلَّ اللَّهُ إِذَا جَاءَ** আরও বলা হয়েছে : **لَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا** এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন মরীচিকাকে পানি মনে করে, তেমনিভাবে কাফিররা তাদের কর্মকে বাহ্যিক আকারে গ্রহণযোগ্য ও আখিরাতেও ফলদায়ক মনে করে এবং যেমন মরীচিকা পানি নয়, তেমনিভাবে তাদের কর্ম কবুলের শর্ত অর্থাৎ ঈমান না থাকার কারণে গ্রহণযোগ্য ও ফলদায়ক নয়। পিপাসার্ত ব্যক্তি মরীচিকার কাছে পৌঁছে যেমন আসল স্বরূপ জানতে পারে, তেমনিভাবে কাফিররাও আখিরাতে পৌঁছে তার কর্ম ও বিশ্বাসের স্বরূপ জানতে পারবে। পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে হা-হতাশ করতে করতে মারা গেল, তেমনিভাবে কাফিরও তার আশা ভ্রান্ত হওয়ার কারণে চিরন্তন ধ্বংস অর্থাৎ জাহান্নামের আযাবে পতিত হবে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার কাফিরের কর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ) অথবা তাদের (কর্ম কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে) গভীর সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ অন্ধকারের ন্যায়, (যার এক কারণ সমুদ্রের গভীরতা, তদুপরি) তাকে (অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগকে) একটি বিশাল তরঙ্গ ঢেকে রেখেছে (তরঙ্গও একা নয়, বরং) তার (তরঙ্গের) উপর অন্য তরঙ্গ (আছে, এরপর) তার উপর কাল মেঘ আছে, যদব্দল তারকা ইত্যাদির আলোও পৌঁছে না। মোটকথা) উপর-নীচে অনেক অন্ধকারই অন্ধকার। যদি (এমতাবস্থায় কোন লোক সমুদ্রের গভীরে হাত বের করে এবং তা দেখতে চায়) তবে (দেখা দূরের কথা) দেখার সম্ভাবনাও নেই। (এই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, যেসব কাফির পরকাল, কিয়ামত ও তাতে প্রতিদান ও শাস্তির বিষয় অস্বীকার করে, তাদের কাছে কাল্পনিক নূরও নেই; যেমন প্রথম প্রকার কাফিরদের কাছে একটি কাল্পনিক নূর ছিল। কেননা, তারা তাদের কতক সংকর্মকে পরকালের পুঁজি মনে করেছিল, কিন্তু ঈমানের শর্ত না থাকার কারণে তা প্রকৃত নূর ছিল না—একটি কাল্পনিক নূর ছিল। পরকাল অস্বীকারকারীরা তাদের বিশ্বাস ও ধারণা অনুযায়ী কোন কাজ পরকালের জন্যে করেইনি, যার নূরের কল্পনা তাদের মনে থাকতে পারে। মোটকথা, তাদের কাছে অন্ধকারই আছে, নূরের কল্পনাও তাদের কাছে হতে পারে না। সমুদ্রের গভীরতার দৃষ্টান্তে তাই আছে। না দেখা যাওয়ার

ব্যাপারে বিশেষভাবে হাতকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হাত নিকটতম। এছাড়া একে যতই নিকটে আনতে চাইবে ততই নিকটে আসবে। এমতাবস্থায় হাতই যখন দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা বলাই বাহুল্য। অতঃপর এই কাকিরদের অন্ধকারে থাকার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, (যাকে আল্লাহ তা'আলা নূর দেন না, সে (কোথা থেকেও) নূর পেতে পারে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতকে আলিমগণ 'নূরের আয়াত' বলে থাকেন। কেননা, এতে ইমানের নূর ও কুফরের অন্ধকারকে বিস্তারিত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

নূরের সংজ্ঞা : নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গায়যালী বলেন : **الظاهر بنفسه والمظهر لغيره** অর্থাৎ যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমন সব বস্তুকে অনুভব করে ; যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে ; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, 'নূর' শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থ নন এবং পদার্থজাতও নন, বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াত আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত 'নূর' শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে 'মুনাওয়ের' অর্থাৎ উজ্জ্বল্য দানকারী। অথবা অতিশয়ার্থবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে 'নূর' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে 'দান' বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণশীলকে ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্ট জীবের নূরদাতা। এই নূর বলে হিদায়াতের নূর বুঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন : **اللَّهُ مَدَّيْ** আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হিদায়াতকারী।

মু'মিনের নূর : **مِثْلُ نُّورِهِ كَمِثْلِكَ** মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার যে নূর-হিদায়াত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে-জারীর হযরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন :

هو المؤمن الذي جعل الله الايمان والقرآن في صدره فضرِبَ الله مثله فقال الله نور السماوات والارض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نور من امن به فكان ابي بن كعب يقرأها مثل نور من امن به -

অর্থাৎ-এটা সেই মু'মিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ইমান ও কোরআনের নূর-হিদায়াত রেখেছেন। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন

إِنَّ نَزْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ উবাই মَثْلُ نُورٍ অতঃপর মু'মিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন। ইবনে কা'ব এই আয়াতের কিরআতও মَثْلُ نُورٍ এর পরিবর্তে مَثْلُ نُورٍ مِنْ أَمْنٍ بِهِ পড়তেন। সাঈদ ইবনে জুবায়র এই কিরআত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর এই রেওয়াজে বর্ণনা করার পর লিখেছেন : مَثْلُ نُورٍ এর সর্বনাম দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু'রকম উক্তি আছে। এক, এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূরে-হিদায়াত, যা মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত এটা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি। দুই, সর্বনাম দ্বারা মু'মিনকেই বুঝানো হয়েছে। বাক্যের বর্ণনাধারা থেকে এই মু'মিন বুঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মু'মিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূরে হিদায়াতের দৃষ্টান্ত, যা মু'মিনের স্বভাবে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল রাখা নূরে-হিদায়াত যখন আল্লাহর ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহাবায়ে-কিরাম ও তাবেয়ীগণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মু'মিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবত এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মু'মিনই উপকার লাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূরে-হিদায়াত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মু'মিনের অন্তরেই রাখা হয় না ; বরং প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় স্বভাবে এই নূরে-হিদায়াত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাভর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যায় যত ভুলই করুক ; কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বহুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিশু ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ফিতরতের দাবি থেকে সরিয়ে ব্রাহ্ম পথে পরিচালিত করে। এই ফিতরতের অর্থ ঈমানের হিদায়াত। ঈমানের হিদায়াত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। এই নূরে হিদায়াতের কারণেই তার মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। যখন পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুকর্ম দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই शामिल। মু'মিন ও কাফিরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنْ يَشَاءِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয় ; বরং

এর সম্পর্ক কোরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের জন্য অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তাওফীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়। কবি বলেন :

إذا لم يكن عون من الله للفتى
فاول من يحبنى عليه اجتهاده

অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সাহায্য করা না হলে তার চেষ্টাই উল্টা তার জন্য ক্ষতিকর হয়।

নবী করীম (সা)-এর নূর : ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস কা'ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন : এই আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা'ব আহবার তওরাত ও ইনজীলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন : এটা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, زجاجة তথা কাচপাত্র মানে তাঁর পূত পবিত্র অন্তর এবং مصباح তথা প্রদীপ মানে নবুয়ত। এই নবুয়তরূপী-নূরের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্য আলো ও ঔজ্জ্বল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর নবুয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে 'এরহাসাত' বলা হয়। কেননা, 'মু'জিয়া' শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী বুঝাবার জন্য প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুয়তের দাবির সত্যতা প্রকাশ করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পরগল্পের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুয়ত দাবির পূর্বে এক ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তাকে নাম দেওয়া হয় 'এরহাসাত'। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী 'খাসায়েসে-কোবরা' গ্রন্থে, আবু নায়ীম 'দালায়েলে নবুয়ত' গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলিমও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। এ স্থলে তফসীরে মাযহারীতে অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তুন তৈলের বৈশিষ্ট্য : شَجَرَةٌ مَّبَارَكَةٌ زَيْتُونَةٌ এতে প্রমাণিত হয় যে, যয়তুন ও যয়তুন বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলিমগণ বলেন : আল্লাহ তা'আলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলো অন্যান্য তৈলের আলোর চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্য কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না—আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যয়তুন তৈল খাও এবং শরীরে মাশিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ।—(মাযহারী)

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ -

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৫৩

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে নিজের নূর-হিদায়াত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন : এই নূর দ্বারা সেই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মু'মিনের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, একুশ মু'মিনের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয়—সেইসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্য এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী **يَهْدِي اللَّهُ** এর সম্পর্ক **يَهْدِي** বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক **يُسَبِّحُ** উহা শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী **يُسَبِّحُ** শব্দটি। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলার নূর-হিদায়াত পাওয়ার স্থান সেইসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে মসজিদ।

মসজিদ : আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব : কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

من أحب الله عز وجل فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فانها افنية الله اذن الله في رفعها ورباك فيها ميمونة ميمون اهلها محفوظة محفوظة اهلها هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم هم في المساجد والله من ورائهم -

—যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবীগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবীগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও বরকতময় এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কযুক্তরাও বরকতময়। মসজিদও আল্লাহর হিফায়তে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহর হিফায়তে থাকে। যারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যোদ্ধার করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হিফায়ত করেন।—(কুরতুবী)

أَذْنُ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ এর অর্থ : **أَذْنُ** শব্দটি **أَذْنُ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ অনুমতি দেওয়া। **أَذْنُ** শব্দটি **رَفَعَ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেওয়ার

অটেল অর্থকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তাঁর খিলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিতকরণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানীর তিনগুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে যদি নাম-যশ ও খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরমা, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং সওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় কথীলত : আবু দাউদে হযরত আবু উমামার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি গৃহে ওয়ু করে ফরয নামাযের জন্য মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান, যে ইহরাম বেঁধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্য যায়। যে ব্যক্তি ইশরাকের নামায পড়ার জন্য গৃহ থেকে ওয়ু করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব উমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়ায়ীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুয়ায়দার রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যারা অন্ধকারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিবে দাও।—(মুসলিম)

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রার বাচনিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : পুরুষের নামায জামা'আতে আদায় করা গৃহে অথবা দোকানে নামায পড়ার চাইতে বিশ গুণেরও অধিক শ্রেষ্ঠ। এর কারণ এই যে, যখন কেউ উত্তমরূপে সুন্নাত অনুযায়ী ওয়ু করে, এরপর মসজিদে শুধু নামাযের নিয়তে যায়, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার মর্তবা একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। মসজিদে পৌছা পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে। এরপর যতক্ষণ জামা'আতের অপেক্ষায় বসে থাকবে, ততক্ষণ নামাযেরই সওয়াব পেতে থাকবে এবং ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে যে—ইয়া আল্লাহ, তার প্রতি রহমত নাযিল করুন এবং তাকে ক্ষমা করুন, যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং তার ওয়ু না ভাঙ্গে। হযরত হাকাম ইবনে ওমায়রের বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : দুনিয়াতে মেহমানের ন্যায় বসবাস কর এবং মসজিদকে নিজের গৃহ বানাও। অন্তরে নম্রতার অভ্যাস সৃষ্টি কর অর্থাৎ নম্রচিত্ত হও। আল্লাহ নিয়ামত সম্পর্কে প্রচুর চিন্তা-ভাবনা কর এবং (আল্লাহর ভয়ে) অধিক পরিমাণে ক্রন্দন কর। দুনিয়ার কামনা-বাসনা যেন তোমাকে এরূপ করে না দেয় যে, তুমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী গৃহাদি নির্মাণে মগ্ন হয়ে পড়, যেখানে বসবাসও করতে হয় না, প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ে মশগুল হয়ে পড় এবং ভবিষ্যতের জন্য এমন আজগুবী আশা পোষণ করতে থাক, যা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবু দারদা তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেন : তোমার গৃহ মসজিদ হওয়া উচিত। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে শুনেছি-মসজিদ মুতাকী লোকদের গৃহ। যে ব্যক্তি মসজিদকে (অধিক যিকির দ্বারা) নিজের গৃহ করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য আরাম, শান্তি ও পুলসিরাত সহজে অতিক্রম করার যিহাদার হয়ে যান। আবু সাদেক ইজদী শুয়াইব ইবনে হারহাবের নামে এক পত্র লিখেছেন : মসজিদকে আঁকড়ে থাক। আমি এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, মসজিদ পয়গম্বরগণের মজলিস ছিল।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : শেষ যমানায় এমন লোক হবে, যারা মসজিদে এসে স্থানে স্থানে বৃত্তাকারে বসে যাবে দুনিয়ার ও তার মহকুভের কথাবার্তা

বলবে। তোমরা এমন লোকদের সাথে উপবেশন করো না। কেননা, এ ধরনের মসজিদে আগমনকারীদের কোন প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নেই।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন : যে ব্যক্তি মসজিদে বসল, সে যেন তার পালনকর্তার মজলিসে বসল। কাজেই মুখ থেকে ভাল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বের না করা তার দায়িত্ব।—(কুরতুবী)

মসজিদের পনরটি আদব : আলিমগণ মসজিদের পনরটি আদব উল্লেখ করেছেন।

(১) মসজিদে পৌছে কিছু লোককে উপবিষ্ট দেখলে তাদেরকে সালাম করবে। যদি কেউ না থাকে, তবে **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ** বলবে। কিন্তু এটা তখন, যখন মসজিদের লোকগণ নফল নামায, তিলাওয়াতে-কোরআন, তসবীহ ইত্যাদিতে মশগুল না থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় সালাম করা দূরস্ত নয়। (২) মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দুই রাকাআত তাহিয়াতুল-মসজিদ নামায পড়বে। এটাও তখন, যখন সময়টি নামাযের জন্য মাকরুহ সময় না হয়: অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় না হওয়া। (৩) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় না করা। (৪) মসজিদে তীরতরবারি বের না করা। (৫) মসজিদে নিখোজ বস্তুর তত্ত্বাণী ঘোষণা না করা। (৬) মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা না বলা। (৭) মসজিদে দুনিয়াদারীর কথাবার্তা না বলা। (৮) মসজিদে বসার জায়গায় কারও সাথে ঝগড়া না করা। (৯) যেখানে কাতারে পুরোপুরি জায়গা নেই, সেখানে ঢুকে পড়ে অন্যকে অসুবিধায় না ফেলা। (১০) নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম না করা। (১১) মসজিদে খুথু ফেলা ও নাক সাফ করা থেকে বিরত থাকা। (১২) অঙ্গুলি না ফুটানো। (১৩) শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা। (১৪) নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা এবং শিশু ও উন্মাদ ব্যক্তিকে সঙ্গে না নেওয়া। (১৫) অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকা। কুরতুবী এই পনরটি আদব লিখার পর বলেন : যে এগুলো পালন করে, সে মসজিদের প্রাপ্ত পরিশোধ করে এবং মসজিদ তার জন্য হিফায়ত ও শান্তির জায়গা হয়ে যায়। বর্তমান তফসীরকার মসজিদের আদব-কায়দা ও এ প্রাসঙ্গিক আহকাম সম্বলিত 'আদাবুল মাসাজিদ' শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, প্রয়োজন বোধ করলে আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা দেখে নিতে পারেন।

যেসব গৃহ আল্লাহর যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তফসীরে-বাহুরে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন : কোরআনের **فِي بَيْوتٍ** শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বুঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়ায-নসিহত অথবা যিকরের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বুঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সন্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

اِنَّ শব্দের বিশেষ রহস্য : তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে **اِنَّ** শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে **امر** ও **حكم** শব্দের পরিবর্তে **اِنَّ** শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রুহুল মা'আনীতে এর একটি সূক্ষ্ম রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার সমুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

يُذَكِّرُ فِيهَا اسْتُ—এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহমীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামায, কোরআন তিলাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বুঝানো হয়েছে।

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ—যেসব মু'মিন আল্লাহ তা'আলার নূর-হিদায়াতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে رَجَالٌ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرَبِيَوْتِهِنَّ অর্থাৎ নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। আয়াতে সংকর্মপরায়ণ মু'মিনদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। বিক্রয়ও 'তিজারত' শব্দের মধ্যে দাখিল। তাই কোন কোন তফসীরবিদ মুকাবিলা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এখানে তিজারতের অর্থ ক্রয় এবং بَيْع শব্দের অর্থ বিক্রয় নিয়েছেন। কেউ কেউ তিজারতকে ব্যাপক অর্থই রেখেছেন অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর بَيْع কে পৃথকভাবে বর্ণনা করার রহস্য একরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য একটি বিস্তৃত অর্থবোধক শব্দ। এর উপকারিতা ও মুনাফা মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন পরে অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে কোন বস্তু বিক্রয় করার পর মুনাফাসহ মূল্য নগদ-উসূল করার উপকারিতা তাৎক্ষণিক। একে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকর ও নামাযের মুকাবিলায় মু'মিনগণ কোন বৃহত্তম পার্থিব উপকারের প্রতিও লক্ষ্য করে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন : এই আয়াত বাজারে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর পুত্র হযরত সালেম বলেন : একদিন আমার পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর নামাযের সময় বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে মসজিদের দিকে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন : এদের সম্পর্কেই কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়েছে :

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ-

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে দু'জন সাহাবী ছিলেন। একজন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন ও অপরজন কর্মকার ছিলেন এবং তরবারি নির্মাণ করে বিক্রয় করতেন। প্রথম সাহাবীর অবস্থা ছিল এই যে, সপ্তদা ওয়ন করার সময় আযানের শব্দ শ্রুতিগোচর হলে তিনি দাড়িপাল্লা ফেলে দিয়ে নামাযের জন্য ছুটে যেতেন। দ্বিতীয়জন এমন ছিলেন যে, উত্তম লোহায় হাতুড়ি মারার সময় আযানের শব্দ কানে আসলে যদি হাতুড়ি কাঁধ বরাবর উত্তোলিত থাকত, তবে কাঁদের পেছনে হাতুড়ি ফেলে দিয়ে নামাযে রওয়ানা হয়ে যেতেন। উত্তোলিত হাতুড়ি মারার কাজ সেরে নেওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁদের প্রশংসায়ই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। —(কুরতুবী)

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন : এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের বেশির ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে

বাজারেই অবস্থান করতে হতো। কেননা, আল্লাহর স্বরণে ব্যবসা-বাণিজ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে।—(রহুল মা'আনী)

يَخْفَى يَوْمًا تَنْقَلِبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ এটা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত মু'মিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর যিকর, আনুগত্য ও ইবাদতে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্যও হয়ে যায় না; বরং কিয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নূরে হিদায়াতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ শুধু কর্মের প্রতিদানই শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নিয়ামতও দান করবেন।

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাগ্যের কোন সীমার অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিমিত ক্রমী দান করবেন। এ পর্যন্ত যেসব সংকল্পপরায়ণ মু'মিনের বক্ষ নূরে হিদায়াতের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূরে-হিদায়াতকে গ্রহণ করে, সেই সব মু'মিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর সেই সব-কাফিরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ তা'আলা নূরে-হিদায়াতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু তখন এই উপকরণকে শুদ্ধল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছান না, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফির ও অস্বীকারকারী—এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাই দু'টি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। বিশদ বিমূর্তন তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। উভয় দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে : وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিররা নূরে-হিদায়াত থেকে বঞ্চিত। তারা আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। আল্লাহর নূর কোথায় পাবে ?

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা নিরেট আল্লাহর দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও প্রেতবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অজ্ঞ জ্ঞানী ও চক্ষুমান হয়ে থাকে। এমনভাবে এক-বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে বেওকুফ ও মূর্খ হয়ে থাকে।—(মাযহারী)

الْمُرُّ أَنَّ اللَّهَ يَسِيحُ لَهُ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَلِيلُ صَفِيَّتْ كُلِّ قَدِّ
عِلْمِ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ⑧ وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ه وَالِلَّهِ الصِّصِيرُ ⑨ الْم تَرَانِ اللَّهُ يَرْجِي سَحَابَاتُكُمْ يُوَفِّ بَيْنَهُ ثُمَّ

সূরা ফুরকান

৬১-৭৭ আয়াত

উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে (শক্তিরূপে) আঁকড়ে না থাকতাম। (অর্থাৎ আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ তা'আলা এর খণ্ডন করে বলেন, জালিমরা এখন তো নিজেদেরকে পথপ্রাপ্ত এবং আমার পয়গম্বরকে পথভ্রষ্ট বলছে, মৃত্যুর পর) যখন তারা শান্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে পথভ্রষ্ট ছিল, (তারা নিজেরা না পয়গম্বর? এতে তাদের অনর্থক আপত্তির জওয়াবের দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবুয়ত ও ধনাঢ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। ধনাঢ্য না হওয়ার কারণে নবুয়ত অস্বীকার করা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দুনিয়াতে মনে যা ইচ্ছা হয় করুক, পরকালে স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যাবে)। হে পয়গম্বর, আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থাও দেখেছেন, যে তার উপাস্য করেছে তার প্রবৃত্তিকে? অতএব আপনি কি তার দায়িত্ব নিতে পারেন? অথবা কি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বুঝে?) (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের হিদায়াত না পাওয়ার কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনি এ জন্যে আদিষ্ট নন যে, তারা চাক বা না চাক, আপনি তাদেরকে সৎপথে আনবেনই। তাদের কাছ থেকে হিদায়াত আশাও করবেন না। কারণ তারা সত্য কথা শোনে না এবং বুঝেও না;) তারা তো চতুর্ঙ্গদ জন্তুর ন্যায়, (চতুর্ঙ্গদ জন্তু কথা শোনে না এবং বুঝেও না) বরং তারা আরও পথভ্রষ্ট। (কারণ, চতুর্ঙ্গদ জন্তু ধর্মের আদেশ-নিষেধের আওতাধীন নয়; কাজেই তাদের না বুঝা নিন্দনীয় নয় কিন্তু তারা এর আওতাধীন। এরপরও তারা বুঝে না। এছাড়া চতুর্ঙ্গদ জন্তু ধর্মের জরুরী বিষয়সমূহে বিশ্বাসী না হলেও অবিশ্বাসীও তো নয়: কিন্তু তারা অবিশ্বাসী। আয়াতে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন প্রমাণ ও সন্দেহ নয়, বরং প্রবৃত্তির অনুসরণই এর কারণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নূহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রাসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রাসূলকে মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আ)-কে মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরের অভিন্ন, তাই একজনকে মিথ্যারোপ করাও সবাইকে মিথ্যারোপ করার শামিল।

أَصْحَابُ الرَّسْرِ — অভিধানে رَس শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। কোরআন পাক ও কোন সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লিখিত হয়নি। ইসরাইলী রেওয়াজে বিভিন্ন রূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামুদ্র গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কূপের ধারে বাস করত। (কামুস, দূররে মনসূর) তাদের শান্তি কি ছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ হাদীস বিবৃত হয়নি।—(বয়ানুল কোরআন)

শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা : أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا مَّا هُوَ এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তিয়ার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন। —(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ؕ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ؕ ثُمَّ جَعَلْنَا
 الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ (৪৫) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝ (৪৬) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ
 لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالتُّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝ (৪৭) وَهُوَ الَّذِي
 أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ (৪৮)
 لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا ۝ (৪৯)
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ؕ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ (৫০) وَلَوْ
 شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ۝ (৫১) فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ
 بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝ (৫২) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُورًا وَهَذَا أَمْلَحٌ
 أُجَابٌ ؕ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝ (৫৩) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ
 الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝ (৫৪) وَيَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ
 رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝ (৫৫) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ (৫৬) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ (৫৭) وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ
 الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ؕ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝ (৫৮)
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
 الْعَرْشِ ؕ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ۝ (৫৯) وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ

قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجِدُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِنُفُورٍ ۖ ﴿٥٠﴾ تَبَرَّكَ الَّذِي
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۖ ﴿٥١﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۖ ﴿٥٢﴾

(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে সৃষ্টি করেন ? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিধায়ক এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্য। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাকালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তা দ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা শ্রবণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিষাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (৫৫) তারা ইবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার প্রতি গৃহপ্রদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না ; কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) আপনি সেই চিরজীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার ওমাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (৫৯) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্ত সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাঁকে জিজ্ঞেস কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে ? তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব ? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও ঔজ্জ্বল্যময় চন্দ্র। (৬২) যারা

অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি কি তোমার পালনকর্তার (এই কুদরতের) দিকে দেখনি যে, তিনি (যখন সূর্য উদিত হয়, তখন দণ্ডায়মান বস্তুর) ছায়াকে কিভাবে (দূর পর্যন্ত) বিস্তৃত করেন ? (কেননা, সূর্যোদয়ের সময় প্রত্যেক বস্তুর ছায়া লম্বা হয়।) তিনি ইচ্ছা করলে একে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন (অর্থাৎ সূর্য উপরে উঠলেও ছায়া ভ্রাস পেত না এভাবে যে, সূর্যের কিরণ এত দূরে আসতে দিতেন না। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছার কারণেই সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে পৌঁছে ; কিন্তু আমি রহস্যের কারণে একে এক অবস্থায় রাখিনি ; বরং বিস্তৃতিশীল রেখেছি।) অতঃপর আমি সূর্যকে (অর্থাৎ সূর্য দিগন্তের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী হওয়াকে) এর (অর্থাৎ ছায়ার বড় ও ছোট হওয়ার) উপর (একটি বাহ্যিক) আলামত করেছি। (উদ্দেশ্য এই যে, আলো ও ছায়া এবং এদের ভ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, সূর্য কিংবা অন্য কোন কিছু সত্যিকার নিয়ন্ত্রক নয় ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সৃষ্টি বিষয়সমূহের জন্যে কিছু বাহ্যিক কারণ বানিয়ে দিয়েছেন এবং কারণের সাথে তার ঘটনার এমন ওতপ্রোত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, কারণের পরিবর্তনে ঘটনার মধ্যেও পরিবর্তন হয়।) এরপর (এই বাহ্যিক সম্পর্কের কারণে) আমি একে (অর্থাৎ ছায়াকে) নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (অর্থাৎ সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে, ছায়া ততই নিঃশেষিত হতে থাকে। যেহেতু অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল আল্লাহর কুদরতেই ছায়া অদৃশ্য হয় এবং সাধারণ লোকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর জ্ঞানে অদৃশ্য নয়, তাই “নিজের দিকে গুটিয়ে আনি” বলা হয়েছে।) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে আবরণ ও নিদ্রাকে বিশ্রাম করেছেন এবং দিনকে (নিদ্রা মৃত্যুর মত এবং দিবা জাগ্রত হওয়ার সময়—এদিক দিয়ে যেন) জীবিত হওয়ার সময় করেছেন। তিনিই স্বীয় রহমত বৃষ্টির প্রাক্কালে বাতাস প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির আশা সঞ্চারণ করে অন্তরকে) আনন্দিত করে। আমি আকাশ থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বর্ষণ করি, যাতে তা দ্বারা মৃত ভূ-ভাগকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্ট অনেক জীবজন্তু ও মানুষকে পান করাই। আমি তা (অর্থাৎ পানি উপযোগীতা পরিমাণে) মানুষের মধ্যে বিতরণ করি, যাতে তারা চিন্তা করে (যে, এসব কর্ম কোন সর্বশক্তিমানের, তিনিই ইবাদতের যোগ্য)। অতএব (চিন্তা করে তাঁর ইবাদত করা উচিত ছিল ; কিন্তু) অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা না করে রইল না। (এর মধ্যে সর্ববৃহৎ অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে কুফর ও শিরক। কিন্তু আপনি তাদের, বিশেষ করে অধিকাংশের অকৃতজ্ঞতা শুনে অথবা দেখে ধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে না। আপনি একাই কাজ করে যান। কেননা, আপনাকে একা নবী করার উদ্দেশ্য আপনার পুরস্কার ও নৈকট্য বৃদ্ধি করা।) আমি ইচ্ছা করলে (আপনাকে ছাড়া এ সময়েই) প্রত্যেক জনপদে একজন পয়গম্বর প্রেরণ

করতে পারতাম (এবং একা আপনাকে সব দায়িত্ব অর্পণ করতাম না ; কিন্তু যেহেতু আপনার পুরস্কার বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য, তাই আমি এরূপ করিনি। এভাবে আপনার দায়িত্বে বেশি কাজ অর্পণ করাও আল্লাহর নিয়ামত)। অতএব (এই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতায়) আপনি কাফিরদের আনন্দিত হওয়ার মত কাজ করবেন না। (অর্থাৎ আপনি প্রচার কার্য ছেড়ে দিলে কিংবা কম করলে এবং তাদেরকে কিছু না বললে তারা আনন্দিত হবে) এবং কোরআন দ্বারা (অর্থাৎ কোরআনে যেসব প্রমাণ উল্লিখিত আছে, যেমন এখানেই তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারা) তাদের বিরুদ্ধে জোরেশোরে সংগ্রাম চালিয়ে যান। (অর্থাৎ ব্যাপক ও পরিপূর্ণ প্রচারকার্য চালান, সবাইকে বলুন, বারবার বলুন এবং মনে অটুট বল রাখুন। এ পর্যন্ত যেমন করে এসেছেন, তা অব্যাহত রাখুন। এরপর আবার তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা করা হচ্ছে।) তিনিই দুই সমুদ্র মিলিত করেছেন, একটির পানি মিষ্টি, তৃপ্তিদায়ক এবং একটির পানি লোনা, বিষাদ এবং দেখার মধ্যে পরস্পর মিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে) উভয়ের মাঝখানে (দ্বীপ কুদরত দ্বারা) একটি অন্তরায় ও (সত্যিকারভাবে মিশে যাওয়া রোধ করার জন্যে) একটি দুর্ভেদ্য আড়াল রেখেছেন (যা স্বয়ং প্রকাশ্য ও অনুভূত নয় ; কিন্তু তার প্রভাব অর্থাৎ উভয় পানির স্বাদের পার্থক্য অনুভূত ও প্রত্যক্ষ। এখানে 'দুই সমুদ্র' বলে এমন স্থান বুঝানো হয়েছে, যেখানে মিঠাপানির নদী ও নহর প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়। এরূপ স্থানে পানির পৃষ্ঠদেশ এক মনে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর কুদরতে নদী ও সমুদ্রের মাঝখানে একটি ব্যবধান থাকে। ফলে সঙ্গমস্থলের একদিকের পানি মিষ্টি এবং নিকটবর্তী অপরদিকের পানি লোনা হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যেখানে মিঠা পানির নদী-নালা সমুদ্রের পানিতে পতিত হয়, সেখানে দেখা যায় যে, কয়েক মাইল পর্যন্ত মিষ্টি ও লোনা পানি আলাদা-আলাদা প্রবাহিত হয়। ডানদিকে মিঠা পানি এবং বামদিকে লোনা ও তিক্ত পানি অথবা উপরে নিচে মিঠা ও তিক্ত পানি আলাদা আলাদা দেখা যায়। মাওলানা শাকীর আহমদ উসমানী এই আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, বয়ানুল কোরআনে দুইজন নির্ভরযোগ্য বাংলা ভাষী আলিমের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আরাকান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নদীর দুই দিকে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা দু'টি নদী দৃষ্টিগোচর হয়। একটির পানি সাদা এ অপরটির পানি কালো। কালো পানিতে সমুদ্রের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় এবং সাদা পানি স্থির থাকে। সাম্পান সাদা পানিতে চলে। উভয়ের মাঝখানে একটি স্রোতরেখা দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে ; এটা উভয়ের সঙ্গমস্থল। জনশ্রুতি এই যে, সাদা পানি মিষ্টি এবং কালো পানি লোনা। আমরা কাছে বরিশালের জৈনক ছাত্র বর্ণনা করেছে যে, বরিশাল জেলায় একই সাগর থেকে নির্গত দু'টি নদীর মধ্যে একটির পানি লোনা ও তিক্ত এবং অপরটি পানি মিষ্টি ও সুস্বাদু। আমি গুজরাটে আজকাল যে স্থানে অবস্থানরত আছি (ডাভেল, জেলা সুরাট) সমুদ্র এখান থেকে প্রায় দশ-বার মাইল দূরে অবস্থিত। এ অঞ্চলের নদীগুলোতে সব সময় জোয়ার ভাটা হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য লোকের বর্ণনা এই যে, জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের পানি নদীতে প্রবেশ করে, তখন মিঠা পানির উপরিভাগে

লোনা পানি সবেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু তখনও উভয় পানি পরস্পর মিশে যায় না। উপরে লোনা পানি থাকে এবং নিচে মিঠা পানি। ভাটার সময় উপর থেকে লোনা পানি সরে যায় এবং মিঠা পানি যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। وَاللَّهُ أَعْلَمُ, এসব সাক্ষ্য প্রমাণদৃষ্টে আয়াতের উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়। অর্থাৎ আল্লাহর কুদরত দেখুন, লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়ার পানি কোথাও না কোথাও একাকার হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে একটি অপরটি থেকে পৃথক থাকে! তিনিই পানি থেকে (অর্থাৎ বীৰ্য থেকে) মানব সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কশীল করেছেন (সে মতে বাপ, দাদা ইত্যাদি শরীয়তগত বংশ এবং মা, নানী ইত্যাদি প্রচলিত বংশ। জন্মের সাথে সাথেই তাদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর বিবাহের পর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এটাও কুদরতের প্রমাণ যে, আল্লাহ বীৰ্যকে কিরূপে রক্তবিশিষ্ট করে দেন এবং এটা নিয়ামতও; কারণ এসব সম্পর্কের উপরই মানব সভ্যতার বিকাশ ও পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে। হে সচেতিত ব্যক্তি) তোমার পালনকর্তা সর্বশক্তিমান। (আল্লাহর পরিপূর্ণ সম্ভা ও গুণাবলী দৃষ্টে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত ছিল; কিন্তু) তারা (মুশরিকরা) আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুই ইবাদত করে, যা (ইবাদত করার কারণে) তাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং (ইবাদত না করলে) কোন অপকারও করতে পারে না। কাফির তো তার পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকারী। (কারণ, তারা তাঁর পরিবর্তে অন্যের ইবাদত করে। কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ জ্ঞাত হয়ে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আমি আপনাকে কেবল (মু'মিনদেরকে আল্লাতের) সুসংবাদদাতা এবং (কাফিরদেরকে দোষখ থেকে) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (তারা বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনার কি ক্ষতি? আপনি তাদের বিরোধিতা জেনে এরূপ চিন্তাও করবেন না যে, তারা যখন আল্লাহর বিরোধী তখন আল্লাহর দিকে আমার দাওয়াতকে তারা হিত-কামনা মনে করবে না : বরং তারা আমার স্বার্থপরতা ভেবে এদিকে ফ্রক্কেপও করবে না। অতএব অন্তরায় দূর করার জন্য তাদের ধারণা কিরূপে সংশোধন করা যায়? সুতরাং তাদের এই ধারণা যদি আপনি ইশারা ইঙ্গিতে কিংবা মৌখিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারেন, তবে) আপনি (জওয়াবে এডটুকু) বলে দিন (এবং নিশ্চিত হয়ে যান) যে, আমি তোমাদের কাছে এর জন্য (অর্থাৎ প্রচারকার্যের জন্য) কোন (অর্থগত কিংবা প্রভাব প্রতিপত্তিগত) বিনিময় চাই না। তবে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দিকে (পৌছার) রাস্তা অবলম্বন করার ইচ্ছা করে, (আমি অবশ্যই তা চাই। একে তোমরা বিনিময় বল কিংবা না বল। কাফিরদের বিরোধিতার কথা জেনে আপনি তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টেরও আশংকা করবেন না; বরং প্রচারকার্যে) সেই চিরজীবের উপর ভরসা করুন, যার যত্ন নেই এবং নিশ্চিন্তে তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন। (কাফিরদের দ্বারা অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এই আশংকায় তাদের জন্য দ্রুত শান্তি কামনা করবেন না। কেননা,) তিনি (আল্লাহ) বান্দার গুনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। [তিনি যখন উপযুক্ত মনে করবেন, শান্তি দেবেন। সুতরাং উপরোক্ত কয়েকটি বাক্য দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনোকষ্ট ও চিন্তা দূর করা হয়েছে।

অতঃপর আবার তাওহীদ বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (—যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ এভাবে) সমাসীন (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর জন্য উপযুক্ত ; এ সম্পর্কে সূরা আ'রাফের সপ্তম রুকূর গুরুত্ব আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে)। তিনি পরম দয়াময়, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত, তাঁকে জিজ্ঞেস কর (যে তিনি কিরূপ ? কাকির ও মুশরিকরা কি জানে)। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবেই তারা শিরক করে ; যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا فَسَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَوْلِهِ (ফসরু) তাদেরকে (কাকিরদেরকে) বলা হয়, রহমানকে সিজদা কর, তখন (মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে) তারা বলে, রহমান আবার কে ? (যার সামনে আমাদেরকে সিজদা করতে বলছে ?) তুমি কাউকে সিজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা তাকে সিজদা করব ? এতে তাদের বিরাগ আরো বৃদ্ধি পায়। (রহমান শব্দটি তাদের মধ্যে কম প্রচলিত ছিল ; কিন্তু জানত না, এমন নয়। তবে ইসলামী শিক্ষার সাথে যে তাদের তীব্র বিরোধ ছিল, তা বাচনভঙ্গি ও কথাবার্তায়ও তারা সযত্নে ফুটিয়ে তুলত। ফলে কোরআনে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দটিরও তারা বিরোধিতা করে বসে।) কত মহান তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে বৃহদাকারের নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন এবং (এগুলোর মধ্যে দুইটি বৃহৎ উজ্জ্বল ও উপকারী নক্ষত্র অর্থাৎ) তাতে (আকাশে) এক প্রদীপ (মানে সূর্য) এবং এক আলোকিত চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সম্ভবত প্রখরতার কারণে সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে।) তিনি রাত্রি ও দিনকে একে অপরের পশ্চাৎগামী করে সৃষ্টি করেছেন (তাওহীদের এসব প্রমাণ ও আল্লাহর নিয়ামতসমূহের বর্ণনা) সেই ব্যক্তির (মুঝার) জন্য, যে বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। কারণ, এতে সমঝদারের দৃষ্টিতে প্রমাণাদি আছে এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে নিয়ামত বর্তমান। নজুবা

اگر صدياب حکمت پیش نادران
بخوانی آیدش بازیچه درگوش

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কারণ ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক এবং সবগুলোই আল্লাহর কুদরতের অধীন : উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বান্দার প্রতি তাঁর নিয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদও প্রমাণিত হয়।

رَوَدُّهُ وَحَافَا দুইটি এমন নিয়ামত, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রোদ্রই রোদ্র থাকলে মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য যে কি ভীষণ বিপদ হতো, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে রোদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজও এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নিয়ামতদ্বয় সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্য আয়াম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুর সমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬০

করে, তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ শক্তিশালী কিংবা বেশি হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশি হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে; আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তার প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র তফাৎ দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও দৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অংক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেওয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাটা প্রমাণ। ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর স্রষ্টা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও আল্লাহর কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোলা এবং তীক্ষ্ণকর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বাণীই বিধৃত হয়েছে। **الْمَنْ تَرَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ الطَّلُ** আয়াতে গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লব্ধমান থাকে, এরপর আন্তে আন্তে ভ্রাস পেয়ে দ্বিপ্রহরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আন্তে আন্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এ জন্য অন্তর্দৃষ্টি ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে এই অন্তর্দৃষ্টি দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার ভ্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অত্যাশ্চর্য করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়ম রাখল? যার সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্রছায়ার নিয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র; সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত। এবং যেখানে ছায়া, সেখানে

সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি। وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاءً। এর অর্থ তাই।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্য ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও ত্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে : فَخَنَّاۙ اِنَّا فَيۡضًا يُّسَيِّرُۙ অর্থাৎ অতঃপর ছায়াকে আমি নিজের দিকে গুটিয়ে নেই। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বময় ক্ষমতা দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্যে নির্ধারণ করার মধ্যেও রহস্য নিহিত আছে : وَمَا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّيۡلَ يَاسَآ وَالنَّوۡمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ تُشُورًا আয়াতে রাত্রিকে 'লেবাস' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানবদেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতের উপর ফেলে দেয়া হয়। سُبَاتٌ শব্দটি سَبَتَ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। سَبَات এমন বস্তু, যদ্বারা অন্য বস্তুকে ছিন্ন করা হয়। নিদ্রাকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই سَبَات এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরাম, বরং আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে ; কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত চক্কু খুলে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্নও করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনিভাবে রাত্রি একটি নিয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নিয়ামত। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, সারা বিশ্বের মানুষ জীবজন্তুর নিদ্রা একই সময়ে রাত্রে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হট্টগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনিভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হতো। কারণ, যে ব্যক্তির সাথে আপনার কাজ ; তখন তার নিদ্রার সময় এবং যখন তার আগরণের সময় হবে, তখন আপনার নিদ্রার সময় এসে যাবে।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হতো যে, সবাইকে নিদ্রার জন্যে একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমত এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, তা তদারক করার জন্য হাজারো বিভাগ খুলতে হতো। এতদসঙ্গেও সাধারণ আইন ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিৱীকৃত বিষয়াদিতে ঘুষ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হতো।

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্য আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে। **مَنْ بَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ**

বাক্যে দিনকে **نشور** অর্থাৎ জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানবমণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাতে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হতো।

রাতকে নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যও এমনি এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণত সকাল সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্টোরাঁ এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক গৃহে খাওয়া-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্য এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

وَإِنزَالِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا শব্দটি আরবী ভাষায় অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে **طهور** বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তা দ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তা দ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণত আকাশ থেকে কোন সময় বৃষ্টির আকারে ও কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ-লাইনের আকারে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি ঝরনার আকারে নির্গত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

পর্যাপ্ত পানি—যেমন পুকুর হাউস ও নহরের পানিতে কোন অপবিত্রতা পতিত হলেও তা অপবিত্র হয় না। এ ব্যাপারেও সবাই একমত, যদি তাতে অপবিত্রতার চিহ্ন প্রকাশ না পায় এবং রং, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হয়। কিন্তু অল্প পানিতে অপবিত্রতা পতিত হলে তা অপবিত্র হবে কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এমনিভাবে পর্যাপ্ত ও অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণেও বিভিন্নরূপ উক্তি আছে। তফসীর মাযহরী ও কুরতুবীতে এ স্থলে পানি সম্পর্কিত সমস্ত মাস'আলা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে। ফিকাহর সাধারণ কিতাবাদিতেও এসব মাস'আলা উল্লিখিত আছে। তাই এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

وَنُفِثَ بِمَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْسَى كَثِيرًا — انসী শব্দটি এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, انسان — এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, জীবজন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে ‘অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি’ বলার কারণ কি? এতে তো বুঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত আছে। উত্তর এই যে, এখানে ‘অনেক মানুষ’ বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা সাধারণত বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা তো নহরের কিনারায় কূপের ধারে কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

وَلَقَدْ مَرْفُئًا بَيْنَهُمْ — আয়াতের বক্তব্য এই যে, আমি বৃষ্টিকে মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশি, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতি বছর আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশি করে দেওয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দেওয়া ও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আঘাত হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অকৃতজ্ঞ ও নাফরমানদের জন্য আঘাত ও শাস্তি করে দেওয়া হয়।

কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ : وَجَاهِدْهُمْ بِمَا جِهَادًا كَبِيرًا — এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। তখন পর্যন্ত কাফিরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জিহাদকে অর্থ কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জিহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থাৎ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্য হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক এখানে সবগুলোকেই বড় জিহাদ বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجُجْرًا مُجْجَرًا — মার্জ শব্দের অর্থ স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া। এ কারণেই চারণভূমিকে مَرْج বলা হয়, সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। مِلْح মিঠা পানিকে বলা হয়। فُرَات এর অর্থ সুপেয় مِلْح এর অর্থ লোনা এবং أُجَاج এর অর্থ তিক্ত বিষাদ।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কৃপা ও অপার রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। এক, সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের চতুর্দিক এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানব সমাজ

বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়্যার পানি রহস্যবশত তীব্র লোনা ও বিষাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝরনা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়্যা আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের ভক্ষানিবারণ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তা'আলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারের সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশি সামুদ্রিক মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা ও অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হতো, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু'চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তারাও পচতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত, এই নিয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা দুই প্রকার দরিয়্যা সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয়, এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পরে মিশ্রিত হয় না অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا — পিতামাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয় তাকে نسب বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয় তাকে صِهْر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্য এগুলো অপরিহার্য। কারণ, একা মানুষ কোন কাজ করতে পারে না।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا — অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌঁছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্য চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোন উপকার নেই যে, যার মনে চায়, সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে, বলা বাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের উপকার মনে করি। এর উদাহরণ যেমন কোন বৃদ্ধ দুর্বল পিতা তার সন্তানকে বলে, তুমি খাও পান কর ও সুখে থাক—এটাই আমার খাওয়া, পান করা ও সুখে থাকা। একে নিজের উপকার বলার কারণ এরূপও হতে পারে যে, এর সওয়াব তিনিও পাবেন; যেমন সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি অন্যকে সং কাজের নির্দেশ দেয় এবং সে তার নির্দেশ মোতাবেক সংকাজ করে, এই সংকাজের সওয়াব কর্মী নিজেও পুরোপুরি পাবে এবং যে নির্দেশ দেয়, সেও পাবে।—(মাযহারী)

www.pathagar.com

সেগুলোতে অধিকাংশ তফসীরবিদ **سماء** শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী **سماء** শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক—উভয় অর্থের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাঞ্জি হিসেবে **في السماء** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাটা ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সাব্যস্ত করেছে অথবা আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে। বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন : এখানে নীতিগতভাবে এ কথা বুঝে নেওয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্শ্বিক উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণত কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিশ্বয়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এই বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিদয়। এই বিশ্বাসের জন্য আকাশমণ্ডলীর শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কল্পনাকালেও জরুরী নয়। বরং এর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখে এবং বুঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের দ্রাব্যবৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির দ্রাব্যবৃদ্ধির বিশ্বয়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয়নি—এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজ্ঞানোচিত ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি চলমান নয়; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বুঝার জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানায়নি। কোরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তাভাবনারই দাওয়াত দেয়, ইয়া সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রাসূলে করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি তৈরি মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬১

করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি উদ্ভাবন করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তাভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হতো, তবে এর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল; বিশেষত যখন এসব জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালে বিদ্যমানও ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত ও এগুলো নিয়ে গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আ)-এর খ্রীষ্টানত বহুর পূর্বে কিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেংলীমুসের মতবাদ বিধে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এ দিকে জরফৎ করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার উদ্দেশ্য কব্বিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতান্ত্রিয় আলিমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণাকার্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞানোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা ও গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনার মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনযিলে-মকসুদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে স্রষ্টার ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্য সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের মতবাদে গুরুত্বের মতানৈক্য এবং প্রাত্যহিক নব নব আবিষ্কার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগৎ, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মৎসলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগৎ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্ধারিত ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্বারা মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক

তথ্যানুসন্ধানের পদ্ধতি নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাস'আলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যপন্থী আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়। বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই ; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে ; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যেমন আলোচ্য আয়াত جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে কিশাগোসীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক কিশাগোস বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীন বেষ্টনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষণে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয় ; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী এ কথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবি করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব ; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবি ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবির কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না ; বরং দাবিকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে।

এমনিভাবে কোরআন পাকের كل في ذلك يسبحون আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ করুপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেংলীমুসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাঙ্গে প্রোথিত আছে। তারা নিজেরা গতিশীল নয় ; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগৎ সম্পর্কে বেংলীমুসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন তারা কোরআনের সেই সব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেংলীমুসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বুঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের আনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা

করেন। এই উভয় পন্থা অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুন্নাহের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ক্রটিবশত এগুলোকে কোরআন ও সুন্নাহের খেলাফ মনে করে সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদীর তফসীরে রুহুল মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুন্নাহ গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন ও সৌরবিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোক্তিত্বিত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আব্বাস সাইয়েদ মাহমুদ শুকরী আলুসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থের নাম *اماد على القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان* এই গ্রন্থে কোরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলিমের ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সদর্থের আশ্রয় নেওয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন :

رأيت كثيرا من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة على انها لو خالفت شيئا من ذلك لم يلتفت اليها ولم تؤول النصوص لاجلها والتاويل فيها ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول بل لابدان نقول ان المخالف لها مشتمل على خلل فيه فان العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل كل منهما يصدق الآخر ويؤيده -

আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতিনীতিকে কোরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নাহর সদর্থ করব না। কেননা, এরূপ সদর্থ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী, তাতে কোন না কোন ত্রুটি আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না ; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।

সারকথা এই যে, সৌরজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর ক্রুতোনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা

দিতেন। তাঁর পর খ্রিস্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেংলীমুস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর একজন দার্শনিক হেয়ারথোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেংলীমুসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেংলীমুস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মুকাবিলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেংলীমুসের মতবাদই আরবী প্রত্নাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পরিচিতি লাভ করে। অনেক তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিকাস, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেংলীমুসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরও শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্য ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেংলীমুসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মহাকর্ষের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নিচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মহাকর্ষের প্রভাববলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নিচে পতিত হবে না।

আধুনা সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবু রায়হান আলবেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করে এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নিচে পতিত হয় না, বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করে তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্রে পদার্পণ করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সংগ্রহের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিক্রমার ও পরিমাপের অনুশীলনী চালু আছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন প্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি

আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক 'সায়রবীন'-এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হলো। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন প্লেন তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং এ কথা বুঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন : এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্ব থেকেই যে জ্বিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদুপরি আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন :

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহারও সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জন্য একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনেও পারি না এবং তার স্বাধীন নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বুঝতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে।

অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন :

খ্রিস্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জ্ঞানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজ্ঞানীদের লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকর্ষ আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মুকাবিলায় যৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়, বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। একথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত

পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারকতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখো মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্র গ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারিগণও স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে : মানুষের ছেট্টা-সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিশ্বয়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্য; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐন্দ্রজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি-অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য যথেষ্ট হতো, তার বহুংসব করে এবং চন্দ্র পর্যন্ত পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে : বিপুল সংখ্যক মানব এখনও ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোন সামাধান দিতে পেরেছে কি : অথবা তাদের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি : অথবা তাদের জন্য অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোন উপকরণ সংগ্রহ করেছে কি : নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে ‘না’ ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কোরআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্ফল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু’টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্ট জগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাশ্চর্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক তাঁরই নাম আল্লাহ। দ্বিতীয়, আল্লাহ তা‘আলা মানুষের উপকারের জন্য পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাগর থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেটানোর জন্য—কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এই দু’টি দিকই মানুষের জন্য যেমন সহজ, তেমনি কলগ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কোরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজ্জীত তাঁর গ্রন্থ ‘তওফীকুর রহমান’-এ সৌরবিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগ গুণগত, যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয় ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগৎ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার আকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের ঘোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কোরআন, সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পরগণনগণও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের উপদেশ এই যে :

زبان تازه کردن باقرارتو — نیشگیختن عنق از کثرتو

মিন্দস বসে জোঁরা রারাজশাদ — নোৱার ক্জোদ কর্দী আগার শাদ

সুফী বুয়ুর্গগণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এসব বস্তু দেখেন। অবশেষে তাঁদের ফয়সালাও তাই, যা শায়খ সাদী ব্যক্ত করেছেন :

چه شبها نشستیم درین سیرکم — که حیرت گرفت استینم کهقم
হাকেম শিরাজী নিজের সুরে বলেছেন :

سخن از مطرب ومی گوئی ورازد هرکمترجو

که کس نکشود و نکشاید بحکمت این معمار

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব, তাওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগৎ, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ছব্ব কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যত্রতত্র এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এ দিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করাও কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকর্ষিত নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে ; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কোরআন তাতে জীবনপাত করা থেকে বিরত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরও বুঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যানুসন্ধানকে ছব্ব কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছু সংখ্যক আধুনিকপন্থী আলিম তাই মনে করেন। এমনভাবে কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছু সংখ্যক রক্ষণশীল আলিম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্য আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্য এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা গুহ্ম নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেওয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা নয়।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ۚ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ
 قَالُوْا سَلٰمًا ۖ وَالَّذِيْنَ يَبْدُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۖ ۝۵۸
 وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ ۝۵۹ اِنَّهَا
 سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ۖ ۝۶۰ وَالَّذِيْنَ اِذَا انْفَقُوا الْمَرْسِيْرُ فَاَوْكَمُوْا وَلَمْ
 يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَومًا ۖ ۝۶۱ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ
 اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اِثْمًا ۖ ۝۶۲ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
 وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهْلِكًا ۖ ۝۶۳ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا ۚ فَاُولٰٓئِكَ
 يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۖ ۝۶۴ وَمَنْ تَابَ
 وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۖ ۝۶۵ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ
 الزُّوْرَ لَا وَاٰمُرُوْا بِاللّٰغُوْمُرُوْا اِكْرَامًا ۖ ۝۶۶ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ
 لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَعِيْمًا ۖ ۝۶۷ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
 اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لِّلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ۖ ۝۶۸ اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ
 الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا مَخِيْمَةً وَّسَلٰمًا ۖ ۝۶۹ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ حَسَنَتْ
 مُّسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ۖ ۝۷۰ قُلْ مَا يَعْجَبُوْا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۚ فَقَدْ
 كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ۖ ۝۷۱

(৬৩) 'রহমান'-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাঘনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে ; (৬৫) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কত নিকট জায়গা ! (৬৭) এবং যারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পছন্দ হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (৬৮) এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্রমান্বীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে তওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে কিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন আসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বুঝানো হলে তাতে অঙ্ক ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের জ্বীদের পক্ষ থেকে আমাদের সম্মানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান এবং আমাদেরকে যুগ্মকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা কত উত্তম ! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্ত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

'রহমান'-এর (বিশেষ) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মজ্জায় সব ব্যাপারেই নম্রতা আছে এবং তারই প্রতিক্রিয়া চলাফেরার মধ্যেও প্রকাশ পায়। এখানে শুধু চলাফেরার অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, অহংকারসহ নম্র চলা প্রশংসনীয় নয়। তাদের এই বিনয় নম্রতা তাদের নিজেদের কাজকর্মে) এবং (অপরের সাথে তাদের ব্যবহার এই যে,) যখন তাদের সাথে অজ্ঞ লোকেরা (অজ্ঞতার) কথাবার্তা বলে, তখন তারা নিরাপত্তার কথা বলে। (উদ্দেশ্য এই যে, নিজেদের জন্য উক্তিগত অথবা কর্মগত প্রতিশোধ নেয় না। এখানে সেই কঠোরতা না করার কথা বলা উদ্দেশ্য নয়, যা আদব শিক্ষাদান, সংশোধন, শরীয়তের শাসন এবং আল্লাহর কালেমা সমুখে রাখার জন্য করা হয়)। এবং যারা (আল্লাহর সাথে এই কর্মপন্থা অবলম্বন করে যে,) রাত্রিকালে আপন পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদারত ও দণ্ডায়মান (অর্থাৎ

নামায়ে-রত) থাকে এবং যারা (আল্লাহর হুক ও বান্দার হুক আদায় করা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভয় করে) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের আশাবকে দূরে রাখ। কেননা, এর আশাব সম্পূর্ণ বিনাশ। নিশ্চয় জাহান্নাম মন্দ ঠিকানা এবং মন্দ বাসস্থান। দৈহিক আনুগত্যে তাদের এই অবস্থা) এবং (অধিক ইবাদতে তাদের অবস্থা এই যে) তারা যখন ব্যয় করে তখন অযথা ব্যয় করে না (অর্থাৎ গুনাহর কাজে ব্যয় করে না) এবং কৃপণতাও করে না (অর্থাৎ জরুরী সৎকর্মেও ব্যয় করতে ক্রটি করে না)। বিনা প্রয়োজনে সামর্থ্যের বাইরে অনুমোদিত কাজে ব্যয় করা অথবা অনাবশ্যক ইবাদতে ব্যয় করা, যার পরিণাম অধৈর্য, লোভ ও কু-নিয়ত হয়ে থাকে, এসবও অযথা ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, এসব বিষয় গুনাহ। যে বস্তু গুনাহর কারণ হয়, তাও গুনাহ। কাজেই পরিণামে তাও গুনাহর কাজে ব্যয় হয়ে যায়। এমনভাবে জরুরী ইবাদতে মোটেই ব্যয় না করার নিন্দা **لَمْ يَفْئُرُوا** থেকে জানা গেল। কারণ কম ব্যয় করা যখন জায়েয নয়, তখন মোটেই ব্যয় না করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কাজেই এই সন্দেহ রইল না যে, ব্যয়ে ক্রটি করার তো নিন্দা হয়ে গেছে; কিন্তু মোটেই ব্যয় না করার কোন নিন্দা ও নিষেধাজ্ঞা হয়নি। মোটকথা তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ক্রটি ও বাড়া-বাড়ি থেকে পবিত্র।) এবং তাদের ব্যয় করা এতদূত্বের (অর্থাৎ ক্রটি ও বাড়াবাড়ির) মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। (তাদের এই অবস্থা ইবাদত পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) এবং যারা (গুনাহ থেকে এভাবে বেঁচে থাকে যে,) আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না (এটা বিশ্বাস সম্পর্কিত গুনাহ) আল্লাহ যার হত্যা (আইনের দৃষ্টিতে) অবৈধ করেছেন সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না (অর্থাৎ যখন হত্যা জরুরী কিংবা অনুমোদনের কোন শরীয়তসম্মত কারণ পাওয়া যায়, তখন ভিন্ন কথা) এবং ব্যভিচার করে না। (এই হত্যাও ব্যভিচার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত গুনাহ)। যারা এ কাজ করে (অর্থাৎ শিরক অথবা শিরকের সাথে অন্যায় হত্যাও করে অথবা ব্যভিচারও করে, যেমন মক্কার মুশরিকরা করত) তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে (যেমন অন্য আয়াতে আছে **وَنُفِئَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ** এবং তারা তথায় লাক্ষিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে (যাতে দৈহিক শাস্তির সাথে সাথে লাক্ষনার আত্মিক শাস্তিও হয় এবং শাস্তির কাঠোরতা অর্থাৎ বুদ্ধির সাথে সাথে পরিমাণ বুদ্ধি অর্থাৎ চিরকাল বসবাস করাও হয়) **وَمَنْ أَمِنَ - مَهَانًا - يَخْذُ -** বলে কাকির ও মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। এর ইঙ্গিত - **يُفْطِنُ ذَلِكَ** ইত্যাদি বাক্য। কেননা, পাপী মু'মিনের শাস্তি বর্ধিত ও চিরস্থায়ী হবে না; বরং তাকে পাক-পবিত্র করার উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হবে, লাক্ষিত করার উদ্দেশ্যে নয়। এর জন্য ঈমানের নবায়ন জরুরী নয়, শুধু তওবা করা যথেষ্ট। পরবর্তী **وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ** আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত ইঙ্গিত ছাড়া বুঝারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস থেকে শানে নুযুলও তাই বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে এই আয়াত নাখিল হয়েছে); কিন্তু যারা (শিরক ও গুনাহ থেকে) তওবা করে (তওবা কবুলের শর্ত এই যে) বিশ্বাস (ও) স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে (অর্থাৎ জরুরী ইবাদত পালন করতে থাকে, তাদের জাহান্নামে চিরকাল বাস করা দূরের কথা জাহান্নাম তাদেরকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করবে না;

বরং) আল্লাহ তা'আলা তাদের (অতীত) গুনাহকে (ভবিষ্যৎ) পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন (অর্থাৎ যেহেতু অতীত কুফর ও গুনাহ ইসলামের বরকতে মাকফ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে সংকর্মের কারণে পুণ্য লিখিত হতে থাকবে, তাই জাহান্নামের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না) এবং (এই পাপ মোচন ও পুণ্য লিখন এ কারণে যে,) আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, (তাই পাপ মোচন করে দেন এবং) পরম দয়ালু (তাই পুণ্য স্থাপন করে দেন। এ ছিল কুফর থেকে তওবাকারীর বর্ণনা। অতঃপর গুনাহ থেকে তওবাকারী মু'মিনের কথা বলা হচ্ছে, যাতে তওবার বিষয়বস্তু পূর্ণ হয়ে যায়। এ ছাড়া আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অবশিষ্ট গুণাবলীরও এটা বর্ণনা যে, তারা সর্বদা ইবাদত সম্পন্ন করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোন সময় গোনাহ হয়ে গেলে তওবা করে নেয়। তাই তওবাকারীদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি (গুনাহ থেকে) তওবা করে ও সংকর্ম করে (অর্থাৎ ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে,) সে (ও) আযাব থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, সে আল্লাহ তা'আলার দিকে বিশেষরূপে ফিরে আসে (অর্থাৎ ভয় ও আন্তরিকতা সহকারে, যা তওবার শর্ত। অতঃপর আবার রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে, অর্থাৎ তাদের এই গুণ যে) তারা অনর্থক কাজে (যেমন খেলাধুলা ও শরীয়ত বিরোধী কাজে) যোগদান করে না এবং যদি (ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায়) অনর্থক ক্রিয়াকর্মের কাছ দিয়ে যায়, তবে গভীর (ও ভদ্র) হয়ে চলে যায় (অর্থাৎ তাতে মশগুল হয় না এবং কার্যকলাপ দ্বারা গুনাহগারদের নিকৃষ্টতা ও নিজেদের উচ্চতা ও গর্ব প্রকাশ করে না) এবং তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী দ্বারা উপদেশ দান করা হলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে তার (বিধানাবলীর) উপর পতিত হয় না। (কাফিররা যেমন কোরআনকে অভিনব বিষয় মনে করে তামাশা হিসেবে এবং তাতে আপত্তি উত্থাপনের উদ্দেশ্যে এর স্বরূপ ও তত্ত্বকথা থেকে অন্ধ ও বধির হয়ে এর চারপাশে এলোমেলো ভিড় জমাত। অন্য আয়াতে কোরআন বলে : كَانُوا يَكْفُرُونَ عَلَيْهِ لَيْدًا — উল্লিখিত বান্দাগণ এরূপ করে না; বরং বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে কোরআনে মনোনিবেশ করে, যার ফলে ঈমান ও আমল বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আয়াতে অন্ধ ও বধির না হওয়ার কথা বলা হয়েছে—কোরআনের প্রতি আগ্রহভরে মনোনিবেশ না করা ও তাতে পতিত না হওয়ার কথা বলা হয়নি। কেননা, এটাই কাম্য। এতে কাফিরদের কোরআনে পতিত হওয়া তো প্রমাণিত হয়; কিন্তু তাদের পতিত হওয়ার বিরোধিতা ও প্রতিরোধের নিয়তে এবং অন্ধ বধিদের পতিত হওয়া অনুরূপ ছিল। তাই এটা নিষ্পত্তি) এবং তারা (নিজেরা যেমন দীনের আশেক, তেমনি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও দীনের আশেক করতে চেষ্টিত থাকে। সমতে কার্যত চেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারেও) দোয়া করে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের ও আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে চোখের নীতলতা (অর্থাৎ শাস্তি) দান কর। (অর্থাৎ তাদেরকে দীনদার কর এবং আমাদেরকে এই প্রচেষ্টায় সফল কর, যাতে তাদেরকে দীনদার দেখে শাস্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারি।) এবং (তুমি তো আমাদেরকে আমাদের পরিবারের নেতা করেছই, কিন্তু আমাদের দোয়া এই যে, তাদের সবাইকে মুত্তাকী করে) আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা করে দাও। (নেতৃত্বের আবেদন আসল উদ্দেশ্য নয়, যদিও তাতে দোষ নেই; বরং আসল উদ্দেশ্য নিজ পরিবারের মুত্তাকী হওয়ার আবেদন। অর্থৎ

আমরা এখন শুধু পরিবারের নেতা। এর পরিবর্তে আমাদেরকে মুত্তাকী পরিবারের নেতা করে দাও। এ পর্যন্ত রহমানের বান্দাদের গুণাবলী বর্ণিত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান বর্ণিত হচ্ছেঃ তাদেরকে (জান্নাতে বসবাসের জন্য) উপরতলার কক্ষ দেয়া হবে তাদের (ধর্ম ও ইবাদতের উপর) দৃঢ়তার থাকার কারণে এবং তারা তথায় (জান্নাতে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) স্থায়িত্বের দোয়া ও সালাম পাবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। সেটা কত উত্তম ঠিকানা ও বাসস্থান। (যেমন জাহান্নাম সম্পর্কে *سَاءَ مَسْكَنًا مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا* বলা হয়েছে। হে পয়গম্বর,) আপনি সাধারণভাবে লোকদেরকে বলে দিন, আমার পালনকর্তা তোমাদের সামান্যও পরওয়া করবেন না, যদি তোমরা ইবাদত না কর। অতএব (এ থেকে বুঝা উচিত যে, হে কাফির সম্প্রদায়) তোমরা তো (আল্লাহর বিধানাবলীকে) মিথ্যা মনে কর। কাজেই সত্ত্বর এটা (অর্থাৎ মিথ্যা মনে করা তোমাদের জন্য) অনিবার্য বিপদ হয়ে যাবে। (তা দুনিয়াতে হোক, যেমন বদর যুদ্ধে কাফিরদের উপর বিপদ এসেছে কিংবা পরকালে হোক—এটা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আল-ফুরকানের বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং এতসম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের উদ্দীপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফির-মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ তা'আলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রিসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ ও রাসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসমঞ্জস।

কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে 'ইবাদুর রহমান'—(রহমানের দাস) উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্য সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু করতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন নিজে অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা বাসনা ও কর্মকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেওয়া। এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলা 'নিজের বান্দা' অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও শুনাই থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে 'নিজের বান্দা' বলে সম্মানসূচক উপাধি দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামাবলী ও গুণবাচক বিশ্লেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু 'রহমান' শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামত : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ,

দিব্বারাজি ইবাদত পালনের সাথে আল্লাহুজীতি, যাবতীয় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সম্মান-সম্মতি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু शामिल আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ عِيَار হওয়া। عِيَار শব্দটি عِيد এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস ; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং তার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তা'আলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্য সদা উৎকর্ষ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ : يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَوْنًا অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। مَوْن শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাভীর্য ও বিনয় অর্থাৎ গর্বভরে না চলা, অহংকারীর ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুল্লাভবিরোধী। শাম্মায়েলের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খুব ধীরে চলতেন না, বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এক্রূপ, كَانُوا الْأَرْضَ تَطْوِي لَهُ অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্য কুঞ্চিত হতো।—(ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মাকরুহ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত উমর ফারুক (রা) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেন : তুমি কি অসুস্থ? সে বলল : না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তি সহকারে চলার আদেশ দিলেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত হাসান বসরী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মু'মিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অঙ্গ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারক ও পঙ্গু মনে করে ; অথচ তারা স্বপ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয় ; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহুজীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপ্ত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প তার জন্য শাস্তি তৈরি রয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

তৃতীয় গুণ : وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا অর্থাৎ যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে جَاهِلُونَ শব্দের অনুবাদ 'অজ্ঞতাসম্পন্ন' করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয় ; বরং যারা মূর্খতার কাজ ও মূর্খতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। 'সালাম' শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বুঝানো হয়নি, বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহ্‌হাম থেকে বর্ণনা করেন যে, এখানে تسليم শব্দটি تسلم থেকে নয় ; বরং سلام থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খদের জওয়াবে তাঁরা নিরাপত্তার

কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গুনাহ্‌গার না হয়। হযরত মুজাহিদ, মোকাভিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। —(মাযহারী)

চতুর্থ গুণ : وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সিজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। ইবাদতে রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোক দেখানো ও নামাযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিবারাত্রি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। দিবাভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জিহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে ইবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যস্ত কর্ম ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফকারা এবং গুনাহ থেকে নিবৃত্তকারী। —(মাযহারী)

হযরত ইবনে আক্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী بَاتَ لِلَّهِ سَاجِدًا وَقَائِمًا (মাযহারী, বগভী)। হযরত উসমান গনীর জবানী রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি ইবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও ইবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে। —(আহমদ, মুসলিম, মাযহারী)

পঞ্চম গুণ : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিবারাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না ; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখিরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্বন্ধন কার্যত চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ : وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রটিও করে না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে اسراف এবং এর বিপরীতে إقتار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

إسراف-এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আক্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে ব্যয় করা اسراف তথা অপব্যয় ; যদিও তা এক পয়সাও হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, تَبذِيرٌ তথা অনর্থক ব্যয় কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গুনাহ। আল্লাহ বলেন : إِنَّ الْمُبْتَرِّينَ كَانُوا إِخْوَانَ : — اَلشَّيَاطِينِ এ দিক দিয়ে এই তফসীরের সারমর্মও হযরত ইবনে আক্বাস প্রমুখের তফসীরের অনুরূপ হয়ে যায় ; অর্থাৎ গুনাহর কাজে যা-ই ব্যয় করা হয়, তা অপব্যয়। —(মাযহারী)

إقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ক্রটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ ও রাসূল ব্যয় করার আদেশ দেয়, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই

ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে)। এই তফসীরও হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ত্রুটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রাসূলে করীম (সা) বলেন : **مَنْ فَقَّ الرَّجُلُ قَصْدَهُ فِي مَعِيشَتِهِ** অর্থাৎ ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।—(আহমদ, ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **أَرْثَىٰ مَنْ فَقَّ مَعَ الْعَالِ مِنْ اقْتِنَادٍ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়ম থাকে, সে কখনও ফকির ও অভাবগ্রস্ত হয় না।—(আহমদ, ইবনে কাসীর)

সপ্তম গুণ **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ**—পূর্বোক্ত ছয়টি গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গুনাহ্ ও অব্যাহতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ তারা ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গুনাহ্।

অষ্টম গুণ : **لَا يَتَّبِعُونَ الْفِتْنَةَ** এখান থেকে কার্যগত গুনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গুনাহ্ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গুনাহের কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গুনাহ্ বর্ণনা করার পর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنفَعِ** অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত গুনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবু উবায়দা **ع** শব্দের তফসীর করেছেন গুনাহের শাস্তি। কেউ কেউ বলেন : **ع** জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।—(মাযহারী)

অতঃপর উল্লিখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাধারা থেকে এ কথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাকিরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো **يَفْعَلْ** কথাটি মুসলমান গুনাহগারদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গুনাহের জন্য একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মু'মিনদের জন্য হবে না। এটা কাকিরদের বৈশিষ্ট্য। কুফরের যে শাস্তি, যদি কাকির ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْهَا** কথাটিও বলা হয়েছে অর্থাৎ তারা চিরকাল এই আয়াবে লালিত অবস্থায় থাকবে। কোন মু'মিন চিরকাল আয়াবে থাকবে না। মু'মিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হলো, এক্ষণে কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সংকর্ম করতে থাকে, তবে

আল্লাহ তা'আলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেইসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও শুনাহ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং শুনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সৎকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যুবার, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

ইবনে কাসীর এর আরও একটি তফসীর বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, কাফিররা কুফর অবস্থায় যত পাপ করেছিল, বিশ্বাস স্থাপনের পর সেগুলোকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেওয়া হবে। এর কারণ এই যে, বিশ্বাস স্থাপনের পর তারা যখন কোন সময় অতীত পাপের কথা স্মরণ করবে, তখনই অনুতপ্ত হবে এবং নতুন করে তওবা করবে। তাদের এই কর্মের ফলে পাপসমূহ পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর এই তফসীরের সমর্থনে কতিপয় হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

الْأَمَنُ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأَنَّى يُؤْتَى إِلَى اللَّهِ حِسَابًا
বাংলায়: বাঁচুকো বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুজ্জি। কুরতুবী কাকফাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ প্রথমটি ছিল কাফির ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়। এখন মুসলমান পাণীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَأَمَّنْ অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বুঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মু'মিনই ছিল; কিন্তু অনবধানতাবশত হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিত্ত্ব ও সঠিক মনে করা হবে। এ কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু يُؤْتَى উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু মৌখিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লিখিত হয়েছে, তা সৎকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সং কর্ম দ্বারাও তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিত্ত্বরূপে আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত শুনাহ থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যৎ জিন্মাকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশত পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যত এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁর মন্দকাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেওয়া হবে।

মা'আরেফুল কুরআন (৬ষ্ঠ)—৬৩

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম গুণ **وَالَّذِينَ لَا يَشْهَرُونَ الزُّبُرَ** — অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও বাতিল মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শিরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ইদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাকিয়া বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বুঝানো হয়েছে। আমার ইবনে কারেম বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বুঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্য পান করা ও করানোর মজলিস বুঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত।—(মাহহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের **يَشْهَرُونَ** শব্দটিকে **شهاده** অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থে নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গুনাহ, তা কোরআন ও সুন্নাতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চক্কিগাটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তাঁর মুখে চুনকালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লাঞ্চিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।—(মাহহারী)

একাদশ গুণ : **وَإِذَا مَرُّوا بِالْفُجُورِ كَرِهًا** অর্থাৎ যদি অনর্থক ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গাভীর ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাচক্রে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ মজলিসের কাজকে মন্দ ও ঘৃণাই জানা সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা জানতে পেরে বললেন, ইবনে মাসউদ করীম অর্থাৎ ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সন্তোষ লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।—(ইবনে কাসীর)

দ্বাদশ গুণ : **وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخُرُّوا عَلَيْهَا صَبًّا وَعُتْيَانًا** অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহর আয়াত ও আখিরাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না ; বরং শ্রবণশক্তি ও

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এক, আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয় কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। দুই, অন্ধ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয় কিন্তু বিতুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা ও তাবেরীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতি অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অন্ধ বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাক্ষী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীর অনুযায়ী বুঝে আমল করা জরুরী : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সিজদারত আছে এবং আমি জানি না, এটা কোন প্রকার সিজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাব? হযরত শা'বী বললেন না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মু'মিনের জন্য বৈধ নয়; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্য জরুরী। তুমি যখন সিজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সিজদা করছে এবং তুমি তাদের সিজদার স্বরূপও জান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সিজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

এ যুগে যুব-সম্প্রদায় ও নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে কোরআন পাঠ ও কোরআন বুঝার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ কারণে তারা নিজেরা কোরআনের অনুবাদ অথবা কারও তফসীর দেখে কোরআনকে নিজেরা বুঝার চেষ্টাও করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ; কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ নীতিবিরজিত। ফলে তারা কোরআনকে বিতুদ্ধরূপে বুঝার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। নীতির কথা এই যে, জগতের কোন সাধারণতম বিদ্যাও নিছক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কেউ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন করতে পারে না, যে পর্যন্ত তা কোন গুস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা না করে। জানি না কোরআন ও কোরআনের বিদ্যাকেই কেন এমন মনে করে নেওয়া হয়েছে যে, যার মন চায় সে নিজেই তত্ত্বজমা দেখে যা ইচ্ছা মর্ম নির্দিষ্ট করে নেয়। কোন পারদর্শী গুস্তাদের পথপ্রদর্শন ব্যতীত এই নীতিবিরজিত কোরআন পাঠও আল্লাহর আয়াতে অন্ধ বধির হয়ে পতিত হওয়ার শামিল। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সরল পথের তওফীক দান করুন।

ত্রয়োদশ গুণ : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ اسْمًا : এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া আছে যে, তাদেরকে আমার জন্য চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল

দেখা। একজন মানুষের জন্য এটাই চোখের প্রকৃত শীতলতা। যদি সম্ভান-সন্ততি ও জ্বীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবে তাও দূরন্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সংকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না ; বরং তাদের সম্ভান-সন্ততি ও জ্বীদেরও আমল সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসাবে তাদের সংকর্মপরায়ণতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রনিধানযোগ্য **وَأَجْمَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا** আমাদেরকে মুত্তাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যত নিজের জন্য জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদৃষ্টে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে : **وَأَرْثَىٰ ذَاكَ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَجْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا** আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলিম এই আয়াতের তফসীরে বলেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকেন। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সম্ভান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে মুত্তাকী করে দিন। তারা মুত্তাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুত্তাকীগণের ইমাম ও নেতা কবিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সম্ভান-সন্ততি ও জ্বীদেরকে মুত্তাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্য কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে একরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত মকহুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্য তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্বারা মুত্তাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই অর্থাৎ যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়—জায়েয। পক্ষান্তরে **لَا يَرْجُونَ عُلُوًّا** আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বেরই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** এ পর্যন্ত 'ইবাদুর রহমান' অর্থাৎ কামিল মু'মিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হলো। অতঃপর তাদের প্রতিদান ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ — শব্দের আভিধানক অর্থ আলোচনা তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ এমন বাসাখানা পাবে, যা সাধারণ জ্ঞান্নাতীগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী, মুসলিম-মাযহারী) মুসনাদে আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমে হযরত আবু মালিক আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জ্ঞান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে।

লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাতে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে।—(মায়হারী)

وَيَقُفُّونَ فِيهَا تَجِئَةً وَسَلَامًا—অর্থাৎ জালালের অন্যান্য নিয়ামতের সাথে তাঁরা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে মুবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত ঋণটি মু'মিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবার প্রতিদান ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বীর কাফির ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ مَا يَغْبِؤُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ—এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না, যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে ডাকা ও তাঁর ইবাদত করা না হতো। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহর ইবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে : اَلْاَلِيفُ يُؤْنَسُ ۝ অর্থাৎ আমি মানব ও জিনকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, ইবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরপর রিসালত ও ইবাদতে অবিশ্বাসী কাফির ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে : فَقَدْ كُنُبْتُمْ ۝ অর্থাৎ তোমরা সব কিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই।

اَلْحٰقُّ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزٰمًا—অর্থাৎ এখন এই মিথ্যারোপ ও কুফর তোমাদের কঠোর হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

ونعوذ بالله من حال اهل النار

সূরা দাহর

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝
 إِذَا خَلَقْنَاهُ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ وَنَسَّيْنَاهُ فِجْهَانَهُ نَسْمِعًا
 بَعْضُهُمَا ۝ إِذَا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ إِذَا أَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ
 كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
 ۝ يُوقُونَ بِالنَّذِيرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝ وَ
 يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝ إِنَّمَا
 نُطْعِمُكُمْ لُوحَهُ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ إِنَّمَا نَخَافُ
 مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝ فَوَقَّهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
 وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝ وَجَزَّاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝
 مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ ، لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا
 ۝ وَدَائِبُهُ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝ وَيُطَافُ
 عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرًا
 مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا

زَلَّيْنِيْلًا ۝ عَمَّا فِيهَا كَسَفِي سَلْسِيْلًا ۝ وَيَطُوْنُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانِ
 مُخْلَدُوْنَ ۝ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْ اَوْثَقْتُمْوْرًا ۝ وَاِذَا رَاَيْتَ
 ثُمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا ۝ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ
 وَاسْتَبْرَقٌ رُّوحُلُوْا اَسَاوِرٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رِيْثُهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝
 اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمۡ جَزَاءٌ وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝ اِذَا نَحْنُ نَزَّلْنَا
 عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝ فَاَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ
 اِمًّا اَوْ كَفُوْرًا ۝ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاٰخِرًا ۝ وَمِنَ الْاَيْلِ
 فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝ اِنَّ هٰؤُلَاءِ يَجْتُوْنُ
 الْعَاجِلَةَ ۝ يَذَرُوْنَ وِرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
 وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ ۝ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝ اِنَّ
 هٰذَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ سَبِيْلًا ۝ وَمَا
 تَشَاوُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝
 يَدْخُلُ مَنْ يَّشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۝ وَالظَّالِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ
 عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অভিযোজিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র ওক্রবিশ্ব থেকে—এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি প্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৩) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়। (৪) আমি অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি নিকল, বোঁড়ি ও প্রকলিত অগ্নি। (৫) নিশ্চয়ই সং কর্ম-শীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র। (৬) এটা বলনা, যা থেকে আল্লাহর বাস্তবগণ

পান করবে—তারা একে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা যাত্রত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে উর করে, যেদিনের অনিশ্চয় হবে সুদূরপ্রসারী। (৮) তারা আত্মাহুত প্রেমে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বর্ষীক আহার্য দান করে। (৯) তারা বলে : কেবল আত্মাহুত সন্তুষ্টির জন্য আহার্য তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (১০) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিগ্রস্ত ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি। (১১) অতঃপর আত্মাহুত তাদেরকে সে দিনের অনিশ্চয় থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিব্য সজীবতা ও জানন্দ। (১২) এবং তাদের সবারের প্রতিদানে তাদেরকে দিব্য জ্ঞান ও রেশমী পোশাক। (১৩) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না। (১৪) তার হৃদয়রা তাদের উপর যুঁকি থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আনন্দাধীন রাখা হবে। (১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্বর্গীকৃত মত পানপাত্র (১৬) রূপালী স্বর্গীকৃত পাত্রে—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'খানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জ্ঞাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ব্যরণ। (১৯) তাদের কাছে মোরাকেরা করবে চির কিশোরত্ব। আগনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিকশিত যদিযুত। (২০) আগনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামত-রাহি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আভরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নিষিত কংকন এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহরা'। (২২) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রত্যেকটা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি আগমার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাখিল করেছি। (২৪) অতএব আগনি আগমার পালনকর্তার আদেশের জন্য খৈয় সহকারে অপেক্ষাকরুন এবং ওদের সৎকার কোম পাণ্ডিত ও কাফিরের অনুশাস্তি করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আগম পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। (২৬) রাহির কিছু অংশে তার উদ্দেশ্যে সিজদা করুন এবং রাহির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিশ্চয় এরা পাখির জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং যজবৃত্ত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আত্মাহুত অভিপ্রায় বাড়িরকে তোমরা অন্যকোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আত্মাহুত সর্বভ, প্রজ্ঞাময়। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর আলিমদের জন্য তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্যাদা শাস্তি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় মানুষের উপর এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (অর্থাৎ সে মানুষ ছিল না—বীৰ্য ছিল, এর আগে খাদ্য এবং এর আগে উপাদান-চতুষ্টয়ের অংশ ছিল)। আমি তাকে মিত্র বীৰ্য থেকে সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ

নর ও নারী উভয়ের বীর্ষ থেকে। কেননা, নারীর বীর্ষও ভিতরে ভিতরে তার গর্ভাশয়ে
 স্থগিত হয়। এরপর কখনও গর্ভাশয়ের স্ব্ৰু দিবে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং কখনও
 ভিতরে থেকে যায়। মিত্র বীর্ষের আয়ত্ব অর্থ এই যে, এই বীর্ষ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হয়ে
 থাকে এবং এটা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। সার কথা, আমি তাকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছি) এভাবে
 যে, তাকে আদিল্ট করব। অতঃপর (এ কারণে) তাকে প্রবণ ও দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন (সমঝদার)
 করে দিয়েছি। (বাকপদ্ধতিতে সমঝদার কুচ্ছিন্নকেই বিশেষভাবে শ্রোতা ও চক্ষুমান বলা
 হয়। তাই আদিল্ট হওয়ার যে ভিত্তি সমঝদার হওয়া, তা এখানে উল্লিখিত না হলেও
 বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে আদিল্ট হওয়ার ওপাবলীসহ সৃষ্টি
 করেছি। এরপর যখন শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিল্ট হওয়ার সময় আসল, তখন
 আমি তাকে (ভালমন্দ ভাত করে) পথনির্দেশ করেছি (অর্থাৎ বিধানাবলী পালন করতে
 বলেছি। অতঃপর) হয় সে কৃতজ্ঞ (ও মু'মিন) হয়েছে, না হয় অকৃতজ্ঞ (ও কাফির)
 হয়েছে। অর্থাৎ যে পথে চলতে বলেছিলাম, সে সেই পথে চলেছে, সে মু'মিন হয়েছে।
 পক্ষান্তরে যে সেই পথ সম্পূর্ণ বর্জন করেছে, সে কাফির হয়েছে। অতঃপর উভয় দলের
 প্রতিকূল বর্ণনা করা হয়েছে : আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ী ও
 জেলিহান অগ্নি। (আর) যীরা সংকর্মশীল তাঁরা এমন পানপাত্র (অর্থাৎ পানপাত্র থেকে
 শরাব) পান করবে যান্ন মিশ্রণ হবে কাফুর অথবা এমন বরনা থেকে (পান করবে) যা থেকে
 জাহান্নাম বিশেষ বাস্পাণ পান করবে এবং যাকে (তাঁরা যথা ইচ্ছা) প্রবাহিত করবে।
 (জাহান্নামের বরনাসমূহ জাহান্নামীদের অনুগামী হবে এটা তাদের এক কার্যমত। দুপুরে
 যনসুয়ে বণিত আছে যে, জাহান্নামীদের হাতে স্বর্ণের হাড়ি থাকবে। তাঁরা এসব হাড়ি দ্বারা
 যে দিকে ইশারা করবে, সে দিকে বরনা প্রবাহিত হবে। জাহান্নামের কাফুর ওস্ততা, শীতলতা,
 চিডখিনোদন ও বজবীর্ষ বর্ধনে অভুলনীয় হবে। শরাবে বিশেষ গুণ সৃষ্টি করার জন্য কতক
 উপযুক্ত বস্তু মিশ্রিত করার নিয়ম আছে। সে মতে জাহান্নামের শরাবে কাফুর মিশ্রিত করা
 হবে। নৈকট্যশীল বাস্পাদের জন্য নিদিষ্ট বরনা থেকে শরাবের পাত্র পূর্ণ করা হবে। অতএব
 এটা উৎকৃষ্টতর হবে, তা বলাই কাছাকাছি। এতে করে সংকর্মশীলদের সুসংবাদ আরও
 জোরদার হয়ে যায়। যদি **عبد الله و ابرار** বলে একই প্রণীর লোক বোঝানো হয়ে

থাকে, তবে দুই জাহান্নাম বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পৃথক পৃথক। এক জাহান্নাম মিশ্রণ বর্ণনা করা
 উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় জাহান্নাম তার আধিক্য ও আয়ত্বাধীন হওয়ার কথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য।
 কেননা বিলাস সামগ্রীর আধিক্য ও আয়ত্বাধীন হওয়া ভোগ-বিলাসের আনন্দকে আরও
 বাড়িয়ে তোলা। অতঃপর সংকর্মশীলদের ওপাবলী উল্লেখ করা হয়েছে :) তাঁরা মানিত
 পূর্ণ করে (আন্তরিকতা সহকারে, কেননা) তাঁরা এমন দিনকে ভয় করে, যার কঠোরতা
 হবে ব্যাপক। (অর্থাৎ কমবেশী সবাই এই কঠোরতার আওতার পড়বে। এখানে কিয়-
 মতের দিন বোঝানো হয়েছে। তার এমন আন্তরিক যে, আধিক ইবাদতেও, যাতে প্রায়শ
 আন্তরিকতা কম থাকে—তাঁরা আন্তরিক। সেমতে) তাঁরা জাহান্নাম প্রয়ে দরিদ্র, এতীম
 ও বন্দীকে সাহায্য মান করে। (বন্দী মজলুম হলে তার সাহায্য করা যে শুভ কাজ, তা বর্ণনা-
 সাপেক্ষ নয়। পক্ষান্তরে-অপরাধ করে বন্দী হলে অধিক প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য

সেওয়াও শুভকাজ। তারা-আহার্য দিবে মুখে অথবা অন্তরে বলেঃ) কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে আহার্য সেই এবং তোমাদের কাছে কোন (কার্যত) প্রতিদান ও (ঐচ্ছিক) কৃতজ্ঞতা কাফরা করি না। (কেননা) আমরা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভয়ংকর ও ভিত্তি দিনের আশংকা রাখি। (তাই আশা করি যে, এসব আন্তরিক কর্মের মসৌজত সেদিনের ভিত্ততা ও কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। এ থেকে জানা গেল যে, পরকালের জন্য কোন কাজ করা আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কাম্যার পরিগন্যী নয়)। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে (এই আনুগত্য ও আন্তরিকতার বরকতে) সে দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। (অর্থাৎ মুখ-মুখ্যে সজীবতা ও অন্তরে আনন্দ দান করবেন) এবং তাদের দুহতার প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জামাত ও রেশমী পোশাক। তারা তথার (অর্থাৎ জামাতে) আরামকেন্দারায় (আরামে ও সন্তোষে) ছেলান দিয়া বসবে। তারা তথার রৌদ্রজ্বল ও শৈত্য অনুভব করবে না (বরং আনন্দদায়ক ও শীতাতপ নিরঞ্জিত পরিবেশ হবে)। সেখানকার (অর্থাৎ জামাতের) স্বচ্ছ-ছায়া তাদের উপর থাকে থাকবে (অর্থাৎ নিকটে থাকবে)। ছায়া অন্যতম বিলাস উপকরণ। জামাতে চন্দ্র-সূর্য নেই। অতএব, ছায়ার মানে কি? ওয়াব এই যে, সম্ভবত অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্য বসু নিচয়ের আলোকেই ছায়া বলা হয়েছে। অবস্থার পরিবর্তন সাধন করাই বোধ হয় ছায়ার উপকারিতা। কেননা, এক অবস্থা যতই আরামপ্রদ হোক না কেন, অবশেষে তা থেকে মন উঠে যায়)। এবং জামাতের কলহুল তাদের আরতামীন রাখা হবে। (কলে সর্বত্র সর্বভাবে অনাক্সে তা গ্রহণ করতে পারবে) তাদের কাছে (পানাহারের বসু খৌহানোর জন্য) রূপার পাত্র পরিবেশন করা হবে এবং স্ফটিকের পানপাত্র। এটা হবে রূপাকী স্ফটিক—পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে। (অর্থাৎ এমন পরিমাপ করে তত্তি করা হবে যে, অভূষ্টি না থাকে এবং উত্তৃতও না হয়। কারণ, উত্তয়ের ক্ষমাই বিতৃষ্ণা রয়েছে। রূপাকী স্ফটিকের অর্থ এই যে, রূপার মত শুদ্ধ এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। পাখির রূপা স্বচ্ছ নয় এবং স্ফটিক শুদ্ধ নয়। সুতরাং এটা এক অভূতপূর্ব বস্তু হবে। তথার তাদেরকে (উল্লিখিত কাফুর মিশ্রিত শরাবে বাতীত অঙ্গও) এমন পাত্র-পান পান করানো হবে, যাতে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। (উত্তেজনা হৃষ্টি ও মুখের ছাদ পরিবর্তনের জন্য শরাবে এর মিশ্রণ করারও নিয়ম আছে। অর্থাৎ) এমন বরনা থেকে (তাদেরকে পান করানো হবে) হার নাম (সেখানে) সাজসাবীল (প্রসিদ্ধ) হবে। (অর্থাৎ পূর্বোল্লিখিত বরনার শরাবে কাফুরের এবং এই জামাতে বর্ণিত বরনার শরাবে যানজাবীলের মিশ্রণ থাকবে। এর সহস্য আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। তাদের কাছে (এসব বস্তু নিয়ে) চিরকিশোর বালকরা যোয়াকেরা করবে (তারা এমন সূত্রী যে) হে পাঠক, তুমি তাদেরকে দেখে মনে করবে যেন বিক্লিষ্ট মণিমুত্তম। (পরিচ্ছন্নতা ও চাকচিক্যে তাদেরকে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং চলকের দিক-দিকে বিক্লিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা উচ্চস্তরের তুলনা। কেবল উল্লিখিত বিলাস-সামগ্রীই নয় বরং সেখানে আরও সর্বত্রকার বিলাসপ্রবী এত অধিক ও উচ্চমানের থাকবে যে) হে পাঠক, যদি তুমি সেই স্থানটি দেখ, তবে তুমি প্রগাথ নিরাময় ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে পাবে। তাদের (অর্থাৎ জামাতীদের) আন্তরণ হবে চকন সবুজ রেশমী বস্ত্র ও

মোটা রেশমী বস্ত্র। (কেননা প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে পৃথক আমদান রয়েছে)। তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নিষিত কাপড়। (এই সূরার তিন আয়গার রূপার আসবাব-পত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে স্বর্ণের আসবাবপত্রের বর্ণনা আছে। কিন্তু উল্লেখের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, উভয় প্রকার আসবাবপত্র থাকবে। এর রহস্য বিলাসবাসনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা এবং বিভিন্ন মানসিক প্রবণতার প্রতি নবর রাখা। পুরুষের জন্য অলংকার দৃশ্যীয় বলে প্রর ভোলা ঠিক নয়। কেননা, দুনিয়াতে যা দৃশ্যীয়; পরকালেও তা দৃশ্যীয় হবে—এটা অস্বীকার নয়)। তাদের পালনকর্তা (তাদেরকে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী যে শরাব পান করতে দিবে, তা দুনিয়ার শরাবের ন্যায় অপবিত্র, বিবেকবুদ্ধি বিজ্ঞানকারী ও নেশামুক্ত হবে না বরং আল্লাহ তা'আলা) তাদেরকে শরাবান-তহরা (পবিত্র শরাব) পান করাবেন। এতে নাগাকী ও ময়লা থাকবে না, যেমন অন্য আয়াতে আছে :

سُورَاتِ ۖ لَا يَصَدُّ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ

শরাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক আয়গার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম আয়গার

سَقَاهُمْ سَقَاتِهِمْ وَثَوْنَهُمْ وَثَوْنَهُمْ ۖ وَثَوْنَهُمْ ۖ وَثَوْنَهُمْ ۖ وَثَوْنَهُمْ ۖ

ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম আয়গার সাধারণভাবে পান, দ্বিতীয় আয়গার সম্মানে পান এবং তৃতীয় আয়গার চূড়ান্ত সম্মানের সাথে পান করা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং একই বিষয়-বস্তুর বারবার উল্লেখ করনি। এসব নিরাময় দিলে আর্থিক সুখ বৃদ্ধি করার জন্য জায়াতী-গণকে বলা হবে : এটা তোমাদের প্রতিদান এবং (দুনিয়াতে রূত) তোমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। [অতঃপর রসুলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, শত্রুদের লাঞ্ছিত আপনি গুনলেন। অতএব, এ শত্রুতা ও বিরোধিতার জন্য দুঃখ করবেন না এবং ইবাদত ও প্রার্থনাকার্যে মগ্ন থাকুন। এটা যেমন ইবাদত, তেমনি অন্তরকেও শক্তিশালী করে। ইবাদতের বর্ণনা এই :] আমি আপনার প্রতি অলংকার করে কোরআন নাযিল করেছি (যাতে অলংকার করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে থাকেন এবং তারা সহজে উপকৃত হতে পারে)। যেমন সূরা ইসরার শেষে বলা হয়েছে :

وَقْرَانًا فَرَقْنَاهُ ۖ

অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার (তবলীগসহ) আদেশের উপর অটল থাকুন এবং তাদের মধ্যে কোন পাপিত ও কাকিরের আনুগত্য করবেন না। [অর্থাৎ তারা যে তবলীগ করতে নিষেধ করে, তা মানবেন না। এখানে উদ্দেশ্য গুরুত্ব প্রকাশ করা। নতুবা রসুলুল্লাহ (স) তাদের কথা মেনে চলবেন—এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না)। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা করুন (অর্থাৎ করব নামায পড়ুন) এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়ুন। অতঃপর সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে আরও একটি বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। এতে কাকিরদের নিন্দাও রয়েছে। অর্থাৎ কাকিরদের বিরোধিতার আসল কারণ এই যে) তারা পাকিবে জীবনকে ভাঙবাসে এবং উনিয়াতে আসমনকারী এক কঠিন দিবসকে পচাতে চলে গেছে। (সুতরাং দুনিয়াপ্রীতি তাদেরকে অলংকার করে রয়েছে। তাই তারা সত্যের

দূষণ হইতে গেছে। অতঃপর কঠিন দিবসের অসম্ভাব্যতা নিরাসন করার জন্য বলা হয়েছেঃ) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনিব। (অতঃপর, উত্তম বিষয় থেকে আল্লাহর কুদরত প্রকাশ পায়। কাজেই মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবিত করাই আর বেশী কি কঠিন যে, এটা করার কুদরত হবে না। অতঃপর উল্লিখিত যাবতীয় বিষয়বস্তুর নির্ধারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে) এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) উপদেশ। অতঃপর, যার ইচ্ছা হয়, সে তার পালনকর্তার পক্ষ অবলম্বন করুক। (এরূপ সন্দেহ করা উচিত নয় যে, কেউ কেউ তো কোরআন থেকে হিদায়ত পায় না। আসল ব্যাপার এই যে, কোরআন স্থানে উপদেশ ও যথেষ্ট হিদায়ত, কিন্তু) আল্লাহর অতিপ্রায় ব্যতীত তোমরা অতিপ্রায় পোষণ করতে পার না। (কতক লোকের জন্য আল্লাহর অতিপ্রায় না হওয়ার পশ্চাতে রহস্য আছে। কেন না) আল্লাহ সর্বত্র, প্রভুত্বময়। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। এবং (যাকে ইচ্ছা, কুকর ও পাপাচারে ডুবিয়ে রাখেন)। তিনি জালিমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন যম্বুদ শাস্তি।

আনুশঙ্গিক জাফল্য বিষয়

সূরা দাহরের অপর নাম সূরা 'ইনসাম' ও সূরা 'আবরার'।—(স্বহল মা'আনী) এতে মানব সৃষ্টির আদি-অন্ত, কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি, কিয়ামত, জাহ্নাত ও জাহান্নামের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর বিস্তৃত ও সাবলীল ভঙ্গিতে আলোকপাত করা হয়েছে।

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا

অব্যয়টি আসলে প্রবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। যাকে মাঝে কোন জাহান্নামীয় ও প্রকাশ্য বিষয়কে প্রবোধ আকারে ব্যক্ত করা যায়, যাতে তার প্রকাশ্যতা আরও জোরদার হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, যাকেই জিজ্ঞাসা করবে, সে এই উত্তরই দেবে, অপর কোন সম্ভাবনাই মেই। উদাহরণত কেউ দুপুরের সময় কাউকে জিজ্ঞাসা করে—এখন কি দিন নয়? এটা দৃশ্যত প্রশ্ন হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি যে একেবারে চরম জাহান্নামীয়, তারই বর্ণনা। তাই এ ধরনের স্থানে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, **هَلْ** অব্যয়টি এখানে **هَلْ** (বাস্তবিক নিশ্চয়তার) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের উপর এমন দীর্ঘ এক সময় অভিবাহিত হয়েছে, যখন পৃথিবীতে তার নাম-নিশানা এমনকি, আলো-চনা পর্যন্ত ছিল না। **هَلْ** শব্দটিকে **تَنُورِينَ**-সহ উল্লেখ করে সময়ের দীর্ঘতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত যে দীর্ঘ সময় মানুষের উপর অভিবাহিত হয়েছে, তাতে তার কোন না পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। নতুবা মানুষের উপর অভিবাহিত হয়েছে—একথা বলা দুরন্ত হয় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই দীর্ঘ সময়ের অর্থ-মানুষের পেটে পূর্ণ সঞ্চয়ের পর থেকে অন্তঃস্থ পূর্ণত্ব সময়, যা সাধারণত নয় মাস হয়ে থাকে। এতে মানব সৃষ্টির যত দূর অভিবাহিত হয়—দীর্ঘ থেকে দেহ, অন্তঃস্থ,

প্রাণ সঞ্চার ইত্যাদি সব দাখিল আছে। এই সম্পূর্ণ সময়ে এক পর্যায়ে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সে ছেলে, না মেয়ে তা কেউ জানে না। এ সময়ে তার কোন নাম থাকে না এবং কোন আকার-আকৃতিও কেউ জানে না। ফলে কোথাও তার কোন আলোচনা পর্যন্ত হয় না। আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময়কে আরও বিস্তৃত অর্থ দেওয়া যেতে পারে। যে বীর্ষ থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা, সেই বীর্ষও খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়। সেই খাদ্য এবং খাদ্যের পূর্ববর্তী উপকরণ কোন না কোন আকারে দুনিয়াতে ছিল। এই সময়কেও শামিল করলে আয়াতে বর্ণিত দীর্ঘ সময় হাজারো বছর হতে পারে। সার কথা, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের দৃষ্টি এক নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। মানুষ যদি সামান্য আনবুজিরও অধিকারী হয় এবং এই তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একদিকে তার নিজের স্বরূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে এবং অপরদিকে প্রত্যেক অস্তিত্ব, জ্ঞান ও অপর শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তার গত্যন্তর থাকবে না। যদি একজন সন্তর বছর বয়স্ক ব্যক্তি ধ্যান করে যে, এখন থেকে একাত্তর বছর পূর্বে তার কোন নাম-নিশানা ছিল না, কোন ড্রিভেই কেউ তার সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারত না, পিতামাতা ও দাদা-দাদীর মনেও তার বিশেষ অস্তিত্বের কোন আশংকা পর্যন্ত ছিল না, তখন কি বস্তু তার আবিষ্কার ও সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কোন বিস্ময়কর অপর শক্তি সারা বিশ্বে বিস্তৃত কণাসমূহকে তার অস্তিত্বে একত্রিত করে তাকে একজন হ'নিয়ার, জানী, প্রোভা ও চক্ষুমান মানুষে রূপান্তরিত করেছে, তবে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথা বলতে বাধ্য হবে যে,

ما نبود يم و تقاضا ما نبود — لطف تو نا گفته ما می شنود

এরপর মানব সৃষ্টির সূচনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে : اَنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ

اَمْشَاج — অর্থাৎ আমি মানুষকে মিশ্র বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছি। اَمْشَاج

শব্দটি امشاج অথবা مشوج — এর বহুবচন। অর্থ মিশ্র। বলা বাহুল্য, এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্ষ বোঝানো হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ তাই বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এখানে امشاج বলে রক্ত, স্নেহ, অঙ্গ, পিত্ত—এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীর্ষ গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা শামিল আছে : চিন্তা করলে দেখা যায় উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায় এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও জুহুদের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে শামিল হয়। এভাবে একজন মানুষের কর্মধর্ম শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের জানাচে-কানাচে বিকিণ্ড ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে

বিশ্বকর্ষকভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে। **عَمَّا**-এর এই শেষোক্ত অর্থ অনুযায়ী এর দ্বারা কিয়ামত-অবিস্বাসীদের সর্বস্বহৎ সম্পদের অবসানও হয়ে যায়। কেননা, এই নিরীহরবাদীদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এবং মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পথে সর্বস্বহৎ অন্তরায় এটাই যে, মানুষ মরে মৃত্যুকাল পরিণত হয়, এরপর তা ধূলিকণা হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। এসব কণাকে পুনরায় একত্র করা এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করা তাদের মতে যেন একেবারে অসম্ভব।

عَمَّا-এর তফসীরে তাদের এই সম্পদের সুস্পষ্ট জওয়ার রয়েছে। কারণ, মানুষের প্রথম সৃষ্টিতেও তো সারা বিশ্বের উপাদান ও কণাসমূহ শামিল ছিল। এই প্রথম সৃষ্টি দ্বারা অন্য কঠিন হলে না, পুনর্বার সৃষ্টি তার জন্য কঠিন হবে কেন?

نَبْتَلِيهِ—এটা **بِتِلٍّ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব

সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে এ ভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের জাহাযতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পরগছর ও ঐশী প্রহের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জাহাযতের দিকে এবং এই পথ জাহাযামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি, যে কোন পথ অবলম্বন করার।

সে মতে তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। **أَمَّا شَاَعِرًا وَآمَّا كَفُورًا**—অর্থাৎ একদল

তো তাদের শ্রুষ্ঠা ও নিরামিতদাষ্ট্যকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফির হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়-দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য রয়েছে শিকল, বেড়ী ও জাহাযাম। আর ঈমান ও ইবাদত পালনকারীদের জন্য রয়েছে অক্ষুর্ত নিয়ামত। সর্ব প্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেওয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন: কাফুর জাহাযতের একটি ঝরনার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্য তাতে এই ঝরনার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া হয়, তবে জরুরী নয় যে, জাহাযতের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অশাদ্য হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

عَيْنًا—এর **بَدَل** ও হতে পারে। **عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ**

এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, জাহাযতে কাফুর বলে জাহাযতের ঝরনাই বোঝানো হয়েছে। **عِبَادُ اللَّهِ** বলে আল্লাহর সে সব নেক বান্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে **أَبْرَار** বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি **عَيْنًا** শব্দটি **مِنْ كَأْسٍ**-এর **بَدَل** হয়, তবে এটা অন্য কোন ঝরনা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় **عِبَادُ اللَّهِ**-এর অর্থ হবে **أَبْرَار** থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোন দল।

يُؤْتُونَ بِاللَّذِّ

নিয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। **نَذْر**-এর শাসনিক অর্থ নিজের জন্য এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেওয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দারিত্বে ওয়াজিব নয়। এরূপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এর বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জামাতীদের মহান প্রতিদান ও অকুরুত নিয়ামত লাভের কারণে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা যখন নিজস্বের ওয়াজিব করা বিষয় পালনে যত্নবান, তখন যে সব করম-ওয়াজিব কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো পালনে আরও উত্তমরূপে যত্নবান হবে। এভাবে মানত পূর্ণ করার মধ্যে সকল ওয়াজিব ও করম কর্ম পালনের বিষয় শামিল হয়ে গেছে। ফলে জামাতের নিয়ামতসমূহ লাভের পূর্ণ কারণ হবে পূর্ণ আনুগত্য এবং করম ও ওয়াজিব কর্মসমূহ সম্পাদন। তবে মানত পূর্ণ করা যে ওয়াজিব ও ওরুদ্বপূর্ণ, তা এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'জাদা : কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে মানত হয়ে থাকে ১. যে কাজের মানত করা হয়, তা জায়েয ও হালাল হওয়া চাই এবং পোনাহ না হওয়া চাই। কেউ কোন নাজায়েয কাজের মানত করলে তা পূর্ণ না করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় কসম উল্ল করে তার কাকফারা আদায় করতে হবে। ২. কাজটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াজিব না হওয়া চাই। সেমতে কোন ব্যক্তি করম নামায অথবা ওয়াজিব বেতেরের মানত করলে তা মানত হবে না।

ইসাম আযম আবু হানীফা (র)-র মতে আরও একটি শর্ত এই যে, যেসব ইবাদত শরীয়তে ওয়াজিব করা হয়েছে, সেই জাতীয় কাজের মানত কবুল হতে হবে, যেমন নামায-রোযা, সতকা, কোরবানী ইত্যাদি। যে জাতীয় কাজের কোন ইবাদত শরীয়তে উদ্ভিষ্ট নয়, সেই জাতীয় কোন মানত করলে তা পূর্ণ করা জরুরী হয় না, যেমন কোন রম্ম ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া অথবা জানামার গশাংগমন ইত্যাদি। এগুলো ইবাদত হলেও উদ্ভিষ্ট ইবাদত নয়।

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَفَتِيئًا وَأَسْرَارًا—অর্থাৎ জামা-

তাদের এসব নিয়ামত একারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহাৰ্য দান করত। **عَلَى حُبِّهِ**-এর মর্মার্থ এই যে, তারা শুধু নিজস্বের প্রয়োজনের

অতিরিক্ত আহাৰ্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না বরং নিজস্বের প্রয়োজন সত্ত্বেও দান করে। দরিদ্র ও ইয়াতীমদেরকে আহাৰ্য দেওয়া যে ইবাদত, তা শৰ্পনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে— সে কাকির হোক অথবা মুসলমান অপরাধী। বন্দীকে খাওয়ানো ইসলামী রাষ্ট্রের দারিত্ব।

কেউ বন্দীকে আহাৰ্য্য দিলে সে যেন সরকার ও বাঙ্গাল মালকে সাহায্য করে। তাই বন্দী কাকির হলেও তাকে খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বন্দীদেরকে খাওয়ানো ও তাদের হিফাযতের দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের উপর বণ্টন করে অর্পণ করা হত। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বেলায় তাই করা হয়েছিল।

قَوَارِيرٌ مِّنْ فَتَّةٍ—দুনিয়ার রৌপ্য-পাত্র ছাড় মোটা হয়ে থাকে—আমনার

মত স্বছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত গুহ্ন হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কিন্তু জামাতের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আমনার মত স্বছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : জামাতের সব বস্তুর মযীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জামাতের পাত্রের ন্যায় স্বছ নয়।

وَيَسْتَوُونَ فِيهَا كَأَنَّ مَزَاجَهَا زَنْجَبِيلٌ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ

শূঁঠ। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জামাতেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : জামাতের বস্ত্র ও দুনিয়ার বস্ত্র নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার শূঁঠের আলোকে জামাতের শূঁঠকে বোঝার উপায় নেই।

سَوَازٍ شَدِيدٍ أَسَاوِرَ وَخُلُوعًا سَاوِرَ مِّنْ فَتَّةٍ—এর বহুবচন। অর্থ কংকন।

যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই জামাতে রূপায় কংকন এবং অন্য এক জামাতে স্বর্ণের কংকন উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপায় এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকন ব্যবহৃত হতে পারে অথবা কেউ রূপায় এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এখানে কথা থাকে এই যে, কংকন নারীদের ব্যবহারের অলংকার। পুরুষদের জন্য এরূপ অলংকার পরিধান করা সাধারণত দৃশ্যগত। জওয়ান এই যে, কোন অলংকার নারীদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়া এবং পুরুষদের জন্য দৃশ্যগত হওয়া—এটা সর্বভাভাবে প্রচলন ও অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন দেশে অথবা জাতিতে যে জিনিস দৃশ্যগত, অন্য জাতিতে তাই পছন্দনীয় হয়ে থাকে। পারস্য সম্রাটগণ হাতে কংকন পরিধান করতেন এবং বুক ও মুকুটে অলংকারাদি ব্যবহার করতেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্মানরূপে গণ্য হত। পারস্য সাম্রাজ্য বিজিত হওয়ার পর সম্রাটদের যে খনডাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাতে রাজকীয় কংকনও ছিল। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে সামান্য ভৌগোলিক ও জাতিগত তফাতের কারণে যখন এরূপ হতে পারে, তখন জামাতকে দুনিয়ার আলোকে দেখার কোন মানে থাকতে পারে না। জামাতে অলংকারাদি পুরুষদের জন্যও উদ্ভূত বিবেচিত হবে।

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا—অর্থাৎ জামাতীরা যখন

জামাতে পৌঁছে যাবে, তখন জামাতের তরফ থেকে বলা হবে : জামাতের এসব বিস্ময়কর

পরিণামে কাফিরদের হঠকাপ্তিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মূর্খরা পার্থিব ধ্বংসনীর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অন্তরে এমন ঔপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে : نَعْنُ

गठन प्रकृति यज्युत ७ सुदुह कन्नहि ।

মানবদেহের প্রাণিতে কুদরতের অপূর্ব লীলা : এই আশ্রিতে ইঞ্জিত করা হয়েছে যে, মানুষ তার এক এক গ্রহি সম্পর্কে ভেবে দেখুক। উপযোগিতা ও আশ্রমের খাতিরে দৃশ্যত এগুলো নরম ও নাজুক মনে হয় এবং নরম নরম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত আছে। ফলে স্বভাবত এক-দুই বছরেই গ্রহের এই বন্ধন ও মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কথা ছিল; বিশেষত যখন এগুলো সারাক্ষণ নড়াচড়া এবং বাঁকানো মোড়ানোর মধ্যেই থাকে। এভাবে দিব্যারাত্রি নড়াচড়ার মধ্যে থাকলে তো লোহার স্প্রিংও এক-দুই বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এসব নরম ও নাজুক মাংসপেশী কিভাবে দেহের গ্রহিসমূহকে বেঁধে রেখেছে। এগুলো না ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, না ভেঙ্গে যায়। হাতের অঙ্গুলীর গ্রহিস্তলোই দেখুন এবং হিসাব করুন, সারা জীবনে এরা কতবার নড়াচড়া করেছে এবং কেমন কেমন জোঁর ও চাপ এদের উপর পড়েছে। ইস্পাতের তৈরী হলেও এত দিনে ক্ষয় হয়ে যেত। কিন্তু সত্ত্ব-আশি বছর চাপ থাকার পরও এগুলো সর্গর্বে অক্ষত আছে।

সূরা কদর
থেকে
সূরা হুমাযাহ

سورة القدر

সূরা কদর

মকায় অবতীর্ণ, ৫ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ تُهَيِّئُ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۖ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার রাত্রি অপেক্ষা প্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ জ্ববতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

তরুণদের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি একে (কোরআনকে) নাযিল করেছি শবে-কদরে। (সূরা দোখান এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছে:) আপনি কি জানেন শবে-কদর কি? (অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে:) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা প্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এক হাজার মাস পর্যন্ত ইবাদত করার যে পরিমাণ সওয়াব, তার চেয়ে বেশী শবে-কদরে ইবাদত করার সওয়াব)।—(খামেন) এ রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (অর্থাৎ জিবরাঈল) তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে প্রত্যেক মঙ্গলজনক কাজ নিয়ে (পৃথিবীতে) অবতরণ করে (এবং এ রাত) আদ্যোপান্ত শান্তিময়। [হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত-আছে, শবে-কদরে হযরত জিবরাঈল একদল ফেরেশতাসহ আগমন করেন এবং যে ব্যক্তিকে নামায ও যিকিরে মশগুল দেখেন, তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। কোর-

আনে একেই **সালাম** বলা হয়েছে এবং মঙ্গলজনক কাজের অর্থও তাই। এছাড়া রেওয়াজেত-

সমূহে এ রাত্রিতে তওবা কবুল হওয়া, আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং প্রত্যেক মুমিনকে

ফেরেশতাগণের সালাম করার কথাও বর্ণিত আছে। এসব বিষয় যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে হয় এবং শান্তির কারণ হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অথবা **শান্তি**-এর অর্থ এখানে সেসব বিষয়, যা সূরা দোখানে **سكينة** বলে বোঝানো হয়েছে। এ রাস্তিতে সেসব বিষয় সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে]। সে শবে-কদর (এ সওয়াব ও বরকতসহ) ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (অর্থাৎ কোন এক অংশে বরকত থাকবে, অন্য অংশে থাকবে না—এমন নয়)।

অনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে-মুহল : ইবনে আবী হাতেম (রা)-র রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সা) একবার বনী ইসরাইলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অন্য সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্য শুধু এক রাস্তির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাস্তি ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আজ্জাহ তা'আলা সূরা-কদর নামিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীক্ষমান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীয়ই বৈশিষ্ট্য।—(মামহারী)

ইবনে কাসীর ইমাম মালিকের এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেরী মযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মযহাব বলেছেন। খাভাবী এর উপর ইজমা দাবী করেছেন। কিন্তু কোন কোন হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ : কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সন্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সন্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমাম্বিত রাত বলা হয়। আবু বকর ওয়ারাক বলেন : এ রাস্তিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোন সন্মান ও মূল্য থাকে না, সে এ রাস্তিতে তওবা-ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সন্মানিত ও মহিমাম্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাস্তিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিবিধি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক, বন্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতা-গণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হয়রত ইবনে আক্বাস (রা)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন—ইসরাফীল, মীকাইল, আযরাইল ও জিবরাইল (আ)।—(কুরতুবী)

সূরা দোখানে বলা হয়েছে :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُورَةٍ ۖ نَاكُفًا مُنْذِرِينَ ۖ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ

حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ۖ

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তফসীর সংক্রান্ত সব কল্পসমালোচনা নিষিদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে লَيْلَةِ مَبْرُورَةٍ-এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাতি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তফসীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত কল্পসমালোচনা শবে-বরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে নিষিদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তিগত এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগদীর রেওয়াজেতে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সারা বছরের তফসীর সংক্রান্ত বিষয়াদির কল্পসমালোচনা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব কল্পসমালোচনা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাপণের কাছে সোপর্দ করা হয়।—(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রাতিতে তফসীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো গাওহে মাহফুয থেকে নকল করে ফেরেশতাপণের কাছে সোপর্দ করা। মতুবা আসল বিধিলাপি আদিকলেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন রাতি : কোরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোন রাতিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ হাদীসদুশ্চে এই দশ দিনের বেজোড় রাতিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীস-সমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র)-র এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।—(ইবনে কাসীর)

সহীহ বুখারীর এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : تَحْرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعِشْرَةِ الْآخِرَةِ مِنْ رَمَضَانَ—অর্থাৎ রমযানের শেষ দশকে শবে-কদর অবশেষে করা। সহীহ মুসলিমের রেওয়াজেতে আছে : نَاطِلُوْهَا فِي الرُّتْرِ مِنْهَا—অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাতিগুলোতে তালাশ কর।—(মাযহারী)

শবে-কদরের কতক ফযীলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া : এ রাত্তির সর্ববৃহৎ ফযীলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্তির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাদীসে আসে তির্যাপি বহরের কিছু বেশী হয়। এই স্রেষ্ঠ কতকগুলি তার কোন সীমা নেই। অতএব দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইবাদতে দস্তারখান থাকে, তার অতীত সব পোনাহ মাক হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : শবে-কদরে সিদ্রাতুল-মুত্তাহার অবস্থানকারী সব ফেরেশতা জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রসুলে করীম (সা) বলেন : যে ব্যক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও সওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোন দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে গড়া উচিত নয়।

হযরত আরেশা (রা) একবার রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া করব? উত্তরে তিনি বললেন : এই দোয়া করো : **اللَّهُمَّ**

إِنِّكَ عَفُوٌّ تَكْسِبُ الْعَفْوَ فَصَفِّ عَنِّي হে আল্লাহ, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতামূলক। ক্ষমা আগনার পছন্দনীয়। অতএব আমার পোনাহসমূহ মার্জনা করুন।—(কুরতুবী)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ—এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন জওহে-মাহকুম থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসুলুল্লাহ (সা)-র কাছে পৌছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত এশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে : হযরত আবু যর গিফারী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : ইবরাহীম (আ)-এর সহীকাসমূহ তরা রমযানে, তওরাত ৬ই রমযানে, ইনজীল ১৩ই রমযানে এবং মবুদ ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রমযানুল-মুবারকে নাযিল হয়েছে।—(মামহারী)

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ—বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে।

হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ

করেন এবং মৃত নারী-পুরুষ মাঝায় অথবা যিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।—(মায়হারী)

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ—অর্থাৎ ফ্রেশতাগণ শবে-কদরের সারা বছরের অবধারিত ঘটনা-বলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তুফসীরবিদ একে سلام—এর সাথে সম্পর্কস্থত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্রিটি যাবতীর অনিশ্চি ও বিপদাগদ থেকে শান্তিস্বরূপ।—(ইবনে কাসীর)

سَلَامٌ—অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিশ্চিতির নামও নেই।

(কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ أَمْرٍ—এর বিশেষণ সাধ্যত করে অর্থ করেন—ফ্রেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করেন।—(মায়হারী)

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ—অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জাভনা : এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা স্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরাপে হবে? তুফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে, যাতে ‘শবে-কদর’ নেই। অতএব কোন অসুবিধা নেই।—(ইবনে কাসীর)

উদয়াচনের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামাজ জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, সে-ও এ রাত্রির সওয়াব হাসিল করে। যে ব্যক্তি শুত কেনী ইবাদত করবে, সে তত বেশী সওয়াব পাবে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামা'আতের সাথে পড়ে, সে অর্থ রাত্রির সওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাজ ও জামা'আতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি আগরণের সওয়াব হাসিল করে।

سورة البينة

সূরা বাইয়িনা

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ عَنْ تَابِعِهِمُ الْبَيْتَةِ ۝
 رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ۝ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيْتَةُ ۝ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
 لِيُعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
 الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي
 تَارِجِهِمْ خَلِيدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاءُ أُولَئِكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাকির ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না, যতরূপ না তাদের কাছে সুন্দর প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আহ্বতি করতেন পবিত্র সূহীকা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিদ্রোহ করেছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুন্দর প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা বাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কয়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাকির, তারা আহলামের আওনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম। (৭) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম

করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। (৮) তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জাহান্না, আর তজদেবে নিরীক্ষণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

তরসীরের সার সংক্ষেপ

কিতাবখারী ও মুশরিকদের মধ্যে হারা (পরস্বরের আবির্ভাবের পূর্বে) কাফির ছিল, তারা (ভাদের কুকুর থেকে কখনও) বিরত হত না, স্বতন্ত্র না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত, (অর্থাৎ) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রসূল, যিনি (তাদেরকে) পবিত্র সহীফা পাঠ করে শোনাতেন, যাতে আছে সঠিক বিষয়বস্তু। (অর্থাৎ কোরআন। উদ্দেশ্য এই যে, এই কাফিরদের কুকুর এমন শক্ত ছিল এবং তারা এমন কঠিন মূর্খতায় লিপ্ত ছিল যে, কোন রসূল ব্যতীত তাদের পথে আসা ছিল সুদূরপর্যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিরস্তুর করার জন্য আপনাকে কোরআন দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাদের উচিত ছিল একে সুবর্ণ সুবোঁস মনে করা এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।) আর হারা কিতাব-প্রাপ্ত ছিল, (হারা কিতাবপ্রাপ্ত নয়, তাদের কথা ভো বলাই বাহুল্য) তারা যে বিস্তৃত হয়েছে (দীনের ব্যাপারে) তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথেও মতানৈক্য করেছে এবং পূর্বে থেকে যে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল, তাও সত্য ধর্মের অনুসরণের মাধ্যমে দূর করেনি। মুশরিকদের কথা না বলার কারণ এই যে, তাদের কাছে তো পূর্বে থেকেও কোন ঐশী জান ছিল না)। অথচ তাদেরকে (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে) এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে (মিছামিহি কাউকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করবে না)। নামায কামেয় করবে এবং হাকাত দেবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। [সারকথা, আহ্লে কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা কোরআন ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।

فِيهَا كُتِبَ قَوْمٌ

বলে উপরে কোরআনের শিক্ষাও তাই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং কোরআনকে অমান্য করার কারণে তাদের কিতাবেরও বিরোধিতা হয়ে গেছে। এ হচ্ছে আহ্লে কিতাবদের দোষ। মুশরিকরা পূর্ববর্তী কিতাব না মানলেও ইবরাহীম (আ)-এর তরীকা যে সত্য, তা স্বীকার করত। আর এটা সুনিশ্চিত যে, ইবরাহীম (আ) শিরক থেকে মুক্ত ছিলেন। কোরআনও এ তরীকার সাথে একমত। সুতরাং মুশরিকদের জন্যও প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে। এখানে বিস্তৃত ও বিরোধী বলে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, হারা ইমান আনেনি। এ থেকে জানা গেল যে, হারা বিভ্রান্ত ও বিরোধিতা করেনি, তারা ইমানদার। অতঃপর আহ্লে-কিতাব, মুশরিক ও মু'মিনদের শান্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে—] নিশ্চয় আহ্লে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে হারা কাফির, তারা আহ্লামায়ের আন্তনে স্বারীভাবে থাকবে, আর তারাই হল সৃষ্টির অধম। নিশ্চয় হারা ইমান আনে ও সং কর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান—চিরকাল বসবাসের জাহান্না, আর তজদেবে নিরীক্ষণী প্রবাহিত। তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের

প্রতি সত্ত্বল্ট থাকবেন এবং তারা আল্লাহ্ প্রতি সত্ত্বল্ট থাকবে (অর্থাৎ তারাও কোন সোনাহ্ করবে না এবং তাদের সাথেও কোন অগ্নির ব্যবহার করা হবে না)। এটা (অর্থাৎ জাহ্নাত ও সত্ত্বল্ট) তার জন্য, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। আল্লাহ্কে ভয় করলেই ইমান ও সং কর্ম সম্পাদিত হয়, যা জাহ্নাত ও সত্ত্বল্ট লাভের চাবিকাঠি।

আনুখরিক ভাড়া বিবরণ

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্থতার যোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বপ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পায়দলী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিষ-বাপী, তান্ত প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথায় রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপর্যন্ত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পায়দলী চিকিৎসকের ওপাঙণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অভিন্ন একটি ‘বাইয়্যিনাহ্’ অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্ পক্ষ থেকে আসত একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু’টি বিষয় জানা গেল—এক. পরগহর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরীষ্ট অনর্থ এবং মূর্থতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং দুই. রসূলুল্লাহ্ (সা) মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولُوا يَتْلُو صُحُفًا مَّطْهُورًا فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ

এর অর্থ ‘পাঠ করা’। তবে যে কোন পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই ‘তিলাওয়াত’ বলা হয়। তাই পরিভাষার সাধারণত কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে ‘তিলাওয়াত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

শব্দটি مَطْهُورٌ-এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كُتِبَ শব্দটি كَتَبَ-এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাবি অর্থ কোন সমস্ত আদেশও হয়ে থাকে।

وَلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَهْوٌ—এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় سَهْوٌ বলার কোন মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মূশরিক ও আহলে-কিতাবদের পছন্দসত্ত্বতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ব্রাহ্ম বিশ্বাস থেকে সরে আসা সত্ত্ববপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্ কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ্ তা’আলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তিলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত

করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ (সা) কোন সহীকা থেকে নয়—স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাউন। এসব সহীকার নাম ও ইনসাক সহকারে প্রদত্ত ও চিরস্থান বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

تَفَرَّقَ—وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ

—এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশী গ্রন্থ তওরাত ও ইজীল রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ স্বমানস মুহাম্মদ মোস্তফা (সা) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাখিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কোরআন পাকিও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَمَا نُؤْمِنُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষার ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মুকাবিলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরিকদেরকে বলত : তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্যরই একজন রসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সরিকথা, রসূলুল্লাহ (সা)-র আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

সত্য ধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আয়াত আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না, সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষ নবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হল এবং অনেকেই কাফির হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল,

তাই প্রথম আয়াতে উক্তকেই অন্তর্ভুক্ত করে

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ বলা হয়েছে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং অজ্ঞানে-কিতাবে—উক্ত সম্প্রদায়কে শামিল করে তকসীর করা হয়েছে।

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ—অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ

করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করতে, নামায কায়েম করতে ও ঝাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলা বাহুল্য,

কিতাব শব্দটি قيمة—এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিধি-বিধান হবে এবং আল্লাতের মতজব হবে এই যে, মোহাম্মাদী শরীয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হব্ব তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। দ্বিত্ব বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ—এ আয়াতে জামাআতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নিম্না-

মত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু সান্নাদ খুদরী (রা) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা জামাআতীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন :

لبيك ربنا وسعديك (হে জামাআতীগণ)। তখন তারা জওয়াব দিবে يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ

وَالصَّغِيرِ كُلِّ فِي يَدِي (হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনু-গত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন :

তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জওয়াব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিম্নামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নমিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।—(বুখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জামাআতীরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জামাআতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জামাআতীদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার

তাৎপর্য কি? জওয়াব এই যে, সত্ত্বটির এক স্তর হল প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোন কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সত্ত্বটি বলে এই স্তরই বোঝানো হয়েছে।

উদাহরণত সূরা হোহাঃ রসূলুলাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে : وَلَسَوْفَ

وَلَسَوْفَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ عَلِيمًا ۝ (সূরা হোহাঃ ১০) অর্থঃ সত্ত্বই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন,

যাতে আপনি সত্ত্বটি হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুলাহ্ (সা) বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সত্ত্বটি হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে।—(মাবহারা)

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ — সূরার উপসংহারে আল্লাহর ভয়কে সমস্ত ধর্মীয়

উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোন শর, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خَشِيَةً বলা হয় না বরং কারও অসাধারণ মহিমায় ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خَشِيَةً বলা হয়।

এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্ত্বের সত্ত্বটি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসত্ত্বটির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বাস্তবায়নগত করে।

سورة الزلزال

সূরা বিলহাম

মদীনার অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۖ وَقَالَ

الْإِنْسَانُ مَالَهَا ۖ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۚ

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۚ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যখন পৃথিবী তার কল্পনে প্রকল্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার হুতাত বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, আগনার গালনকর্তা তাকে আদেল করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে; যাতে তাদেরকে তাদের হুতকর্ম দেখানো হয়। (৭) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

তুগর্ভের সার-সংক্ষেপ

যখন পৃথিবী তার কঠিন কল্পনে প্রকল্পিত হবে এবং পৃথিবী তার বোঝা বাইরে দিক্ষেপ করবে, (কোনো বস্তু ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার ও হুতদেরকে কোনো কোনো করে ছে। কোন-কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, পূর্বেও ভূগর্ভস্থ অনেক কিছু বাইরে চলে আসবে। কিস্যামতের পূর্বে যেসব ভূগর্ভস্থ সম্পদ বাইরে আসবে, সেগুলো সম্ভবত কালপ্রবাহে আশ্রয় মাটির নিচে চাপা পড়ে যাবে এবং কিস্যামতের দিন আবার বের হবে। ভূগর্ভস্থ ধনসম্পদ বাইরে চলে আসার ভাৎসর্ঘ সম্ভবত এই যে, যারা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালবাসে, তারা যাতে হঠাৎ ধনসম্পদের অসারতা প্রত্যক্ষ করে নেয়)। এবং (এই পরিস্থিতি দেখে) মানুষ বলবে, এর কি

হয় (হে, এভাবে প্রকল্পিত হচ্ছে এবং সব দৃশ্য ভাঙার বাইরে চলে আসছে)? সেদিন পৃথিবী তার (ভাল-মন্দ) রূপান্তর বর্ণনা করবে। কারণ, আপনাদের পাপনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (হাদীসে এর তক্ষসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—পৃথিবীতে যে ব্যক্তি সেরাপ কর্ম করবে ভাল অথবা মন্দ—পৃথিবী তা বলে দেবে। এটা হবে তার সাক্ষ্য)। সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে (হিসাবের মরদান থেকে) ফিরবে (অর্থাৎ তাদের হিসাব সমাপ্ত হবে, তারা জান্নাতী ও জাহান্নামী দলে বিভক্ত হয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে রওজানা হবে) স্বাভাবিক তাদের কৃতকর্ম (অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল) দেখে নেয়। অতএব যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখবে এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সেও তা দেখবে (যদি সৎ-অসৎ তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। নতুবা যদি কুফরের কারণে সৎ কর্ম ধ্বংস হয়ে যায় অথবা ঈমান ও তওবার কারণে অসৎ কর্ম মিটে যায়, তবে তা কিয়ামতের দিন দেখা যাবে না। কেননা, তখন সেই সৎ কর্ম সৎ কর্ম নয় এবং অসৎ কর্ম অসৎ কর্ম নয়। তাই সামনে আসবে না)।

আনুমানিক ভাটব্য বিষয়

—إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا—আয়াতে প্রথম ফুৎকার পূর্বকার

ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামত-সমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে করার থেকে উদ্ধৃত হবে। বিভিন্ন রেওয়াজে ও তক্ষসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, অলোচ্য আয়াতে কোন ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বোঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মামহারী)

—وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا—এই ভূকম্পন সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা)

বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিলালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতকড় অগ্নির কবলে ছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছেঁয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে স্বীয় হাত কাটা করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি দ্রুক্ষেপণ করবে না।—(মুসলিম)

—فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ—আয়াতে خير বলে শরীয়তসম্মত

সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে, যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ঈমান ব্যতীত

কোন সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, হার মধ্যে অণু পরিমাণ ইমান থাকবে, তাকে অবশেষে আহাম্মাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ইমানই একটা বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি স্বত বড় গোনাহ্‌গারই হোক, চিরকাল আহাম্মামে থাকবে না। কিন্তু কাফির ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সৎকর্ম করে থাকলে ইমানেরও অভাবে তা গণ্ডগম মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সৎ কাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ—জীবদ্দশায় তওবা করেনি—এখানে

এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসে অকাটা প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ্‌ মাক হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ্‌ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক—পরকালে অবশ্যই সমানে আসবে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ্‌ থেকেও আশ্রয়কার সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী, ইবনে মাজা)

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : কোরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসুলুল্লাহ্‌ (সা) এ আয়াতকে **الْفَا زِ وَ الْجَا مَعَة**—অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্‌ (সা) সূরা শিনখালকে কোরআনের অর্থেক, সূরা ইখলাসকে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরানকে কোরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন।—(মাবহারা)

سورة العاديات

সূরা আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ আয়ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعِدْيَاتِ ضُبْحًا ۖ وَالْمُؤَيَّتِ قَدْحًا ۖ وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۖ فَأَثَرُنَّ بِهِ

نَقْعًا ۖ فَوْسَطُنَّ بِهِ جَمْعًا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۖ وَإِنَّهُ يَحْتِ الْخَيْرَ لَعَدِيدٌ ۖ أَفَلَا

يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۖ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۖ

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) শপথ ঔর্ধ্বাঙ্গে চলমান অশ্বসমূহের, (২) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিনির্গতকারী অশ্বসমূহের (৩) অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজকারী অশ্বসমূহের (৪) ও হারা সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে (৫) অতঃপর হারা শত্রুদের অত্যাচারে চুকে পড়ে—(৬) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ (৭) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত (৮) এবং সে নিশ্চিতই ধনসম্পদের ভানবাসায় মত্ত (৯) সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উন্মিত হবে (১০) এবং উন্মিত যা আছে, তা অর্জন করা হবে? (১১) সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সর্বিশেষ জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ ঔর্ধ্বাঙ্গে ধাবমান অশ্বসমূহের, অতঃপর হারা (প্রস্তরে) ক্ষুরাঘাতে অগ্নি নির্গত করে, অতঃপর প্রভাতকালে লুটতরাজ করে, অতঃপর সে সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদের অত্যাচারে চুকে পড়ে, (এখানে যুদ্ধের অশ্বসমূহ বোঝানো হয়েছে। আরব দুর্ধর্ষ জাতি বিখ্যাত যুদ্ধের জন্য অশ্ব পালন করত। অশ্বের সাথে তাদের এ সংযোগের প্রেক্ষিতে সাময়িক অশ্বের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের অওয়াবে বলা হচ্ছে :) নিশ্চয়

(যেসব) মানুষ (কাফির) তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। সে নিজেও এ সম্পর্কে অবহিত (কখনও প্রথমেই এবং কখনও চিন্তাভাবনার পর অকৃতজ্ঞতা অনুভব করে।) সে অবশ্যই ধন-সম্পদের ভাগবাসায় মত্ত। (এটাই তার অকৃতজ্ঞতার কারণ। অতঃপর এর জন্য শাস্তিবাদী উচ্চারণ করা হয়েছেঃ) সে কি জানে না, স্বধন কবরে যা আছে, তা উজ্জ্বল হবে এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ করা হবে? সেদিন তাদের কি অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ অবহিত। (ফলে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। মোট কথা, মানুষ যদি সেই সংকটময় মুহূর্ত সম্পর্কে পুরোপুরি ভািত হত, তবে অকৃতজ্ঞতা ও ধনসম্পদের লালসা থেকে অবশ্যই বিরত হত)।

জানুয়ারি জাতক বিষয়

সূরা আদিরাড হযরত ইবনে মসউদ, জাবের হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা) প্রমুখের মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আকাস, আনাস (রা), ইয়াম মালিক ও কাভাদাহ (র) প্রমুখের মতে মদীনাতে অবতীর্ণ।—(কুরতুবী)

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সাময়িক অশ্রের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলী ও বিধানাবলী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্যনিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সঙ্গ্রামে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সাময়িক অশ্রের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্র বিশেষত সাময়িক অশ্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না অনিজায় দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্র মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাঝ। এখন অশ্রকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতার কণ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক কোঁটা তুচ্ছ বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চতরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন—

عَادِيَاتٍ—যোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার শব্দটি عِدْو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। مُبِيعًا—যোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তার বন্ধ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। مُوَرِّيًا—শব্দটি مُوَرِّيًا থেকে উদ্ভূত।

অর্থ অগ্নি নির্গত করা; যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। **قَدَحَ**-এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহভূতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া বহন প্রস্তুতময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুল্গিত নির্গত হয় **مُفْطِرَاتٍ** শব্দটি **غَارَةٍ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। **مُهَاجِرَةٍ** আরবদের অভ্যাস হিসাবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাশির অন্ধকারে হানা দেওয়া দৃশ্যীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর একাজ করত। **أَثْرُنَ** শব্দটি **أَثَارٍ** থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। **نَقَعَ** ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অস্থসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত শ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক শ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্তীর্ণ হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا—অর্থাৎ এসব অস্ত্র শত্রুদের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে।

كَنُودٍ হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

আবু বকর ওয়াসিতী (র) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে **كَنُودٍ** বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নালোকরী করা।

وَإِنَّهُ لَعَبَّ الثَّخِيرَ لَشَدِيدٌ—**خَيْرٌ**-এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধন-

সম্পদকেও **خَيْرٌ** বলে ব্যক্ত করা হয়, যেমন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনসম্পদের পরিশ্রুতি তাই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে **— إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে

উপরোক্ত আয়াতে অস্ত্রের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে— এক, মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই, সে ধনসম্পদের ভালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরীয়ত ও শূক্তির নিষিদ্ধে নিষ্পনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিষ্পনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরীয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজনমাত্তিক ফরযও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালবাসা নিষ্পনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমন

ভাবে মৃত হওয়া যে, আল্লাহর বিধি-বিধান থেকেও পার্শ্ব হইতে পড়া এবং হাদীস ও হাদীসের পরওয়া না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাত্তিক সঞ্চয় করা তো নিষ্পনীয় নয়, বরং কর্তব্য। কিন্তু একে জালবাসা নিষ্পনীয়। কেননা, জালবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাত্তিক অর্জন করা এবং তদ্বারা উপকৃত হওয়া তো কর্তব্য ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহত্বত হওয়া নিষ্পনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রত্যাব পার্থক্যের প্রয়োজন মিটার, এজন্য স্বল্পমান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহত্বত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহত্বত থাকে না বরং অপারক অবস্থার এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরূপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাত্তিক অর্থোপার্জন করবে, তার হিফাজত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহত্বতে মগ্নত্ব করবে না। যতগুলি ন্যায়ী অভ্যাস সাবলীল ভঙ্গিতে বিবরণি বর্ণনা করেছেন :

آب آندرز هر کشتی پستی است آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থঃ পানি হতভঙ্গ নৌকার নীচে থাকে, ততভঙ্গ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এই পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনিভাবে ধনসম্পদ হতভঙ্গ নৌকার নীচে অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততভঙ্গই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি দৃশ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাদী গুনানো হয়েছে।

—آبَا۟ءُ مَا۟ نَعْلَمُ اِنَّا نَعْتَرُ مَا۟ فِی الْقُبُو۞رِ

কিয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উদ্ধিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অভ্যাব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দেবেন। কাজেই যুক্তিমানের কর্তব্য হল অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসার মত্ত না হওয়া।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য সূরার মানুষ যাদেরই দু'টি দৃশ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অখট মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যারা এ দৃশ্য স্বভাবের থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা। তারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ কেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ যাদেরই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরূপ হওয়া জরুরী হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফির মানুষ বুঝিয়েছেন। তবু সীরের সার-সংক্ষেপেও তাই করা হয়েছে। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ দৃশ্য বিবরণ প্রকৃতপক্ষে কাফিরদের স্বভাব। আল্লাহ না করুন, যদি কোন মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

سورة القارعة

সূরা কারেরা

মক্কার অবতীর্ণ, ১১ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَذْرُكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَُوْمَ يَكُونُ النَّاسُ
كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوشِ ۝ وَأَنَّا مَن ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ قِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٌ ۝ وَأَنَّا مَن خَفَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأَمَّهُ
هَٰوِيَةٌ ۝ وَمَا أَذْرُكَ مَا هِيَةٌ ۝ نَارُ حَامِيَةٍ ۝

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) করাঘাতকারী, (২) করাঘাতকারী কি? (৩) করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (৪) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (৫) এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত। (৬) জ্বলন্ত আর পাল্লা ভারী হবে, (৭) সে সুখী জীবন যাপন করবে (৮) আর আর পাল্লা হালকা হবে, (৯) তার ঠিকানা হবে হাবিরা। (১০) আপনি জানেন তা কি? (১১) প্রজ্বলিত অগ্নি।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কি? করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন? (অর্থাৎ কিরায়ত, যে অন্তরকে ভীতি এবং কানকে ভীষণ শব্দে আঘাত করবে, আর এ অবস্থা সেদিন হবে,) যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (কল্পকটি বিষয়ের কারণে মানুষকে পতংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে—এক, সংখ্যাধিক্যের জন্য সেদিন বিষয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষ এক ময়দানে সমবেত হবে। দুই, দুর্বলতা ও শক্তি-হীনতার জন্য। কারণ, সব মানুষ তখন পতংগের মতই শক্তিহীন ও দুর্বল হবে। এ দুটি কারণ হালকের সব মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে পাওয়া যাবে। তৃতীয় কারণ এই যে, সব মানুষ অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক ছুটছুটি করবে, যা পতংগদের বেলায় প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য এ অবস্থা মুমিনদের বেলায় হবে না। তারা প্রশান্ত মনে কবর থেকে উদ্ধৃত হবে)। এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত। (পর্বতমালার রঙ

বিভিন্ন রূপ। যেহেতু এগুলো সেদিন উড়তে থাকবে, ফলে বিভিন্ন রঙ-এর পশমের মত দেখা যাবে। সেদিন মানুষের কর্ম ওজন করা হবে) অতএব হার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন কাটান করবে (সে হবে মু'মিন। সে মুক্তিপেন্নে জাহাঙ্গে যাবে) এবং হার (ইমানের) পাল্লা হালকা হবে (অর্থাৎ কাকির হবে) তার ঠিকানা হবে হাবিরা। আপনি জানেন তা (অর্থাৎ হাবিরা) কি? (সেটা) এক প্রবলিত অগ্নি।

আনুমানিক ভাষাতত্ত্ব বিষয়

এ সূরার আয়তের ওজন ও তার হালকা এবং ভারী হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহাঙ্গাম অথবা জাহাঙ্গাম নামের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আয়তের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাকের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া প্রকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সম্বন্ধ সাধন করে জানা যায় আয়তের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাকিরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পক্ষী ভারী ও কাকিরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরার বাহ্যত প্রথম ওজন বোঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ইমানের কারণে ভারী হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাকিরের পাল্লা ইমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তুফসীরে মামহারীতে আছে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে কাকির ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে হারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কোরআন পাকে সাধারণভাবে দান-প্রদানের কোন উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে—গণনা করা হবে না। আয়তের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুমতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। হার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুমতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যান্বিত কম হলেও তার আয়তের ওজন বেশী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যান্বিত নাযাফ, রোহা, সদকা-খয়রাত, হজ্জ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্তরিকতা ও সুমতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আয়তের ওজন কম হবে।

سورة التكاثر

সূরা তাক্বার

মক্কায় অবতীর্ণ, ৮ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ زُرْتُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۚ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۚ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَبِينَ الْيَقِينِ ۚ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۚ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফিল রাখে, (২) এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও। (৩) এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে, (৪) অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে। (৫) কখনওই নয়, যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (৬) তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (৭) অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিবা-প্রভাত্রে, (৮) এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

(পাখিব সম্পদের) বড়াই তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) গাফিল করে রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও [অর্থাৎ মরে যাও—(ইবনে কাসীর)] কখনই নয়, (অর্থাৎ পাখিব সম্পদ বড়াই করার হোয়া নয় এবং পরকাল গাফিল হওয়ার উপযুক্ত নয়)। যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে! (অর্থাৎ বিস্তৃত প্রমাণাদিতে চিন্তা ও মনোনিবেশ করতে এবং এ বিষয়ে প্রত্যয় অর্জন করতে, তবে কখনও বড়াই করতে না এবং পরকাল থেকে উদাসীন হতে না)। তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, (আবার বলি) তোমরা অবশ্যই তা দেখবে দিবা প্রভাত্রে। কেননা, এই দেখা প্রমাণাদির পথে হবে না, যাতে প্রত্যয় অর্জনে সামান্য বিলম্ব হতে পারে বরং এটা দিবা দৃষ্টিতে দেখা হবে। (চাক্ষুশ দেখাকে এখানে দিবা প্রভাত্রে দেখা বলা হয়েছে)। অতঃপর (আবার শুন) তোমরা অবশ্যই সেদিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের হক ইমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় করেছ কিনা—এ প্রশ্ন করা হবে)।

মানুষ্যিক জাতক বিচার

لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ ۚ فَكَفَىٰ لَكُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ

সফর করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এ তফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ (র) এ অর্থই করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) একবার এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন : এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।—(কুরতুবী)

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ — এখানে কবরস্থানে বিস্মিত করার অর্থ মনে কবরে

পৌছা। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন : حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ

الموت — (ইবনে কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সম্মান-সম্মতি ও বংশ-স্বত্বের বড়াই ভোম্বাদেরকে প্রাক্ষিপ্ত ও উদ্বাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিপতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা ভোম্বরা কর না এবং এমনি অবস্থায় ভোম্বাদের হৃদয় এসে যায়। আর হৃদয় পর ভোম্বরা আত্মবে প্রেক্ষণীয় হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, স্বারা ধনসম্পদ ও সম্মান-সম্মতির ভাববাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করার এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার কুরসভই পায় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিবখীর (রা) বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ (সা)-র নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ الْغُيُوبَ তিলাওয়াত করে বসছিলেন :

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي لَكَ مِنْ مَالِكِ أَلَا مَا أَكَلْتُ فَأَفْهَيْتَ أَوْ لَبَسْتُ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتُ فَأَمْضَيْتَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَذَاهِبْ وَتَارِكٌ لِلنَّاسِ -

মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই, ততটুকু তুমি ঘেঁষে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পড়িয়ে দাও। এছাড়া স্বা আছে, তী তোমার হাত থেকে চলে যাবে—তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে।—(ইবনে কাসীর, তিরমিযী, আহমদ)

হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَا يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلِي يَمْلَأَهُمَا إِلَّا لَتَرَا بِي وَيَتَوَبَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ -

আদম সন্তানের যদি স্বপ্নে পরিপূর্ণ একটি উপভাষা থাকে, তবে সে (প্রতিটি সন্তানই হবে না, বরং) দুটি উপভাষা কামনা করবে। তার মুখ ভেঁ (বাবরের) মাটি বাতীত অন্য কিছু ঘরা ভতি করা সম্ভব নয়। যে আরাহির দিকে কবুল করে, আরাহি তা তওবা কবুল করেন—(বুখারী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন : আমরা সূরা তাক্বীর নাযিল হওয়া পর্বত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হয়—রসূলুল্লাহ (সা) **إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا**

পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা স্মৃতি উত্তে যে, এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য।

لَوْ تَعْلَمُونَ مَلِمَ الْفَقِينِ—এর অর্থ হবে এ স্থলে উহা রয়েছে। অর্থঃ

لَمَّا إِلَهُكُمْ إِلَهًا وَاحِدًا—উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও, তবে কখনও প্রাদুর্ভাব বড়াই করতে না এবং উপাসীন হতে না।

مِنَ الْفَقِينِ—এর অর্থ সে **ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَنْ الْفَقِينِ**—উপরে বলা হয়েছে

প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অজিহত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মুসা (আ) যখন তুর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর অনু-পস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আরাহি তা'আলা তুর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা গোবৎসের পূজার মিলিত হয়েছে। কিন্তু মুসা (আ)-র মধ্যে এর ভেতর প্রতিজ্ঞা দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের ভক্তিভঙ্গে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।—(মাবহরী)

ثُمَّ لَتَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ—অর্থঃ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন

আরাহিপ্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর সৌকর্য অর্থেয় করেছি কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছি কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে : **إِنَّا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ**

وَالْفُؤَادَ نَكَلٌ أَوْ لَا تَكُنَّ مِّنْهُمْ مَّشْكُورًا—এতে মানুষের ব্রহ্মশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত মাঝে নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিরামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে : আমি কি তোমাকে সুস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি?—(ভিক্সরী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ভাগ করতে পারবে না—এক. সে তার জীবনের দিন-রাত্তির কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? দুই. সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? তিন. সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? চার. সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? পাঁচ. আল্লাহ প্রদত্ত ইজ্জত অনু-স্বায়ীসে কতটুকু আমল করেছে?—(খুযারী)

ভক্তসঙ্গীবিদ ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন : কিরামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পান্যহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক কিংবা সন্তান-সন্ততি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগ-বিলাস হোক।—কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা একান্ত মথার্থ যে, কোন বিশেষ নিরামিত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

সূরা তাক্বাতুরের বিশেষ অর্থোক্ত : রসূলে করীম (সা) একবার সাহাবায়ে কিরা-মকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরম্ভ করলেন : হ্যাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কব্বজনের আছে! তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কি সূরা তাক্বাতুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।—(মাবহরী)

سورة العصر

সূরা আছর

মক্কার অবতীর্ণ, ৩ আয়াত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কসম খুগের, (২) নিষ্ঠুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎ কর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সৎ কর্মের।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কসম খুগের (যাতে দুঃখ ও ক্ষতি সাধিত হয়), মানুষ (তার জীবনের দিনগুলো বিনষ্ট করার কারণে) খুবই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎ কর্ম করে (যা আত্মশুণ) এবং পরস্পরকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাকীদ দেয় এবং তাকীদ দেয় সৎ কর্মে অটল থাকার। (এটা পরোপকারী শুণ। মোট কথা, যারা এ আত্মশুণ অর্জন করে এবং অপরকেও গুণান্বিত করে, তারা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয় বরং লাভবান)।

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

সূরা আছরের বিশেষ ফযীলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হিসন (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ (সা)-র সাহাবীগণের মধ্যে দু'বাক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্য-জনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। —(তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন : যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল। —(ইবনে কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (র)-র ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে

ডানের ইচ্ছাকৃত ও পরকালের সংশোধনের জন্য আঁখিষ্ট হয়ে যায়। এ সূর্য্য আছর তা'আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তরাই মুক্ত, যারা তারটি বিষয় নির্ভার সৌথে পালন করে—ইমান, সৎ কর্ম, অপরাধে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দু'টি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হিদায়াত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রশ্নান্বিত বিষয় এই যে, এ বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের অন্তরালের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খাঁকা বাছনীয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মাঝেই সংঘটিত হয়। সূর্য্য যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই যুগকালেরই সিদ্ধান্তান্তিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আত্মকালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইচ্ছাকৃত ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাকাফাও অর্জন করতে পারে এবং প্রাপ্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিসজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। অনেক আলিম বলেন :

حها تك | نفاس تعد نكلما + مضى نفس منها انقصت به جز ۱=

অর্থাৎ তোমার জীবন কতিপয় ওপাওন্টি হাস-প্রশ্বাসের নাম। স্বপ্নন একটি হাস অভিবাহিত হয়ে যায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আত্মকালের অকল্যা পুঁজি দিয়ে একটি ব্যবসারে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে এ পুঁজিকে খাটি লাভদায়ক কাজে লাগাতে পারে। যদি সে লাভদায়ক কাজে এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাকাফা কোন অভাব থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সে এই পুঁজি কোন ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাকাফা দূরের কথা, পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাকাফা ও পুঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপার দোষ হয়ে যায় না বরং তার উপর শত শত অধরাধের শক্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এ পুঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোন কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতিভো অবশ্যম্ভাবী যে, তার মুনাকাফা ও পুঁজি উভয়ই বিনষ্ট হল। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

كل يلد و نبا تح نفسة فمعتقها او موبقها

প্রাতঃকালে উঠে তার প্রাণের পুঁজি ব্যবসারে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পুঁজিকে লোকসান থেকে মুক্ত করুন এবং কেউ ধ্বংস করে দেয়।

খোদা কোরআনও ইমান এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসারূপে বাস্তব করেছে। বলা

হয়েছে : **هَلْ أَتَاكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلِهِم** —আম্বাভা

যখন পুঁজি আদায় মানুষ হল ব্যবসারী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসারীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্পর্কিত। কেননা, এই বেচারীর পুঁজি কোন আকুন্ট পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা যাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিম্নত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসারীকে অত্যন্ত চালাক ও সূচত্বর হতে হবে। কারণ বহমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনৈক বৃহৎ বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আছরের মতার্থ তফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকুন্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে বস্তুচতুষ্টয় সম্বলিত ব্যবস্থাপন ব্যবহারে সামান্যও গাফিল না হয়, বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। কাজেও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস, এতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরোক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাফল্য সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ইমান ও সৎ কর্ম—আত্ম-সংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবারের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রাধান্যযোগ্য। **تَوَامِي** শব্দটি

وصيت থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ডাকিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম ওসীয়াত। এ কারণেই মরশোমুখ বাড়ি পরবর্তীকালের জন্য যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়াত বলা হয়।

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়াতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবারের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে—এক. সত্যের অর্থ বিতর্ক বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আর সবারের অর্থ বাস্তব গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হল 'আমর বিল মারাক' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হল 'নিহী আনিহা মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ইমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেওয়া। দুই. সত্যের অর্থ বিতর্ক বিশ্বাস এবং সবারের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা, সবারের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী

করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং পোনাহ্ থেকে আছরকা করা উভয়ই শামিল।

হাকেম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন : দু'টি বিষয় মানুষকে ইমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করতে স্বাভাবিক বাধা দেয়—এক, সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ইমান ও সৎ কর্মের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যদ্বারা বিশ্বাসই বিরহিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে ছুটি চুকে পড়লে কর্ম ছুটিমুড় হওয়া স্বাভাবিক। দুই, খেয়ালখুশী, যা মানুষকে কোন সময় সৎ কাজের প্রতি বিমুগ্ধ করে দেয় এবং কোন সময় মগ্নকাজে লিপ্ত করে দেয়, যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সৎ কাজ করায় এবং সৎ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সত্যের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করায় এবং সবরের উপদেশ বলে খেয়ালখুশী ত্যাগ করে সৎ কাজ প্রবলমানের নির্দেশ দেওয়া বোঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সত্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের কর্মকৃত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরী : এ সূরার মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজদের ধর্মকে কোরআন ও সূরার অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলমানদেরকেও ইমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজদের আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আগুন পরিবার-পরিজন বন্ধ-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে মুক্তি ফিরিয়ে রাখা আগুন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামাভর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সে দিকে প্রক্ষেপও নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন॥

سورة الهزلة

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ : ৯ আয়াত ॥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَبَلَّ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لُّزُومًا ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ

كَلَّا لَيَنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ

الْمُوقَدَّةُ ۚ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنِیَّةِ ۚ لَهَا عَلَيْهِمْ مَوْصِدَةٌ ۚ

فِي عَذَابٍ مُّسْتَدَرِّدَةٍ ۚ

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে। (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিষ্কিন্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আগুন কি জানেন, পিষ্টকারী কি? (৬) এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হবে, (৯) লম্বা লম্বা ঝুঁটিতে।

ভকসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, যে (লালসার আধিক্যের কারণে) অর্থ জমা করে এবং (তৎপ্রতি মহকাত ও গর্বের কারণে) তা বার বার গণনা করে। (তার ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যেন) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে (অর্থাৎ অর্থের প্রতি এমন লিপ্সা রাখে যে, সে যেন বিশ্বাস করে, সে নিজেও চিরকাল জীবিত থাকবে এবং তার অর্থও চিরকাল এমনি থাকবে। অথচ এই অর্থ তার কাছে) কখনও (থাকবে) না। (অতঃপর তার দুর্ভোগের বিবরণ দেওয়া হয়েছে) সে অবশ্যই নিষ্কিন্ত হবে এমন অগ্নিতে যা সবকিছুকে পিষ্ট করে দেয়, সেটা আল্লাহর অগ্নি, যা (আল্লাহর আদেশে) প্রজ্বলিত, (আল্লাহর অগ্নি; বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, সেই অগ্নি অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ হবে) যা (শরীরে লাগা মাত্রই) হৃদয় পর্যন্ত

পৌছবে। সেই অগ্নি তাদের উপর অবতীর্ণ করে দেওয়া হবে (এভাবে যে, তারা অগ্নির) বড় লম্বা লম্বা স্তম্ভে পরিবেষ্টিত থাকবে, যেমন কাউকে অগ্নির সিল্লিকে পুরে দেওয়া হয়)।

জানুয়ারি কল্যাণ বিষয়

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ তিনটি হচ্ছে **جمع مال و لمز** - প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারকের মতে **لمز** - এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং **جمع مال** - এর অর্থ সামান্যসামান্য দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সন্তুষ্টির নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারও পশ্চাতে নিন্দা করা একারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাক্ষাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে **لمز** তথা সন্তুষ্টির নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্চিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

شَرُّ أَعْبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الْإِنْسَانُ عَلَى لَمِزَةٍ أَوْ نِقَمَةٍ الْمَغْرُوقِ بَيْنَ الْأَحْبَةِ
الْبَاغُونَ لِبِرَاءِ الْعَنْتِ -

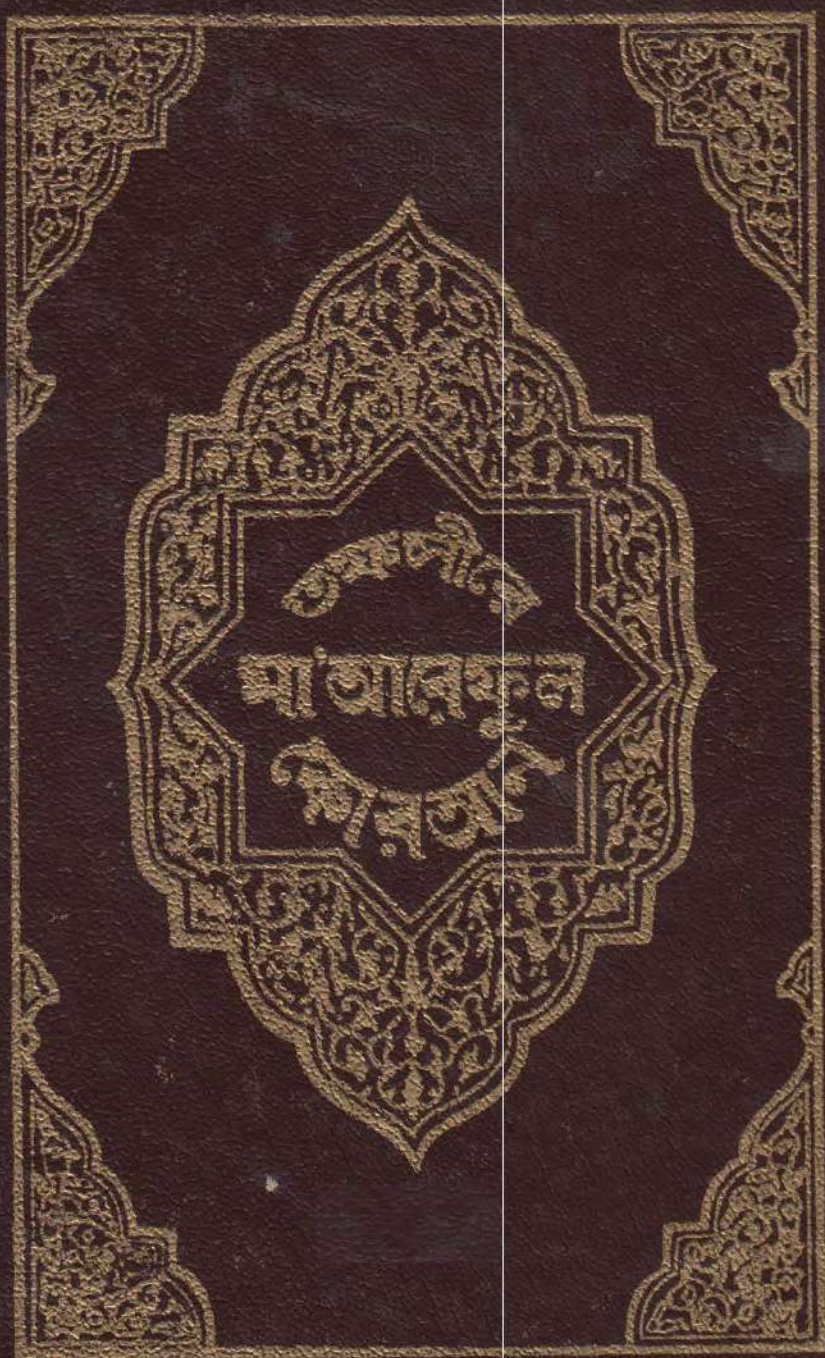
অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিঙ্গা। আয়াতে একে এভাবে বাক্য করা হয়েছে—অর্থলিঙ্গার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে অকররী হুক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহংমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা সালসার কারণে দীনের অকররী কাজ বিলম্বিত হয়।

تَطَّلِعْ عَلَى الْآفَئِدَةِ - অর্থাৎ আহাম্মামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস

করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ

কালে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিকশিত হলে তার জল-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও ভস্মে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয় দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন